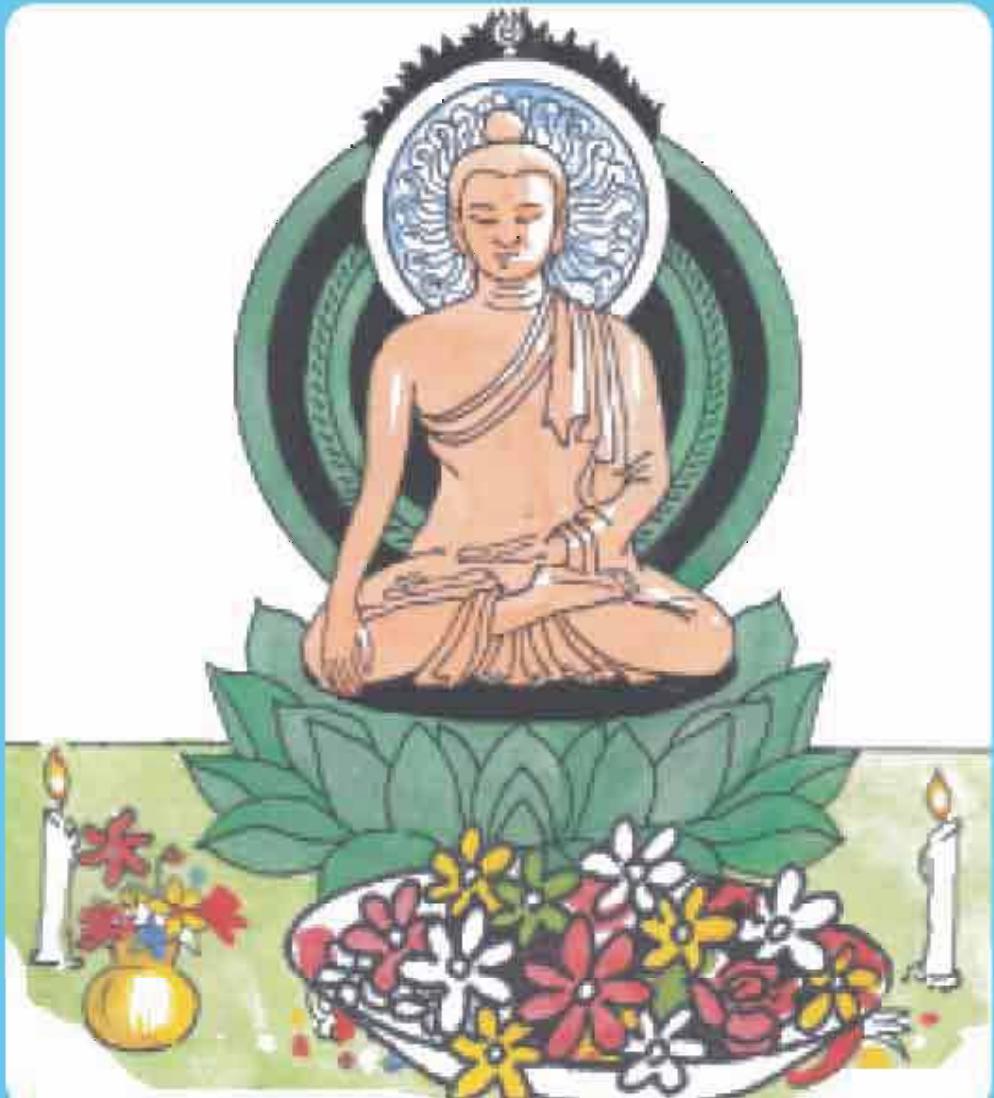


বৌদ্ধধর্ম ও নেতৃত্বিক শিক্ষা

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া

গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

উত্তরা চৌধুরী

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

পরীক্ষামূলক সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০১২

পাঠ্যপুস্তক প্রগ্রামে সমন্বয়ক

মোঃ জিয়াউল হক

আলেয়া আক্তার

কমিউটার কম্পিউট

বর্ণনস কালার স্ক্যান

প্রচ্ছদ

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

চিত্রাঙ্কন

তিতাস চাকমা

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অভিন্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এ ছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষান্তি-২০১০ -এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেইসাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতিচেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃকৃত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১ -এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের সামর্থ্য, প্রবণতা ও পূর্বঅভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সূজনশীল প্রতিভার বিকাশসাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচ্ছিন্ন কাজ, সূজনশীল প্রশ্ন ও অন্যান্য প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সূজনশীল করা হয়েছে।

বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি শ্রেণি উপযোগী বিষয় ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠনে আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিষয়বস্তুভিত্তিক চিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই পাঠ্যপুস্তক পাঠ করে ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সদাচরণ, সর্বজীবে দয়া, সংয়ম ও শীল অনুসরণে আগ্রহী হবে। গৌতম বুদ্ধের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে শিক্ষার্থী তার সৎ ও আলোকিত জীবনগঠনে উদ্বৃদ্ধ হবে।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। কাজেই পাঠ্যপুস্তকটির আরও সমৃদ্ধিসাধনের জন্য যে-কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের বিপুল কর্মসূলের মধ্যে অতি স্বল্প সময়ে পুস্তকটি রচিত হয়েছে। ফলে কিছু ভুলক্রটি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণগুলোতে পাঠ্যপুস্তকটিকে আরও সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নয়না প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর মোঃ মোতাফা কামালউল্লিহ

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা	১-২০
দ্বিতীয়	বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব	২১-৩২
তৃতীয়	ত্রিপিটক	৩৩-৪৬
চতুর্থ	সূত্র ও নীতিগাথা	৪৭-৫৮
পঞ্চম	বৌদ্ধ কর্মবাদ	৫৯-৭০
ষষ্ঠ	আট্ঠকথা	৭১-৮৭
সপ্তম	নির্বাণ	৮৮-৯৫
অষ্টম	সঙ্গীতি	৯৬-১০৯
নবম	জাতক	১১০-১২০
দশম	চরিতমালা	১২১-১৩৪
একাদশ	বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস	১৩৫-১৫৩
দ্বাদশ	বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন	১৫৪-১৬৮

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর জীবনদর্শনই বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তি। জন্ম থেকে মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আশি বছরব্যাপী জীবনে বুদ্ধ নৈতিকতা ও মানবতার বহু বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছেন। রাজকুমার হয়েও মানুষের দৃঢ়খ্যান্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ করেন। তারপর ছয় বছর কঠোর সাধনায় লাভ করেন বুদ্ধত্ব। আবিষ্কার করেন দৃঢ়খ্যান্তির পথ। সর্বজীবের কল্যাণের জন্য তিনি প্রচার করেন তাঁর নবলক্ষ্ম ধর্ম এবং প্রদর্শন করেন দৃঢ়খ্যান্তির সেই পথ। তাঁর জীবন ছিল মৈত্রী-করণার রসে সিঙ্গ। জীবপ্রেম, অহিংসা, সাম্য, মৈত্রী ও করণার বাণী প্রচার করে তিনি মহাকারণিক বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। তাঁর মহাকরণার বাণী পৃথিবীর বৃহত্তর থেকে অতি ক্ষুদ্র প্রাণীকেও রক্ষার প্রেরণা যোগায়। সমাজে যারা অস্পৃশ্য বলে উপেক্ষিত হয়েছে তিনি তাদের উপেক্ষা করেননি। তিনি তাদেরকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পথভাস্তকে পথ প্রদর্শন করে সংপথে পরিচালিত করেছেন। পঙ্ক্তিল জীবনযাপনকারীকে পঙ্ক্তিলতামুক্ত করেছেন। শোক-দুঃখে জর্জরিত মানুষকে নির্বাণের পথেপরিচালিত করে শোক-দৃঢ়খ্যান করেছেন। মানুষকে নৈতিক ও মানবিক জীবনযাপনে উদ্বৃদ্ধ করে শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন। তাই সভ্যতার ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধ অনন্য স্থান দখল করে আছেন। এই অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধ সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে-

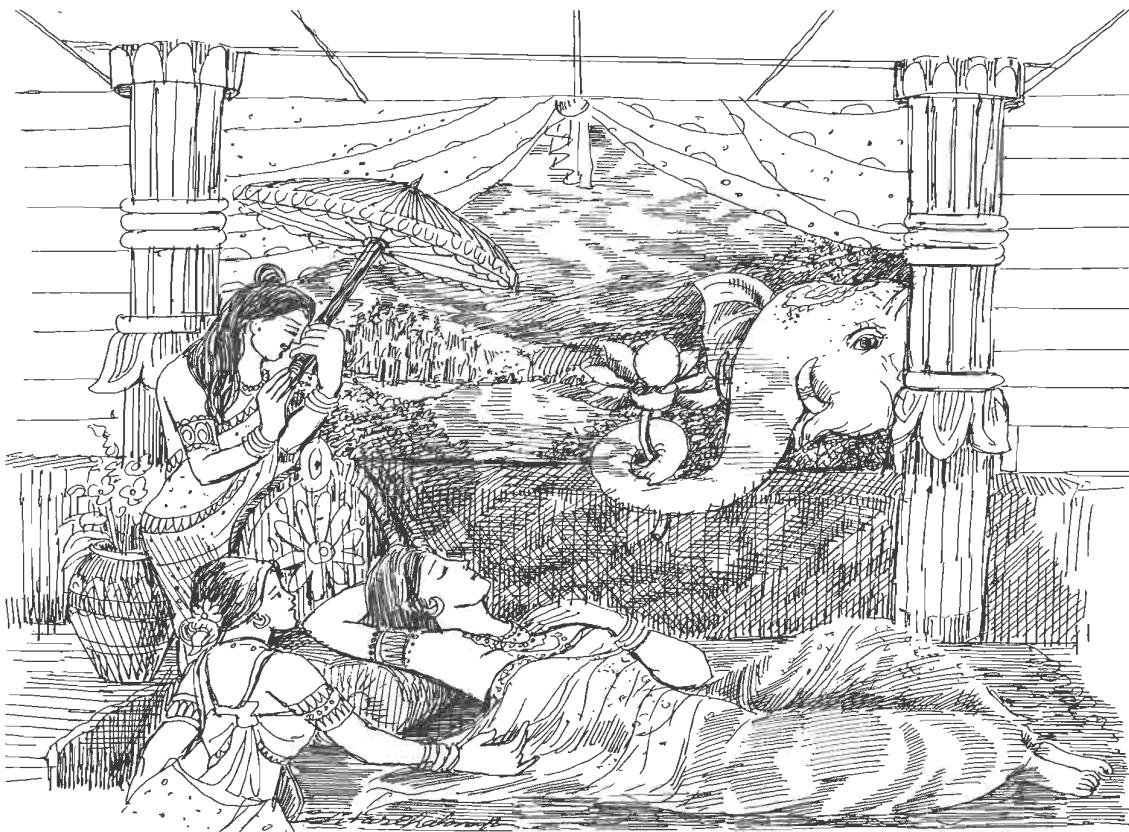
- সিদ্ধার্থের জন্মকাহিনী বর্ণনা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের বাল্যকালের বিশেষ ঘটনাগুলি ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কাহিনী ও সন্ন্যাসজীবন বর্ণনা করতে পারব ;
- সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভ ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব ;
- বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের কাহিনী বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

সিদ্ধার্থের জন্ম

হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নামে একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ রাজ্য ছিল। শাক্যরা সেখানে বাস করতেন। এ-রাজ্যের রাজার নাম শুন্দোদন, রানি মহামায়াদেবী। রাজ্যে সুখশান্তির অভাব ছিল না। কিন্তু রাজা ও রানির মনে শান্তি নেই। কারণ, তাঁদের কোনো সন্তান নেই। একটি সন্তানের আশায় রাজা-রানি অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার উৎসব শেষ করে রানি মায়াদেবী ঘুমিয়ে পড়লেন। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ছিল। চাঁদের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বলিত। রানি এক অপূর্ব সুন্দর স্বপ্ন দেখলেন। চারিদিক থেকে চার দিকপাল দেবতা এসে রানিকে সোনার পালকে তুলে নিলেন। নিয়ে গেলেন হিমালয় পর্বতের মানসসরোবরে। ওখানে দেবতাদের মহিষীরা মায়াদেবীকে স্নান করিয়ে সুবাসিত দিব্যবন্ধে ভূষিত করলেন। রানি আরও দেখলেন তিনি সোনার পালকে শুয়ে আছেন। পাশের স্বণপর্বত থেকে এক খেতহস্তী নেমে এল, শুঁড়ে ছিল একটি খেতপদ্ম। খেতহস্তীটি রানির পালকের চারপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করল। এরপর রানির জঠরের দক্ষিণ দিকে খেতপদ্মটি প্রবেশ করিয়ে দিল। অলৌকিক আনন্দে শিহরিত হলেন রানি। আকাশে ছিল আষাঢ়ী পূর্ণিমার উজ্জ্বল চাঁদ।



রানি মহামায়ার স্বপ্ন

পরদিন সুম থেকে জেগে রানি তাঁর স্বপ্নের কথা রাজা শুন্দোদনকে বললেন। রাজা সকল রাজ-জ্যোতিষীকে ডেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন, “মহারাজ, সুসংবাদ আছে, আনন্দ করুন, রানি মায়াদেবীর পুত্রসন্তান হবে। শাক্যবংশে এক মহাপুরুষের আবর্ত্তা হবে। কালে তিনি সর্বজীবের দুঃখহরণকারী মহাজ্ঞানী হবেন। আনন্দ করুন মহারাজ।”

এভাবে দিন চলে যায়, এল সেই শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। এ-সময় রানির পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। রাজা সম্মতি দিলেন এবং পিতৃগৃহে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। রানির যাত্রাপথ কপিলাবস্তু থেকে দেবদহ পর্যন্ত সজ্জিত ও সমতল করা হলো। সরীদের সঙ্গে নিয়ে রানি সোনার পালকিতে চড়ে পিত্রালয়ে চললেন। পথে দুই নগরের মাঝে লুম্বনী কানন। শালবিথীকায় ঘেরা, চারিদিকে ফুল পাতার সমারোহ, পাথির কলকাকলিতে মুখর এই ছায়াশীতল কাননে

রানির বিশ্বামের ইচ্ছা হলো। তাঁর নির্দেশে পালকি থামানো হলো। রানি কিছুর হেঁটে এক শালতরুর নিচে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে একটি শাখা ধরলেন। তখনই তাঁর প্রসববেদনা শুরু হলো। সহচরীরা জায়গাটির চারিদিকে কাপড় দিয়ে ঘিরে দিলেন।

লুম্বিনী কাননের শালবন্ধের নিচে বৈশাখী পূর্ণিমার শুভক্ষণে জগতের আলো ভাবী বুদ্ধ সিদ্ধার্থ গৌতম ভূমিষ্ঠ হলেন। অনেক সাধনার পর সিদ্ধ হয়েছে রাজা-রানির মনোবাসনা, তাই পুত্রের নাম রাখা হলো সিদ্ধার্থ। কথিত আছে, সিদ্ধার্থ জন্মেই সাতটি পদক্ষেপে অঙ্গসর হয়েছিলেন, প্রতি পদক্ষেপে একটি করে পদ্মফুল ফুটেছিল। এ-সময় চারিদিকে দেবতারা আনন্দধনি উচ্চারণ করেছিলেন। জগতে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করলেন। কথিত আছে যে, একই দিনে গয়ার-বোধিবৃক্ষ, রাঙ্গলমাতা গোপাদেবী, চার নিধি কুষ্ঠ, চার মঙ্গল হস্তী, অশ্বরাজ কঙ্কক, সারথি ছন্দক ও অমাত্যপুত্র উদায়ীও জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধার্থের জীবনের সাথে এন্দের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।



লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থের জন্ম

শিশু কুমারকে নিয়ে মহাসমারোহে রানি কপিলাবস্তু ফিরে এলেন। রাজ্যে খুশির বন্যা বয়ে গেল। উৎসবে মেতে উঠল নগরবাসী। কিন্তু এই আনন্দে বিষাদের ছায়া নেমে এল। রানি মায়াদেবী সাত দিন পরে মারা গেলেন। শিশু সিদ্ধার্থের লালন পালনের ভার নিলেন বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি মায়াদেবীর সহোদরা ছিলেন। গৌতমীর দ্বারা লালিতপালিত হন বলে সিদ্ধার্থ গৌতম নামে পরিচিত হলেন। বিশেষ তিনি গৌতম বুদ্ধ নামেই পরিচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

সিদ্ধার্থের জন্ম-কাহিনীটি বর্ণনা কর

পাঠ : ২

বাল্যকাল

রাজকুমার সিদ্ধার্থের জন্মের পরে তাঁকে দেখতে এলেন খৰি অসিত। তিনি মহার্ষি কালদেবল নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি শিশু রাজকুমারকে দেখে অভিভূত হয়ে প্রথমে উল্লাস প্রকাশ করলেন। একটু পরেই তাঁর দু'চোখ অশ্বুতে ভিজে গেল। মহারাজ উদ্বিঘ্ন হয়ে জানতে চাইলেন তাঁর এই অক্ষমাং আনন্দ ও বিষাদের কারণ। খৰি অসিত বললেন, 'মহারাজ, এই কুমার মহাজ্ঞনী বুদ্ধ হবেন, জগৎকে দুঃখযুক্তির পথ প্রদর্শন করবেন। এজন্যে আমি উল্লিখিত হয়েছি। কিন্তু আমি বয়োবৃন্দ। বুদ্ধের অমিয়বাণী শোনার সৌভাগ্য আমার হবে না, বহুপূর্বেই আমার মৃত্যু হবে। এজন্যে মন বিষণ্ণতায় ভরে উঠল।

বিমাতা গোতমীর পরিচর্যায় সিদ্ধার্থ পরম যত্নে বড় হতে লাগলেন। পোষা শশক ও মৃগশাবক, মরাল ও ময়ূর ছিল তাঁর খেলার সাথি। প্রাসাদ ও উদ্যানের অনুপম পরিবেশে শৈশবের দিনগুলো তাঁর আনন্দেই কাটছিল। রাজা কুমারকে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। একবার নগরে হলকর্ষণ-উৎসব হচ্ছে। ঐদিন রাজা, অমাত্যবর্গ ও সম্মান্তরা নিজের হাতে হাল বা লাঙল চালনা করে সারা বছরের কৃষিকাজের শুভসূচনা করতেন। রাজা কুমারকে নিয়ে উৎসবে যোগ দিলেন। এখানেই কুমার প্রত্যক্ষ করলেন, হলকর্ষণে ভেজা মাটি থেকে বেরিয়ে পড়া পোকামাকড়গুলোকে পাখিরা খেয়ে যাচ্ছে, ব্যাঙ এসে খাচ্ছে। একটা সাপ এসে ব্যাঙটিকে গিলে ফেলল। আবার কোথা থেকে একটা চিল উড়ে এসে সাপটিকে ছেঁ মেরে নিয়ে গেল। চোখের সামনে ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলো সিদ্ধার্থকে উদ্বিঘ্ন করে তুলল। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ ও প্রাণিকুলের এ নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি কোলাহল থেকে নির্জনে চলে গেলেন। এক বিশাল জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় বসে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। এদিকে হলকর্ষণ-উৎসব শেষ, এবার সকলের বাড়ি ফেরার পালা। কিন্তু কুমার কোথায়! চারদিকে খোজার পরে তাঁকে পাওয়া গেল জম্বুবৃক্ষের ছায়ায় ধ্যানমগ্ন। জ্যোতির্ময় আভায় উদ্ভাসিত কুমারের অবয়ব। রাজা ও অন্যেরা এ-দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। অভিবিত এ-ঘটনায় রাজাসহ সকলে বিস্রল হয়ে পড়েন। রাজা শুক্রোদয় পুনরায় স্মরণ করলেন খৰি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী। ধ্যানভঙ্গ হলে রাজা পুত্রকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

বড় বড় পঞ্চিতের কাছে তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হলো। ব্রাহ্মণপুত্র বিশ্বামিত্রের কাছে তাঁর প্রথম বিদ্যাশিক্ষা শুরু হয়। বর্ণ পরিচয়ের প্রারম্ভেই সিদ্ধার্থ তাঁর অতুলনীয় প্রতিভা প্রদর্শন করেন। প্রতিটি বর্ণ উচ্চারণের সাথে সাথে সেই বর্ণসমন্বিত একটি করে নীতিবাক্য উচ্চারিত হলো তাঁর মুখ দিয়ে। ত্রিমে তিনি নানাবিধ ভাষা, শাস্ত্র ও চৌষটি প্রকার লিপিবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। বেদ, পুরাণ, ইতিহাস, যোগ, বৈশেষিক ন্যায়, গণিত, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্রে আয়ত্ত করলেন। একই সঙ্গে রাজনীতি, মৃগয়া, অশ্বচালনা, ধনুর্বিদ্যা, রথচালনা ইত্যাদি ক্ষত্রিয়চিত দক্ষতাও আয়ত্ত করলেন সাফল্যের সঙ্গে। তবে তিনি কিছু ব্যতিক্রম আচরণ দেখালেন। যেমন অশ্বচালনায় জয়লাভ করার পূর্বক্ষণে ঘোড়ার রাশ ছেড়ে দিলেন, প্রতিদ্বন্দ্বী দেবদত্তকে বিজয়ী হওয়ার সুযোগ দিলেন। একবার মৃগয়ায় গিয়ে হাতের কাছে পেয়েও শিকার ছেড়ে দিলেন। এতে সঙ্গীরা বিরক্ত হলেও অসহায় হরিণশিশুর প্রাণরক্ষা হওয়ায় তিনি আনন্দিত হলেন।

বাল্যকালেই সিদ্ধার্থের অনন্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সিদ্ধার্থ তাঁর মেধা দিয়ে কগিলাবস্ত্র ও দেবদহ রাজ্যের মধ্যে প্রবাহিত রোহিনী নদীর পানি নিয়ে সৃষ্টি সংকটের সমাধান করেন। রোহিনী নদীতে একটি প্রকাণ বৃক্ষ পড়ে বাঁধের সৃষ্টি করে। ফলে সকল পানি কগিলাবস্ত্রের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে এবং দেবদহ নদীর পানি থেকে বাধিত হয়। উভয় নগরের অধিবাসীরা অনেক চেষ্টা করেও বৃক্ষটি স্থানচ্যুত করতে পারছিল না। অনেক মানুষের কোলাহল শুনে নিকটেই ত্রীড়ারত সিদ্ধার্থ দলবলসহ ঐস্থানে উপস্থিত হলেন। শাক্য যুবকেরা অনেক চেষ্টা করেও বৃক্ষটি নাড়াতে সমর্থ হলো না। তখন সিদ্ধার্থ গাছটির অগ্রভাগ ধরে স্নোতের অনুকূলে জোরে টান দিলেন, এতে গাছটির যে-অংশ মাটিতে দেবে গিয়েছিল সে-অংশ মাটিসহ আড়াআড়ি অবস্থান থেকে লম্বালম্বি অবস্থানে সরে গিয়ে জলের প্রবাহ উন্মুক্ত হয়।

কুমার ক্রমে কৈশোর ও যৌবনের সম্পর্কগে উপনীত হন। চপলতা ও উদ্বামতা এ-বয়সের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সিদ্ধার্থের আচরণে ভিন্নতা দেখা গেল। প্রশান্ত চিত্তে তিনি প্রায়ই প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটাতেন। কখনো কখনো সাথিদের ছেড়ে দূরে একান্তে বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

একদিন এভাবেই উদ্যানে বসে কুমার প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করছিলেন। নীল আকাশে একদল সাদা হাঁস উড়ে যাচ্ছিল। সিদ্ধার্থ মুঠ হয়ে ঐ সুন্দর দৃশ্য দেখছিলেন। হঠাৎ তীরবিদ্ধ হয়ে একটি সাদা হাঁস তাঁর কোলে এসে পড়ল, রঙাঙ্ক হাঁসটি বন্ধুণায় কাতরাচ্ছে। তীরবিদ্ধ হাঁসের কষ্ট দেখে সিদ্ধার্থের অন্তর করুণায় প্রাপ্তি হলো। তিনি স্বত্ত্বে তীরটি ছাড়িয়ে নিলেন। সেবা শুরু করে হাঁসটিকে বাঁচিয়ে তুললেন। এমন সময় আরেক রাজকুমার দেবদত্ত এসে হাঁসটি দাবি করল। বলল, কুমার, হাঁসটি আমার, আমি তীরবিদ্ধ করেছি। হাঁসটি আমাকে ফিরিয়ে দাও। সিদ্ধার্থ, হাঁসটি ফিরিয়ে দিলেন না। তিনি বললেন, তুমি হাঁসটিকে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করতে চেয়েছিলে। আমি ওর জীবন বাঁচিয়েছি। কার অধিকার বেশি? যে জীবন হরণ করতে চায়, তার? নাকি জীবন যে দান করেছে তার? দেবদত্ত কুমারের যুক্তি মানলেন না। এই বিবাদ বিচারের জন্যে প্রবীণদের কাছে উত্থাপন করা হলো। প্রবীণরা সিদ্ধার্থ গৌতমের যুক্তিকে সমর্থন করলেন, বললেন, “কুমার যথার্থই বলেছে। যে জীবন দান করেছে হাঁসের ওপর তার অধিকারই বেশি।” সিদ্ধার্থ হাঁসটি সুস্থ করে তুলে উন্মুক্ত আকাশে উড়িয়ে দিলেন।

সিদ্ধার্থ গৌতমের মধ্যে ব্যবহার, উদারতা, মৈত্রীপূর্ণ আচরণ, প্রজাময় দূরদৃষ্টি রাজঅন্তঃপুরবাসী ও প্রজাসাধারণের অন্তর জয় করেছিল। তিনি হয়ে উঠলেন সকলের প্রিয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

সিদ্ধার্থের বাল্যকালের যে কোনো একটি ঘটনা বর্ণনা কর

পাঠ : ৩

সিদ্ধার্থ গৌতম ও গোপাদেবী

সিদ্ধার্থ গৌতম ক্রমে ঘোল বছর বয়সে পদার্পণ করলেন। মহারাজ শুঙ্কোদন পুত্রের উদাসীনতা ও বৈরাগ্য ভাব অনুধাবন করে পুত্রকে সংসারী করার তাগিদ অনুভব করলেন। তিনি এক স্বয়ংবর সভার আয়োজন করলেন। কুমার সিদ্ধার্থ গৌতম রাজসভায় অশোকভাণ্ড পাশে নিয়ে বসলেন। বিভিন্ন রাজ্য থেকে সুন্দরী রাজকন্যা ও শ্রেষ্ঠীকন্যারা একের পর এক আসলেন। কুমার অশোকভাণ্ড হতে উপহারসামগ্রী তাঁদের হাতে তুলে দিলেন। এভাবে সারাদিন কেটে গেল। অশোকভাণ্ড নিঃশেষ, কুমার কোন রাজকন্যাকেই পছন্দ করতে পারলেন না। আসন ছেড়ে উঠে যাবেন, এমন সময় প্রবেশ করলেন প্রতিবেশী রাজ্য কোলীয় গণতন্ত্রের লাবণ্যময়ী রাজকন্যা সুশ্মিতাবিনী যশোধরা গোপা। অশোকভাণ্ড শেষ। কুমার ইতস্তত বোধ করলেন। তখন দণ্ডপাণি-কন্যা যশোধরা মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার জন্যে কি কোনো উপহার নেই? রাজপুত্র সিদ্ধার্থ মুহূর্তে নিজ অঙ্গুরীয়টি গোপাদেবীকে পরিয়ে দিলেন। এ-দৃশ্যে সভায় উপস্থিত সকলে আনন্দে মেতে উঠল।

রাজা শুঙ্কোদন গোপার পিতা দণ্ডপাণির নিকট পুত্রের বিবাহের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠান। প্রস্তাব পেয়ে দণ্ডপাণি আনন্দিত হলেন। কিন্তু তিনি জানালেন যে কুলপ্রথা অনুযায়ী তাঁদের কন্যার পাণিপ্রার্থীকে অশ্঵চালনা, ধনুর্বাণ, অসিচালনা প্রভৃতিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হবে। অতএব নির্ধারিত দিনে দেশ-বিদেশের ক্ষত্রিয় কুমারদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায়

অবতীর্ণ হলেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ। অশ্চালনা, ধনুর্বাণ, অসিচালনা একে একে সবকটিতেই তিনি জয়লাভ করে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করলেন। সভামণ্ডে গোপা সিদ্ধার্থের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিলেন।

বৌধিসত্ত্বের জন্ম-জন্মান্তরের সাথি যশোধরা গোপার সঙ্গেই সিদ্ধার্থ গৌতমের পরিণয় হয়ে গেল। মহা ধূমধামের সাথে মহারাজ শুক্রদণ্ড পুত্রের বিবাহউৎসব করলেন। গৌতম সংসারী হলেন, রাজাও চিন্তামুক্ত হলেন।

পাখির কলকাকলিতে মুখর, পুষ্পশোভিত উদ্যানে নির্মিত ভিন্ন খাতু উপযোগী সুরম্য প্রাসাদে আনন্দে কাটতে লাগল কুমার সিদ্ধার্থ ও রাজবধূ গোপাদেবীর দিনগুলি। কোথাও কোনো কষ্ট নেই, দুঃখ নেই। জগৎ যেন আনন্দময়।

অনুশীলনমূলক কাজ
রাজা কীভাবে চিন্তামুক্ত হলেন?

পাঠ : ৪

চারি নিমিত্ত দর্শন

সিদ্ধার্থ একদিন ভ্রমণে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মহারাজ শুক্রদণ্ড পুত্রের ভ্রমণ যেন আনন্দময় হয় সে-ব্যবস্থা করলেন। সারথি ছন্দককে নিয়ে রাজকুমার নগরভ্রমণে বের হলেন। সঙ্গে প্রিয় অশ্ব কস্তুর। অনেক দূর তাঁরা ভ্রমণ করলেন। নগরী সুসজ্জিত, নগরবাসী সুসজ্জিত ও সুখী। সকলেই কুমারকে আনন্দের সাথে অভ্যর্থনা জানাল। আরও কিছু দূর অগ্রসর হলেন, হঠাৎ দেখতে পেলেন একজন বৃক্ষ, দুর্বল ও পক্ষকেশ, লাঠিহাতে শীর্ণ শরীরে বহু কষ্টে হেঁটে চলেছেন। সিদ্ধার্থ ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে ছন্দক? সাদা চূল, স্তুল চর্ম, দুর্বল শরীর? ছন্দক জানালেন, “ইনি বয়সের কারণে বৃক্ষ হয়েছেন, বয়স বাড়লে সবাই একদিন এমন বৃক্ষ ও দুর্বল হয়ে যায়।” সিদ্ধার্থ ভাবলেন, আমিও একদিন এমন বৃক্ষ হব? প্রিয়তমা গোপাদেবীও বৃক্ষ হবে? তিনি ছন্দককে বললেন, রথ ফিরাও। আজ আর ভ্রমণ করব না।

পরদিন আবার নগরভ্রমণে বের হলেন। নগরের বাইরে এসে দেখতে পেলেন এক ব্যক্তি গাছের তলায় হাহাকার করছে, বেদনায় তার মুখ-চোখ কুঁকড়ে গেছে। সিদ্ধার্থ আবার ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, “এর কী হয়েছে?” ছন্দক জানাল, ও ব্যাধিগ্রস্ত। মানুষমাত্রই কোনো না কোনো সময় রোগ ব্যাধি ভোগ করে থাকে। কুমার আবারও বিষণ্ণ হলেন। গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। সেদিনও প্রাসাদে ফিরে গেলেন। প্রাসাদে ফিরে কুমার ভাবতে লাগলেন, ঐ বৃক্ষ আর ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের কথা। সবাই কি এমন বৃক্ষ হবে? ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে সকল মানুষকে কি এরূপ কষ্ট পেতে হয়?

এভাবে তৃতীয় দিন চিন্তামগ্নি সিদ্ধার্থ পুনরায় সারথি ছন্দককে নিয়ে অশ্ব কস্তুরের পিঠে চড়ে নগরভ্রমণে বের হলেন। নগরের বাইরে কিছু দূরে এসে তিনি দেখতে পেলেন কিছু লোক একটি শবদেহ কাঁধে নিয়ে বিলাপ করতে করতে যাচ্ছে। শোকাচ্ছন্ন এই দলটিকে দেখে সিদ্ধার্থ ছন্দকের কাছে জানতে চাইলেন, ওদের কী হয়েছে? ওরা কাঁদছে কেন?

ছন্দক বিমর্শ চিন্তে জানালেন, ওরা একটি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। মৃত ব্যক্তি ওদের নিকটআত্মীয়। আপনজনের মৃত্যুতে তারা শোকে বিলাপ করছে। সিদ্ধার্থ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বিলাপ করলে কি মৃত ব্যক্তি জীবিত হবে? ছন্দক বললেন, “না কুমার মৃত ব্যক্তিরা জীবিত হয় না।” তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, ‘সবাইকে কি এরূপ

মৃত্যুবরণ করতে হবে?” ছন্দক উত্তর দিলেন, “হঁয়া কুমার, জীবিত সবাইকেই একদিন মারা যেতে হয়।” জীবের এই পরিণতি দেখে সিদ্ধার্থ অত্যন্ত কাতর হলেন। বিষণ্ণ মনে ফিরে এলেন প্রাসাদে।

চতুর্থ দিনে নগরভ্রমণে বেরিয়ে তিনি নগরের বাইরে বেশ কিছু দূরে নির্জন জায়গায় বড় গাছের তলায় একজন সন্ন্যাসীকে ধ্যানমণ্ড অবস্থায় দেখতে পেলেন। স্থির, সৌম, ধ্যানমণ্ড সন্ন্যাসীকে দেখে সিদ্ধার্থ আকৃষ্ট হলেন। ছন্দককে প্রশ্ন করলেন, ইনি কে? কী করছেন? ছন্দক উত্তর দিলেন, ইনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। সংসারের মায়া ত্যাগ করে তিনি সত্য জ্ঞানের জন্য সাধনা করছেন। মুহূর্তে সিদ্ধার্থ গৌতমের সন্ন্যাস-চেতনা জাগ্রত হলো। সন্ন্যাসীর মধ্যে নিজেকে দেখতে পেলেন তিনি। জগতের দুঃখ, জরা, ব্যাধি থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করতে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। ছন্দককে রথ ফেরানোর আদেশ দিলেন।

নগরভ্রমণে বেরিয়ে সিদ্ধার্থ জরা ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাসী দেখে মানবজীবনের পরিণতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। একেই সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শন বলা হয়ে থাকে।

অনুশীলনমূলক কাজ

চারি নিমিত্তগুলো কী বর্ণনা কর

পাঠ : ৫

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ



সিদ্ধার্থের মহাভিন্নমণ

চার নিমিত্ত দর্শনের পরে সিদ্ধার্থ গৌতমের মনে শান্তি নেই। সব সময়ই তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এই ভবুণ সন্ন্যাসীর গভীর ধ্যানমগ্ন দৃশ্যটি গৌতমের মনে দাগ কেটেছে। তিনিও দুঃখমুক্তির সঙ্গানে গৃহত্যাগ করবেন সিদ্ধান্ত নিলেন। গৃহত্যাগের আগে তিনি পিতার অনুমতি নেওয়ার কথা ভাবলেন। পিতার নিকট গিয়ে তিনি তাঁর সংকল্পের কথা জানালেন। পুত্রের কথা শুনে রাজা যেন বজ্রাহত হলেন। অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করে প্রাণাধিক পুত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি শাক্যরাজ্যের রাজপুত্র, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, তোমার কিসের অভাব যার জন্যে তুমি সংসার ত্যাগ করতে চাও? সিদ্ধার্থ উত্তরে বললেন, চারটি বিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পারলে আমি সংসারত্যাগ করব না :

১. আমি কোনোদিন জরাহস্ত হব না, চিরযৌবনপ্রাপ্ত হব ;
২. আমি কোনোদিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হবনা ;
৩. মৃত্যু কোনোদিন আমার জীবন কেড়ে নেবে না এবং
৪. অক্ষয় সম্পদ যেন আমি লাভ করি।

পুত্রের শর্ত শুনে রাজা অবাক হয়ে বললেন, এ অসম্ভব! জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে রোধ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এ-শর্ত প্রত্যাহার কর পুত্র। তখন সিদ্ধার্থ বললেন, মৃত্যুও যে-কোনো সময় আমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। যে-গৃহে আগুন লাগে সে-গৃহ পরিত্যাগ্য। আমি গৃহত্যাগ করার সংকল্প করেছি। রাজা বুঝতে পারলেন মহৎ কর্তব্যসাধনে পুত্র সংকল্পবদ্ধ, তাঁকে আর বেঁধে রাখা যাবে না। তিনি সিঙ্গ কষ্টে বললেন, পুত্র! তোমার মনক্ষামনা পূর্ণ হোক। পিতাকে প্রণাম করে অশ্রুসজ্জল নয়নে সিদ্ধার্থ পিতৃকক্ষ ত্যাগ করলেন।

এর মধ্যে গোপাদেবীর কোল আলো করে একটি পুত্র সন্তানজন্ম নিল। পুত্রের জন্মের খবর পেয়ে গৌতম নিজের অজ্ঞানে বলে উঠলেন, ‘রাহুল জন্মেছে, বন্ধন উৎপন্ন হয়েছে।’ দৃতমুখে এ কথা জানতে পেরে রাজা শুন্দোদান পৌত্রের নাম রাখলেন ‘রাহুল’। এদিকে গৌতম সিদ্ধান্ত নিলেন, এ-বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। ওদিকে রাজা গৌতমকে আনন্দে রাখার জন্য নৃত্য গীতের আয়োজন করলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ আমোদ-প্রমোদে মনসংযোগ করতে পারলেন না, ঘুমিয়ে পড়লেন। নর্তকীরাও কুমারকে নিত্রিত দেখে ইতস্ততভাবে এখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়ল। গৌতম জেগে উঠে এদের এলোমেলোভাবে ঘুমন্ত দেখে আরও বিরক্ত হলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, আজই গৃহত্যাগ করতে হবে। আষাঢ়ী পূর্ণিমার রাত, জ্যোৎস্নায় আলোকিত নগরী। কুমার শেষবারের মতো গোপাদেবীর ঘরে গেলেন। দেখলেন শিশুপুত্র রাহুল মায়ের সঙ্গে ঘুমাচ্ছে। পুত্রের নিষ্পাপ মুখখানা দেখে তিনি একটু মায়া অনুভব করলেন, ভাবলেন, একটু আদর করবেন। কিন্তু আদর করতে গেলে গোপা জেগে উঠতে পারেন। নিজেকে নিবৃত্ত করলেন। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সারথি ছন্দককে ডেকে তুললেন। নির্দেশ দিলেন ঘোড়াকে প্রস্তুত করতে। ছন্দক অশ্বরাজ কষ্টককে সজ্জিত করে নিয়ে এলেন। সিদ্ধার্থ গৌতম কষ্টকের পিঠে চড়ে নগর থেকে বেরিয়ে ছুটে চললেন। তারপর তিনি অনোমা নদীর তীরে পৌছালেন। এবার বিদায়ের পালা। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে গৌতম তরবারি দিয়ে নিজের দীর্ঘ কেশ কর্তন করলেন। রাজপোশাক ও অলংকারগুলো খুলে ফেললেন। মুকুটটি ছন্দকের হাতে দিয়ে বললেন, “পিতাকে দিও।” রাজপোশাক ও অলংকার মায়ের হাতে দিতে বললেন। গোপাদেবীকে তাঁর পাদুকাদ্বয় আর পুত্র রাহুলকে সোনার তরবারি দিতে বললেন। আদেশ দিলেন, ছন্দক তুমি এবার ফিরে যাও। গৌতমের বিয়োগব্যথা সইতে না পেরে কষ্টক তখনই প্রাণত্যাগ করল। শোকাচ্ছন্ন ছন্দক ফিরে গেলেন কপিলাবস্তুতে। রাজপুত্র রাজ সুখ ত্যাগ করে হলেন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। গৌতম একাকী হেঁটে চললেন অনোমা নদীর তীর ধরে গভীর বনের দিকে।

আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে উন্নিশ বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থের এই গৃহত্যাগ বৌদ্ধ সাহিত্যে ‘মহাভিন্নক্ষমণ’ নামে অভিহিত ।

অনুশীলনমূলক কাজ

গৃহত্যাগের পূর্বে সিদ্ধার্থ পিতাকে কী শর্ত দিয়েছিলেন?
সিদ্ধার্থের পুত্রের নাম রাখ্তল কেন হলো?

পাঠ : ৬

বুদ্ধত্বলাভ

রাজগৃহ ছেড়ে নদী বন পাহাড়ে ঘেরা প্রকৃতির কোলে চলে এলেন গৌতম । ঋষিদের আশ্রমে কিছুকাল অবস্থান করে বৈশালী নগরে পৌছলেন । এখানে ঋষি আরাড় কালামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন, শিক্ষালাভ করলেন দর্শন । সমাধির সাত স্তরও অনুশীলন করলেন । কিন্তু তাঁর নিকটও গৌতমের জ্ঞান অর্জনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো না । তিনি রাজগৃহে ফিরে গেলেন । এখানে রত্নগিরি পর্বতের গুহায় কিছুকাল অবস্থান করেন । এ গুহা ছিল বহু সাধকের আবাসস্থল । তিনি সেই সাধকদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করলেন । একদা ভিক্ষা সংগ্রহের সময়ে রাজা বিহিসার এই তুরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে আকৃষ্ট হলেন । ডেকে পাঠালেন রাজপুরীতে । অনুরোধ করলেন কঠোর সন্ন্যাসজীবন ত্যাগ করে রাজসভায় উচ্চ পদ গ্রহণ করতে । কিন্তু যিনি রাজসিংহাসন ছেড়ে এসেছেন, উচ্চ পদ কিংবা সম্পদ কি তাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারবে? তিনি তো রাজগ্রীষ্ম বিসর্জন দিয়েছেন ।

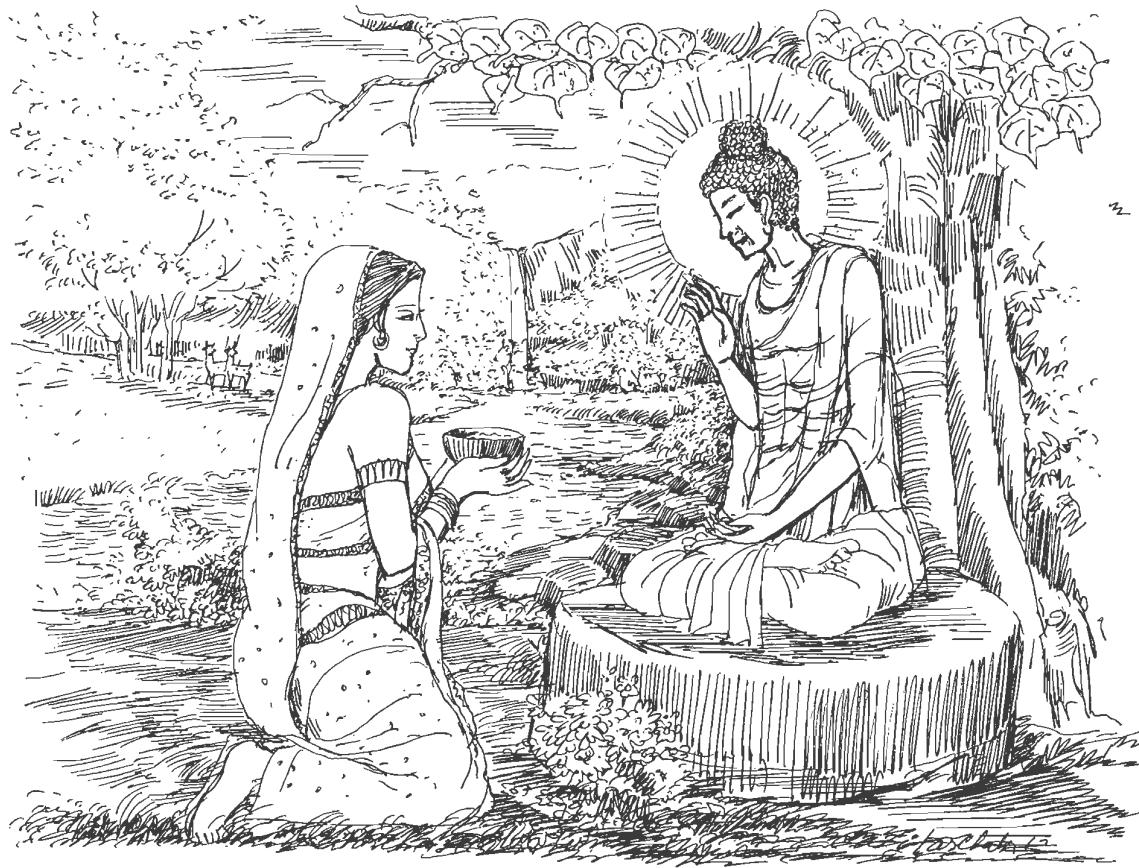
সমসাময়িক প্রথ্যাত শিক্ষাগুরু রামপুত্র রংদ্রকের নিকট কিছুকাল ধর্মচর্চা করলেন । একসময় তিনি গুরুর সমকক্ষতা অর্জন করলেন । সেইসঙ্গে উপলক্ষি করলেন, গুরুর শিক্ষা ও সাধনপ্রণালী অনেক উচ্চমার্গের হলেও এ দ্বারা সত্যজ্ঞান লাভ সম্ভব নয় । তিনি গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজগৃহ ত্যাগ করলেন । আরাড় কালামের তিন শিষ্য—কৌণ্ডিন্য, বঞ্চ ও অশ্বজিৎ এবং গুরু রামপুত্র রংদ্রকের দুই শিষ্য— মহানাম ও ভদ্রিয় তাঁর সাথে যোগ দেন ।

রাজগৃহ থেকে অনেক হেঁটে পৌছলেন উরুবেলায় । স্থানটি প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে ঘেরা । তিনি সেনানী নামে একটি গ্রামে এলেন । পাশেই গভীর বন । বয়ে চলেছে স্ন্যাতকীনী নদী-নৈরঞ্জনা । এ-নদীর আরেক নাম ফল্লু । নির্জন প্রকৃতি গৌতমকে সব সময়ই আকৃষ্ট করত । ফলে জ্ঞানগাটি তাঁর খুব পছন্দ হলো । সিদ্ধান্ত নিলেন, দুঃখের শেষ জানার জন্য এখানেই তপস্যায় রত হবেন ।



ধ্যানস্থ সিদ্ধার্থ গৌতম

কঠোর সাধনায় পেরিয়ে গেল ছয়টি বৎসর। জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে গেলো গৌতমের সুন্দর দেহসৌষ্ঠব। দুর্বল শরীরে হাঁটা-চলায় অক্ষম হয়ে গেলেন। তিনি এতই দুর্বল ছিলেন যে একদিন নদীতে স্নান করতে নেমে আর উঠতে পারছিলেন না। অনেক কষ্টে পাশের একটি বড় গাছের শাখা ধরে তিনি পারে উঠতে সক্ষম হলেন। তিনি অনুধাবন করলেন, এভাবে কঠোর সাধনা তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে। দুঃখমুক্তির উপায় জানা সম্ভব হবে না। তিনি উপলক্ষ্মি করলেন, অল্প অল্প আহার করে মধ্যপথ অবলম্বন করে সাধনার প্রকৃত পথ। কঠোর সাধনা বা বিলাসী জীবন, কোনোটিই দুঃখমুক্তির অনুকূল নয়। সুতরাং তিনি মধ্যম পথ অবলম্বন করলেন।



সুজাতা বুদ্ধকে পায়েস দান করছেন

শ্রমণ গৌতমকে আহার করতে দেখে অনুগামী পাঁচজন শিষ্য কোণ্ঠিয়, বশ্ল, ভদ্বিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। তিনি একা হয়ে গেলেন। একদিন স্নান করে তিনি বিশাল অশ্বথ বৃক্ষের তলায় উপবেশন করলেন। এসময় সুজাতা নামে সেনানী গ্রামের এক গৃহবধূ শ্রমণ গৌতমকে পায়েস দান করলেন। গৌতম সুজাতার পায়েস গ্রহণ করলেন। ঐদিন ছিল বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি। পায়সান্ন খেয়ে তিনি পুনরায় ধ্যানে বসলেন। প্রতিজ্ঞা করলেন, বুদ্ধত্ব লাভ না করে তিনি এই আসন থেকে উঠবেন না।

আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ। অশ্বথমূলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গৌতম গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। দুঃখ-মুক্তি অন্বেষায় তিনি সাধনারত। ধরণী প্রকস্পিত হলো। লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা, ভয়ভীতি প্রভৃতি অশুভ শক্তির প্রতীক মার তাঁর এই প্রতিজ্ঞায় ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁকে লক্ষ্যচ্যুত করার জন্য দলবলসহ মার নানারকম চেষ্টা করতে থাকল। তুমুল যুদ্ধ হলো। রতি, আরতি ও তৃষ্ণা — মারের এই তিনি কল্যাপ পুষ্পধনু ও পঞ্চশশ নিয়ে ধ্যানমগ্ন বোধিসত্ত্বকে আক্রমণ করল। তাঁর তপোভঙ্গ করার জন্য নানারকম অঙ্গভঙ্গ প্রদর্শন ও ছলনা করতে থাকল। শুরু হলো মারের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ। তিনি দৃঢ়কষ্টে ঘোষণা করলেন, যদি পর্বত, মেরু স্থানচ্যুত হয়, সমস্ত জগৎ শূন্যে মিশে যায়, সমস্ত নক্ষত্র, জ্যোতিষ্ঠ ও ইন্দ্রের সাথে ভূমিতে পতিত হয়, বিশ্বের সকল জীব একমত হয় এবং মহাসমুদ্র শুকিয়ে যায়, তথাপি আমাকে এই আসন থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারবে না।' যুদ্ধে মার শাক্য সিংহের নিকট পরাজিত হলো। বোধিজ্ঞান লাভ করে সিদ্ধার্থ গৌতম 'বুদ্ধ' হলেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বছর।

ধ্যানে বসে তিনি রাতের প্রথম প্রহরে জাতিস্মর জ্ঞান বা পূর্বজন্মের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করলেন। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে দিব্যচক্ষুসম্পন্ন হলেন। তৃতীয় প্রহরে জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর উৎপত্তির বিষয়ে অবগত হলেন। চার আর্যসত্য উপলব্ধি করলেন। দুঃখনিরোধের উপায় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আবিষ্কার করলেন।



বোধিজ্ঞান লাভের পর গৌতম বুদ্ধ

‘বোধি’ শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। ‘বোধি’ অর্জন করে তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন। যে-অশ্বথ গাছের নিচে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করলেন তার নাম হলো ‘বোধিবৃক্ষ’ বা বোধিমুক্ত। তিনি জগতে গৌতমবুদ্ধ নামে পরিচিত হন। যে-স্থানে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন তা ‘বুদ্ধ গয়া’ নামে পরিচিতি লাভ করে।

বুদ্ধত্বলাভের পরে তাঁর বোধিসত্ত্ব জীবনের সমাপ্তি হয়। তিনি নির্বাণ মার্গের জ্ঞান লাভ করেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই আমাদের সকল দুঃখের কারণ। অবিদ্যার ধ্বংসের দ্বারা দুঃখের বিনাশ সম্ভব।

বুদ্ধত্বলাভের পরে তিনি হলেন জ্যোতির্ময়, জগতে ধ্বনিত হলো আনন্দধ্বনি। তৃষ্ণার ক্ষয় করে তিনি দুঃখকে জয় করেছেন, জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছিন্ন করেছেন। পরবর্তী সাত দিন তিনি বোধিবৃক্ষের নিচে বজ্রাসনে বসে সুখলাভ করলেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে ঈশ্বান কোণে দাঁড়িয়ে বোধিবৃক্ষের দিকে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলেন।

ত্রুটীয় সঙ্গাহে বোধিবৃক্ষের চারপাশে চংক্রমন করলেন। চতুর্থ সঙ্গাহে রতন ঘর চৈত্যে বসে বিমুক্তি সুখ অনুভব করলেন। পঞ্চম সঙ্গাহে অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ তলে পদ্মাসনে বসে ধ্যানস্থ থাকলেন। ষষ্ঠ সঙ্গাহে মুচলিন্দ বা মুচকুন্দ বৃক্ষের নিচে ধ্যানে অতিবাহিত করলেন। সপ্তম সঙ্গাহ রাজায়তন বৃক্ষের নিচে ধ্যান করে অতিবাহিত করলেন। এখানে তিনি রাগসুখ, ফলসুখ ও বিমুক্তিসুখ উপভোগ করলেন। সাত সঙ্গাহশেষে যখন বুদ্ধের ধ্যানভঙ্গ হলো তখন সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তপস্সু ও ভল্লিক নামক দুই বণিক। রাজায়তন মূলে ধ্যানাবিষ্ট জ্যোতির্ময় মহাপুরুষকে দেখে তাঁরা মধু ও পিঠা দ্বারা তাঁকে পূজা করলেন। বুদ্ধ সানন্দে গ্রহণ করলেন বণিকদ্বয়ের শ্রদ্ধাদান। সুজাতার পায়সান্ন প্রহণের উন্মপঞ্চাশ দিন পরে এই তাঁর প্রথম আহার। বুদ্ধ শ্রদ্ধাদান অনুমোদনকালে তাঁর অভিনব দ্রুংখমুক্তির পথ সম্পর্কে দেশনা করলেন। কৃতার্থ বণিকদ্বয় বুদ্ধ ও ধর্মের শরণ নিলেন। বুদ্ধের প্রথম উপাসক হওয়ার গৌরব লাভ করে ধন্য হলেন তপস্সু ও ভল্লিক। তখনও সজ্জ গঠিত না হওয়ায় তাঁরা ‘ছি-বাচিক উপাসক’ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বুদ্ধ তাঁর স্মৃতিবিজড়িত সাতটি স্থান, যথা : বোধি মূল (বোধি পালক), অনিমেষ চৈত্য, চংক্রমন চৈত্য, রতন ঘর চৈত্য, অজপাল ন্যাগ্রোধ বৃক্ষ, মুচলিন্দ মূল ও রাজায়তন বৃক্ষ প্রভৃতি স্থান বৌদ্ধশাস্ত্রে সপ্ত মহাস্থান নামে অভিহিত। বৌদ্ধরা পরম শুদ্ধার সঙ্গে এ সপ্ত মহাস্থানের উদ্দেশে বন্দনা নিবেদন করে থাকে।

অনুশীলনমূলক কাজ

রাজা বিষ্ণুসার সিদ্ধার্থকে কী প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

‘মধ্যম পথ’ বলতে কী বোবা?

কারা ছি-বাচিক উপাসক ছিলেন?

সপ্ত মহাস্থানের নাম লেখ

পাঠ : ৭

ধর্মপ্রচার

বুদ্ধত্বলাভের পরে বুদ্ধ তাঁর নবলক্ষ্ম ধর্মপ্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্যে তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমাতিথিতে সারবাথের খালি পতন মৃগদাবে উপস্থিত হলেন। ঐখানে তখন অবস্থান করছিলেন তাঁর পূর্বের পাঁচ সঙ্গী : কোণিন্দ্য, বঞ্চ, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। এঁদের কাছেই তিনি প্রথম নবলক্ষ্ম ধর্মপ্রচার করলেন। এঁরাই বুদ্ধের কাছে প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্তি ভিক্ষু। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এঁরা পঞ্চবর্গীয় শিষ্য নামে পরিচিত। তাঁদের দীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো ‘ভিক্ষুসংঘ’। বুদ্ধের প্রথম ধর্ম-দেশনা ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ নামে খ্যাত। বুদ্ধ দেশনা করলেন, নবআবিস্কৃত চতুর্বার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমূৎপাদ তত্ত্ব, অনিত্য ও অনাত্মবাদ ইত্যাদি। পঞ্চশিল্যগণ বিমুক্ত চিত্তে সারারাত ধরে নবধর্মের অমৃতময় বাণী শ্রবণ করলেন। বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিয়ে ঐ তপোবনেই প্রথম বর্ষাবাস শুরু করলেন। এ-সময়ে শ্রেষ্ঠপুত্র যশ ও তাঁর চার বন্ধু সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়ে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্য গ্রহণ করেন। এঁদের অনুসারী আরও পঞ্চাশজন যুবকও ভিক্ষু হলেন। বুদ্ধ এই ভিক্ষুসংঘকে বর্ষাবাসশেষে দিকে দিকে অনন্য এই ধর্মপ্রচারে প্রেরণ করলেন। তিনি বললেন ‘মুত্তাহং ভিক্খবে সবপাসেহি, যে দিববা যে চ মানুসা, তুম্হে পি ভিক্খবে মুত্তা সবপাসেহি যে দিবব যে চ মানুসা, চরথ ভিক্কবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় লোকানুকম্পায, অথায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং মা একন দ্বে অগমিথ, দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদিকল্যাণং, মঞ্জে কল্যাণং পরিযোসানকল্যাণং।’ অর্থাৎ হে ভিক্ষুগণ ! আমি দেব-মনুষ্য এবং সকলপ্রকার সংযোজন হতে মুক্ত। ভিক্ষুগণ ! তোমরাও দেব-মনুষ্য এবং সকলপ্রকার সংযোজন হতে মুক্ত হও। হে ভিক্ষুগণ ! বহুজনের মঙ্গলের জন্য, কল্যাণের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়। দুজন একত্রে গমন করবে না, প্রচার কর সেই ধর্ম যে ধর্মের আদিতে, যথ্যে এবং অন্তে কল্যাণ।’ বুদ্ধ এরূপ নির্দেশ প্রদান করে নিজে উরুবেলার সেনানী গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।



সারনাথে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মাঝে বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করছেন।

উরূবির্বের পথে এক নিবিড় বন। সেই বনের মধ্যে বিশাল বৃক্ষের সুশীলত ছায়ায় বুদ্ধ মধ্যাহ্নে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। এমন সময় একদল যুবক হৈচে করে তাঁর নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করল, অভু! আপনি কি এ পথ দিয়ে কোনো স্ত্রীলোককে যেতে দেখেছেন? তখন বুদ্ধ বললেন, কুমারগণ! স্ত্রীলোকে তোমাদের কী প্রয়োজন? যুবকগণ জানাল, ‘ঐ স্ত্রীলোক নগর-নন্দিকা, আমাদের সংঙ্গে প্রমোদবিহারে এসেছিল। আমরা সকলে প্রমোদে মেতে উঠেছিলাম। এ সুযোগে নগর-নন্দিকা আমাদের মূল্যবান বস্ত্রাদি-জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেছে। আমরা এখন তার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।’ তথাগত এবার যুবকদের প্রশ্ন করলেন, কুমারগণ! তোমাদের পক্ষে কোনটি শ্রেয়কর বিবেচনা কর – এ গণিকা অন্ধেষণ কিংবা আত্মানুসন্ধান? আত্মানুসন্ধান? সে আবার কী! কুমারগণ অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল। বুদ্ধ তাদের শাস্ত হয়ে বসতে বললেন, তারাও বুদ্ধকে বন্দনা করে সামনে বসলেন। অতঃপর বুদ্ধ যুবকদের আত্মানুসন্ধান কী ব্যাখ্যা করলেন, শোনালেন ধর্মকথা। এতে যুবকদের জ্ঞানোদয় হলো। তাঁরা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিলেন।

উরূবেলার পথে পথে তিনি অনেককে এই কল্যাণধর্মে দীক্ষিত করলেন। এঁদের মধ্যে অগ্নিউপাসক কশ্যপ ভাত্ত্ব্রহ উল্লেখযোগ্য। প্রতিশ্রূতি অনুযায়ী তিনি রাজগংহে গিয়ে রাজা বিষ্ণুসারের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। রাজা তাঁকে ‘বেণুবন বিহার’ দান করেন। এ বিহারেই সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন পঞ্চশ জন শিষ্যসহ বুদ্ধের ধর্ম গ্রহণ করেন। এখানেই বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের জন্য বিনয় বিধান প্রবর্তন করেন। রাজগংহ থেকে তিনি কপিলাবস্তুতে যান। সেখানে পিতা শুক্রদান, মাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তৎপর তিনি গোপাদেবীকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। আনন্দ, দেবদণ্ড, অনিরুদ্ধ, ভৃগু, কিষ্মিল, ভদ্রিয় প্রমুখ শাক্যকুমারগণ এসময় বুদ্ধের নিকট প্রবেজ্যা গ্রহণ করেন। এঁদের সহচর নাপিতপুত্র উপালিও একইসঙ্গে প্রবেজ্যা নেন। বৈমাত্রেয় আতা সুন্দর নন্দকেও বুদ্ধ প্রবেজ্যা দেন। পুত্র রাহুলকে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষা দিয়ে তিনি বুদ্ধ শাসনের উত্তরাধিকার দেন। রাজা শুক্রদান পুত্রন্মেহবশত বুদ্ধকে রাজ্যভার গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। উত্তরে বুদ্ধ রাজাকে এক্ষণ্প বলেন, “মহারাজের অপরিসীম পুত্রন্মেহ আমার অপরিজ্ঞাত নয়। কিন্তু আপনার

স্নেহড়ের তো এখন ছিল হয়েছে। আপনার সেই পুত্রগীতির দৃষ্টি দিয়ে আপনি আপনার প্রজাতন্দের দিকে তাকান। তাদের প্রত্যেককে আপনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করুন এবং সকল মানুষকে, এমনকি প্রত্যেকটি জীবকে আপনি ভালোবাসুন। তা হলে আপনি সিদ্ধার্থের ন্যায় অগণিত সন্তান লাভ করবেন এবং পরিণামে নির্বাণ সুখের অধিকারী হবেন।” এভাবে বিমুক্ত পুরুষ ভগবান বুদ্ধ স্নেহশীল পিতাকে একজন আদর্শ প্রজাপালক, ধার্মিক নরপতির করণীয় বিষয়ে সচেতন করেন।

এক সময় শাক্য ও কেলিয়দের মধ্যে রোহিণী নদীর জল নিয়ে বিবাদ হয়েছিল। বুদ্ধ সে-বিবাদ মীমাংসার জন্য বৈশালী থেকে কপিলাবস্তু যান। এসময় পাঁচশত শাক্যকুমার ভিক্ষুসংঘে যোগদান করেন। তাঁদের স্ত্রীগণ মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুণীত্বত গ্রহণ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বৈশালীতে চলে যান। মহাপ্রজাপতি ও তাঁর সহচারিণীগণ হতাশ না হয়ে কেশ কর্তন এবং কাষায়বন্ধ পরিধান করে বৈশালী পর্যন্ত বুদ্ধের অনুগমন করেন। তাঁরা ক্ষতবিক্ষিত পায়ে বিহারে উপস্থিত হয়ে দ্বিতীয়বার বুদ্ধকে অনুরোধ জানান। শেষে আনন্দ থের তাঁদের ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষা দেয়ার জন্য বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা জানান। অবশেষে বুদ্ধ প্রার্থনা অনুমোদন করলে মহাপ্রজাপতি গৌতমীর বাসনা পূর্ণ হয়। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর নেতৃত্বে গোপা ও অন্যান্য শাক্য নারীদের নিয়ে ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে নারীগণ সম্বৃক্ত হলেন।

ভিক্ষুণীসংঘ প্রতিষ্ঠা করা প্রসঙ্গে বুদ্ধ প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন, “হে আনন্দ! পুরুষের ন্যায় নারীরাও শ্রামণ্যফলের অধিকারী হতে পারে।” তিনি আরও বলেন, ‘‘নারীরা উচ্চতর শ্রামণ্যফল লাভের যোগ্য এবং ক্ষেমা, উৎপলবর্ণা, ধর্মদিনা, ভদ্রকপিলানীর ন্যায় ভিক্ষুণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে আমার প্রবর্তিত শাসনের মঙ্গল ব্যতীত অঙ্গল হবে না।’’ তিনি আরও বলেন, মার্গফললাভে নারী পুরুষের সমকক্ষ, কোনো তারতম্য নেই।

বুদ্ধ একসময় শ্রাবণ্তীতে অবস্থান করছিলেন। কৃশা গৌতমী নামে এক অসহায় নারীর একমাত্র শিশুপুত্রটি মারা যায়। তিনি পুত্রশোকে পাগলিনীপ্রায় হয়ে বুদ্ধের কাছে ছুটে এসে তাঁর একমাত্র ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনুরোধ করেন। তথাগত বুদ্ধ অবগত আছেন মৃতের প্রাণ ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। কিন্তু এই শোকার্ত নারীর শোক উপশম করতে হবে। প্রকৃত সত্য বোঝাতে হবে। বুদ্ধ শাস্ত, ধীর কঠে কৃশা গৌতমীকে বললেন, তুমি এমন গৃহ থেকে এক মুর্ঠো সরিয়া নিয়ে এসো, যেখানে কখনো পিতা, মাতা, আতা, ভগিনী, পুত্র-কন্যা অথবা অন্য কারও মৃত্যু হয়নি। শোকার্ত জননী মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে সারাদিন শ্রাবণ্তীর দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন একমুর্ঠো সরিয়ার সন্ধানে। কিন্তু সরিয়া পেলেও এমন কোনো গৃহ খুঁজে পেলেন না যেখানে কেউ মারা যায়নি। শ্রান্ত-অবসন্ন কৃশা গৌতমী দিনশেষে অনুধাবন করলেন, সকলেই মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুই মানুষের অবশ্যস্তাবী পরিণতি, তাঁর পুত্রও এর ব্যতিক্রম নয়। অতঃপর তিনি বুদ্ধের কাছে ফিরে এলেন। বুদ্ধ বললেন, যে-ব্যক্তি মৃত্যু দ্বারা আক্রান্ত কোনোভাবেই তাকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। জীবিত ব্যক্তিমাত্রই মৃত্যুর অধীন। একথা শ্রবণ করে কৃশা গৌতমীর শোক উপশম হলো, তাঁর জ্ঞানোদয় হলো। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশ করলেন। এভাবেই বুদ্ধ শরণাগতদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সত্য উপলক্ষ করতে সাহায্য করতেন।

বুদ্ধের সময়কালে জাতিভেদ প্রথা চরম আকার ধারণ করেছিল। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর সঙ্গে সকল পেশা ও জাতি-গোত্রের মানুষের প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করেন। বৌদ্ধধর্মে কোনোরূপ শ্রেণিভেদ, জাতিভেদ কিংবা বর্ণবিশেষম্যের স্থান নেই। ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ, মগধের রাজা বিষিসার, কোশলের রাজা প্রসেনজিতসহ বিভিন্ন রাজণ্যবর্গ, নাপিতপুত্র উপালি, ক্ষত্রিয় রাজপুত্রগণ, নগরশোভিনী আশ্রমপালি, অস্পৃশ্য সুনীত, শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক, দাসী পূর্ণা, স্বর্ণকারপুত্র চুন্দ – এমন অনেকের সমাগমে বুদ্ধের ধর্ম ও সংঘ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। জন্ম নয়, কর্মগুণেই এঁরা ধর্ম, সংঘ, বিনয় ও বুদ্ধশাসনের শ্রীবৃন্দিতে অবদান রেখেছিলেন। সাম্য, মৈত্রী, করুণার মন্ত্রে উজ্জীবিত বৌদ্ধধর্ম নানারূপ বৈষম্য-গীড়িত

তৎকালীন ভারতবর্ষে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি বিভিন্ন নগর ও জনপদে ধর্মপ্রচার করেন। তন্মধ্যে বুদ্ধগয়া, শ্রাবণী, সারনাথ, কৌশাম্বী, বৈশালী, রাজগঢ়, বজ্জি, মল্ল, পাবা, কুশীনারা, চুনার, কনৌজ, মথুরা, আলবী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনের জন্য কাজ

পঁয়তাল্লিশ শিষ্য কাদের বলা হয়?

বেগুবন বিহার কেন বিখ্যাত?

বুদ্ধ রাজা শুন্দোদনকে প্রজাপালন বিষয়ে কী উপদেশ দিয়েছিলেন?

পাঠ : ৮ মহাপরিনির্বাণ

গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর দিকে বিচরণ করে যে ধর্মের আদি, মধ্য ও অন্তে কল্যাণ তা প্রচার করেন। অতঃপর, এক মাসী পূর্ণিমার দিনে তিনি বৈশালীর চাপাল চৈত্য নামক উদ্যানে অবস্থান করছিলেন। ঐদিন তিনি উপস্থিত ভিক্ষুসম্ম, দেবতা ও মানুষের সামনে ঘোষণা দিলেন, পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে তিনি আয়ু সংক্ষার ত্যাগ করবেন। জগতের আলো গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করবেন। অতঃপর তিনি মাস অতিক্রান্ত হয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার প্রাক্তালে তিনি ভিক্ষুসম্মসহ কুশীনগরে উপস্থিত হলেন। কুশীনগরের পাবা নামক স্থানে এসে তিনি স্বর্ণকারপুত্র চুন্দের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। আহারশেষে তিনি অসুস্থ বোধ করেন। পাবা থেকে ফিরে বুদ্ধ মল্লদের শালবনে যমক (জোড়া) শালগাছের নিচে বিশ্রামের জন্য শয়ন করলেন। আকাশে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ। বুদ্ধের সেবক প্রিয় শিষ্য আনন্দ ও অন্য ভিক্ষুরা বুদ্ধের চারপাশে উপবিষ্ট। বুদ্ধের অস্তিম সময়ে আনন্দ অত্যন্ত অধীর হয়ে পড়েন। আনন্দের উদ্দেশে বুদ্ধ বললেন, “আনন্দ ! অনন্দীপা বিহুরথ, অন্তসরণা অঞ্জনসরণা, ধৰ্মদীপা বিহুরথ ধৰ্মসরণা অঞ্জনসরণা।” অর্থাৎ হে আনন্দ নিজেই নিজের দীপ হয়ে বিচরণ করো, আত্ম শরণই অনন্য শরণ, ধৰ্মদীপ হয়ে বিচরণ করো। ধর্মের শরণই অনন্য শরণ। তিনি আরও বলেন, ‘হে আনন্দ ! আমার অবর্তমানে তোমাদের এরূপ মনে হতে পারে, শান্তার উপদেশ শেষ হয়েছে, আমাদের আর শান্তা নেই। আনন্দ ! তোমরা এরূপ মনে করবে না। আনন্দ ! মহৎ কর্তৃক যে ধর্ম-বিনয় দেশিত ও প্রজ্ঞান্ত হয়েছে সেই ধর্ম-বিনয় আমার অবর্তমানে তোমাদের শান্তা।’ অতঃপর, শেষক্ষণে তিনি ‘সুভদ্র’ কে দীক্ষা দেন। বুদ্ধ শেষবারের মতো উপস্থিত ভিক্ষুসংখ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, বুদ্ধের প্রতি, ধর্মের প্রতি, সঙ্গের প্রতি অথবা আমার নির্দেশিত পত্তা সম্পর্কে কারো কোনো সংশয় আছে কি না। সমবেত ভিক্ষুগণ মৌন রাইলেন। এসময় তিনি তাঁর শেষ উপদেশবাণী প্রদান করেন, “হে ভিক্ষুগণ ! সংক্ষারসমূহ ব্যয় ধর্মশীল (ক্ষয়শীল)। অথমাদের সাথে নিজ নিজ কর্তব্যপালনে তৎপর হও।” বুদ্ধের শেষ বাণীসমূহ ‘মহাপরিনির্বাণ সূত্রে’ বর্ণিত হয়েছে। শেষ বাণী উচ্চারণের সাথে সাথে বুদ্ধ ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। একটির পর একটি ধ্যানের স্তর অতিক্রম করে তিনি নিরোধ সমাধি মগ্ন হলেন এবং রাত্রির তৃতীয় যামে পরম সুখময় মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর।



মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শার্যিত বুদ্ধ

সপ্তাহকাল তাঁর মরদেহ সংরক্ষণ করা হয়। আয়ুর্মান মহাকশ্যপ স্তুবির তাঁর চিতায় অগ্নিসংযোগ করেন। তাঁর পৃতাঞ্জিসমূহ ব্রাহ্মক্ষণ দ্রোগ আট ভাগ করেন। অজাতশত্রু, লিছবিগণ, শাক্যগণ, বুলিয়গণ, কোলিয়গণ, বেঠেষীপবাসী, পাবার মন্ত্রগণ ও কুশীনারার মন্ত্ররা পৃতাঞ্জির অংশ লাভ করেন। বুদ্ধ পৃতাঞ্জি 'বুদ্ধ ধাতু' নামে অভিহিত। বৌদ্ধরা এখনও বুদ্ধ ধাতুর উদ্দেশে বন্দনা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

অনুশীলনমূলক কাজ
বুদ্ধ কথন ও কোথায় মহাপরিনির্বাণের ঘোষণা দেন?
বুদ্ধের শেষ উপদেশ কী ছিল?
কে কে বুদ্ধের পৃতাঞ্জি লাভ করেছিলেন?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ :

১. তাঁর জীবন ছিল রসে সিঙ্ক।
২. রানি আনন্দে শিহরিত হলেন।
৩. শাক্যবংশে এক আবর্তাৰ হবে।
৪. উৎসবে মেতে উঠল।
৫. বিশ্বে তিনি বুদ্ধ নামেই পরিচিত।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সিদ্ধার্থের জন্মাভের ঘটনা সংক্ষেপে লেখ ।
২. ঋষি অসিতের কাহিনী বর্ণনা কর ।
৩. ‘মহাভিন্নক্রমণ’ বলতে কী বোঝা ?
৪. পথওবর্গীয় শিষ্য কারা ?
৫. বুদ্ধের শেষ উপদেশ কী ছিল ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার সম্পর্কে যা জান আলোচনা কর ।
২. সিদ্ধার্থের বাল্যকাল সম্পর্কে বর্ণনা কর ।
৩. গৌতম বুদ্ধের ‘মহাপরিনির্বাচন’ বর্ণনা কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- ১। রানি মায়াদেবী কোন পূর্ণিমা তিথিতে পিতৃগৃহে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন ?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. বৈশাখী | খ. আষাঢ়ী |
| গ. আশ্বিনী | ঘ. কার্তিকী |

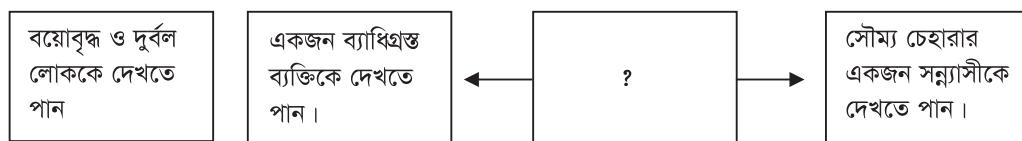
- ২। বাল্যকালে সিদ্ধার্থের অনন্য প্রতিভার পরিচয় ঘটে -

- i. ঋষি অসিতের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করে
- ii. রোহিনী নদীতে পতিত বৃক্ষ সরিয়ে
- iii. জলের প্রবাহ উন্মুক্ত করে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও :



৩। ‘?’ চিহ্নিত স্থানে কোন ঘটনার নির্দেশ করছে ?

ক. সিদ্ধার্থের সংসারজীবনের

খ. সিদ্ধার্থের জন্মবৃত্তান্তের

গ. সিদ্ধার্থ একদল লোকেকে শবদেহ নিয়ে যেতে দেখতে পান

ঘ. সিদ্ধার্থের বুদ্ধতত্ত্বাভের

৪। উক্ত ঘটনায় সিদ্ধার্থ প্রতিভাবন্ত হন—

i মানবমূক্তির পথ অন্঵েষণে

ii সন্ন্যাসধর্ম পালনে আত্মনিয়োগে

iii নির্বাসনে ঘাওয়ার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল প্রশ্ন :

১। তথ্য ছক

ক্রমিক	বিষয়	ঘটনা
১.	জন্ম	শালবৃক্ষের নিচে
২.	পিতৃভূমি	কপিলাবস্তু
৩.	বিবাহবন্ধন	যোল বছর বয়সে
৪.	তপস্যা	হয় বছর

- ক. কে হাঁসটিকে তীরবিদ্ধ করেন ?
- খ. খৰি অসিতের ভবিষ্যত্বানী কী ছিল ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. প্রদর্শিত তথ্য ছকটি কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তথ্য ছকে বর্ণিত মনীষী “হয় বছরের তপস্যায় মধ্যমপথ অবলম্বনের মাধ্যমে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন”-এ বক্তব্যের সাথে তুমি কি একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর।
- ২। শুভার্থী সমাজসেবী পরিবারের ক্লপবতী মেয়ে। তিনি যথাসময়ে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তাই শুভার্থীর পিতা তাঁকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। শিক্ষিত, অশ্বচালনা ও সকল বিষয়ে পারদর্শী এক যুবকের সাথে বিবাহের আনন্দানিকতা সম্পন্ন হয়। তাঁদের সুখের সংসারজীবন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি বরং শুভার্থীর স্বামী মনের বাসনা পূরণের জন্য বৈরাগ্য জীবন গ্রহণের লক্ষ্যে চলে গেলেন এবং পরমজ্ঞান লাভে ব্রতী হন।

- ক. রানি মহামায়া কোন পূর্ণিমায় স্বপ্ন দেখলেন ?
- খ. মহর্ষি কালদেবল রাজকুমারকে দেখে প্রথমে খুশি হয়ে পরে কেঁদে ফেললেন কেন ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার তুলনা করা হয়েছে-ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শুভার্থীর স্বামী তাঁর মনের বাসনা পূরণে গৌতমবুদ্ধকে কীভাবে অনুসরণ করেন, তা ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্ব

বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্ব হচ্ছে উপাধি বা অভিধা। যিনি চরিত্রের চরম উৎকর্ষ সাধন করে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন তিনি বুদ্ধ নামে অভিহিত হন। অপরদিকে যিনি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ব্রত পালন করেন তিনি বৌদ্ধিসত্ত্ব নামে পরিচিত। বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্ব বৌদ্ধধর্মের প্রাণস্ফূর্তি। সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্য এ-দুটি সত্ত্বকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। এ অভিধা দুটি-ও কারো প্রদত্ত নয়। কেউ কাউকে এ-নাম দিতে পারে না। জীবনচর্যার মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। একাগ্র সাধনা ও কঠিন অধ্যবসায়ের দ্বারাই এই দুই অবস্থানে উল্লীল হতে হয়। মানবজীবনে এগুলো সর্বোত্তম মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান। এ-অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্ব সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্বের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব;
- * বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্বের প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব;
- * বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্বের গুণের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারব।

পাঠ : ১

বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্বের পরিচয়

বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্ব দুটি নামবাচক শব্দ। একটি অপরটির পরিপূরক। বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যিক। এখানে বুদ্ধ বলতে শুধু গৌতম বুদ্ধ নয়। শাস্ত্রমতে তাঁর আগেও অনেক বুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যে প্রায় এক। তাঁরা অতুলনীয় গুণের আধার। বুদ্ধের ন্যায় বৌদ্ধিসত্ত্বের সংখ্যাও অনেক। বুদ্ধত্ব অর্জনের সাধনায় তাঁরা নিবেদিত। নিম্নে বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্বের পরিচয় তুলে ধরা হলো :

বুদ্ধ-পরিচিতি

‘বোধি’ শব্দের অর্থ পরম জ্ঞান। বোধি শব্দ থেকেই বোধি শব্দের উত্তর। যিনি বোধি বা জ্ঞানে পরিপূর্ণতা লাভ করেন তিনিই হন বুদ্ধ। তাই ‘বুদ্ধ’ শব্দের সরল অর্থ জ্ঞানী। তবে এই জ্ঞান সাধারণ বা শুধু জাগতিক জ্ঞান নয়। বহুবিধ বিষয়ের সমন্বিত জ্ঞান। বিশেষত চার আর্যসত্য অধিগত জ্ঞান। এই জ্ঞানকে পরমার্থ জ্ঞানও বলা যায়। জাতিস্মর জ্ঞান ও পরচিত অবগতি জ্ঞান এর অধীন। জাতিস্মর জ্ঞান হলো পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করতে পারা এবং পরচিত অবগতি হলো অন্যের মানসিক অবস্থা জ্ঞানতে পারার বোধশক্তি। একাগ্র জ্ঞানশক্তি অর্জন অত্যন্ত কঠিন। কঠোর ত্যাগ তিতিক্ষা ও গভীর একাগ্রতায় রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম এ-জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাই তিনি জগতে বুদ্ধ নামে খ্যাত হয়েছেন। ‘বুদ্ধ’ মানবোত্তম এক অভিধাৰিশেষ। সর্ববিধ তৃষ্ণা বিনাশপূর্বক বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধনায় পূর্ণতা সাধিত হলেই এই অভিধা অর্জিত হয়।

সুতরাং বুদ্ধ শব্দের সাধারণ অর্থ জ্ঞানী হলেও এর অন্তর্নিহিত অর্থ আরও গভীর। এজন্টি পৃথিবীর সব জ্ঞানী ব্যক্তি বুদ্ধ নন। বুদ্ধ রাগ, হিংসা ও লোভহীন এক মহোত্ম পুরুষ। বুদ্ধ নিজের এবং অন্যের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্য সম্পর্কে বলতে পারতেন। কাকে, কখন এবং কীভাবে উপদেশ দেওয়া উচিত তিনি তা জানতেন। বুদ্ধত্ব জ্ঞান অনন্য ও অসাধারণ। এ-জ্ঞান অতুলনীয়। কর্মের মাধ্যমেই এর পরিচয় মেলে। তিনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী, তাঁর জ্ঞানের পরিধিও অনন্ত। সাধারণ মানুষের সীমিত জ্ঞানের দ্বারা তার পরিমাণ করা যায় না।

জগতে বুদ্ধের আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ। জন্মজন্মান্তরের একনিষ্ঠ সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করা যায়। বুদ্ধত্বলাভের পথ সবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু সকলের পক্ষে বুদ্ধত্ব লাভ করা সম্ভব হয় না। জগতে একজন বুদ্ধের অস্তর্ধানের বহুকাল পরে আর একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হওয়ার কথা শান্তে উল্লেখ আছে। নতুন বুদ্ধ আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত পূর্ববর্তী বুদ্ধের অনুশাসনই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা অনুশীলন করে। যেমন এখন গৌতম বুদ্ধের অনুশাসন চলছে। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

বুদ্ধত্ব অর্জনের সাধনা একটি অঙ্গীকারবদ্ধ পথপরিক্রমার মতো। এটিকে পারমী পূর্ণতার পরিক্রমাও বলা যায়। অনিয়, দুঃখ ও অনাত্ম – জগতের এই তিনি লক্ষণ যিনি সম্যক্রন্তে উপলক্ষ্মি করতে সমর্থ হন তিনিই বুদ্ধত্বলাভে অগ্রসর হন। তিনি চতুরার্থ সত্য উপলক্ষ্মি করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গসাধনায় নিয়োজিত হন। এ ছাড়া বুদ্ধত্বলাভের জন্য পূরণ করতে হয় দশ পারমী। পরমী অর্থ পূর্ণতা। দশ পারমী হলো— দান, শীল, নৈঞ্জন্য, ক্ষান্তি, বীর্য, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী, উপেক্ষা ও প্রজ্ঞা। পারমী ও উপপারমী এবং পরমার্থ পারমী ভেদে এগুলো আবার ত্রিশ প্রকার। এসব বিষয়ে পূর্ণতা লাভ করা সহজসাধ্য নয়। সকল পারমী পূরণের জন্য প্রয়োজন জন্মজন্মান্তরের অসংখ্য কুশল কর্মের প্রভাব। এই প্রভাব বা পুণ্যফল অর্জনের জন্য তাঁকে অসংখ্যবার জন্ম নিতে হয়। শুধু মানবকুলে নয়, অন্যান্য প্রাণী হিসেবেও তাঁকে জন্মগ্রহণ করতে হতে পারে। সেই অসংখ্য জন্মে তাঁকে কুশলকর্ম সম্পাদন করে পারমীপূর্ণ ও পুণ্য সংরক্ষণ করতে হয়। এভাবে বিবিধ জন্মে পারমী পূরণ করে অতীতে বহু বুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছেন, ভবিষ্যতেও হবেন।

বোধিসত্ত্ব-পরিচিতি

‘বোধিসত্ত্ব’ বলতে দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সত্ত্বকে বোঝানো হয়। বোধি ও সত্ত্ব দুটি শব্দের সমষ্টয়ে ‘বোধিসত্ত্ব’ শব্দটি গঠিত। এখানে ‘বোধি’ অর্থ হলো জ্ঞান বা প্রজ্ঞা। আর সত্ত্ব হলো সেইজন, যিনি জ্ঞান বা প্রজ্ঞা-সাধনায় নিয়োজিত। তিনি জ্ঞান অর্জনের পথে বা দুঃখমুক্তির পথ অন্বেষণে নিজেকে উৎসর্গ করতে সমর্থ হয়েছেন। এ মহৎ লক্ষ্য অর্জনে তিনি সর্বদা প্রচেষ্টা করেন। তাই সরল অর্থে বোধিসত্ত্ব হলো বুদ্ধত্বলাভে অনুপ্রাপ্তি প্রজ্ঞাবান সত্ত্ব বা বোধির লালনকারী সত্ত্বই বোধিসত্ত্ব।

বোধিসত্ত্ব চেতনার উৎসাহ জাগ্রত হয় সাধনকারীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিধায় থেকে। কিন্তু আচরণ রীতি হয় অঙ্গীকারবদ্ধ। এটি আবেগ ও কৌতুহলের বিষয় নয়। চিন্তাশীল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সচেতনভাবে অনুশীলনের বিষয়। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন মতে বহু জন্মের সুকৃতির ফল না থাকলে বোধিসত্ত্ব চেতনা জাগ্রত হয় না। বোধিসত্ত্ব সাধনার পূর্ণতা অর্জিত হয় বুদ্ধত্বলাভের মাধ্যমে। তাই বোধিসত্ত্বকে বলা হয় বুদ্ধাক্তুর। এরপি চেতনা অত্যন্ত বিরল ও দুর্লভ।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধ জ্ঞান কীরূপ?

বোধিসত্ত্ব শব্দের অর্থ কী?

পাঠ : ২

বুদ্ধের গুণাবলি

বুদ্ধের গুণ অসীম। এই বিশাল গুণারাশি একসাথে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। এগুলোকে শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন করলে নয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সে হিসেবে বলা যায় বুদ্ধের গুণ নয়টি। এই নয়টি গুণ হলো নিম্নরূপ :

১. তিনি অর্হৎ : সর্ববিধ অরি বা শত্রুশূন্য মুক্ত মহাপুরুষ।
২. তিনি সম্যকসমুদ্ধ : সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন।
৩. তিনি বিদ্যা ও আচরণসম্পন্ন : অনুশীলনীয়তত্ত্ব ও উপযুক্ত আচরণ জ্ঞানসম্পন্ন।
৪. তিনি সুগত : নির্বাঙ্গকপ সুস্থানে সুন্দরভাবে পৌছেছেন।
৫. তিনি লোকবিধি : ত্রিলোক সম্পর্কে সম্যকজ্ঞানসম্পন্ন।
৬. তিনি অনুত্তর : শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাগুণের সর্বোচ্চস্থানের অধিকারী।
৭. তিনি পুরিসদম্ম সারথি : সর্ববিধ অঙ্গুত্তম শক্তির দমনকারী।
৮. তিনি স্থান দেবমনুস্সানং : দেব ও মনুষ্যগণের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক।
৯. তিনি বুদ্ধোভগবা : সর্ববিধ জ্ঞানের পূর্ণতায় তিনি বুদ্ধ, সেই সমুদয় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের আধার বলে তিনি ভগবান।

বুদ্ধের এই গুণসমূহ অর্জন সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি এই গুণরাশির গুরুত্ব উপলক্ষি করাও কঠিন। বুদ্ধ গুণাবলির যে-কোনো একটি গুণ যাঁর পক্ষে অর্জন সম্ভব, কেবল তিনিই এই গুণের গুরুত্ব উপলক্ষি করতে সমর্থ হন। এজন্যেই বলা হয় বুদ্ধ গুণ অচিন্তনীয়।

উপরে বর্ণিত নয়টি গুণের প্রত্যেকটি স্তর বহুবিধ বিষয়ে সমন্বিত ও সমৃদ্ধ। যেমন অর্হৎ বা সর্ববিধ শত্রুশূন্য বলতে আট পর্যায়ের সমাধিচর্যায় উন্নীত হওয়াকে বোঝায়। রাগ, দেষ, মোহ ও ত্রুটাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এগুলো ক্রমান্বয়ে অনুশীলন করতে হয়। এই ক্রমিক সাধনরীতির প্রতিটি পর্যায়ের অর্জিত সুফলকেও সচেতনতার সাথে সুরক্ষা করতে হয়। সাধনচর্যা ও চর্যায় উন্নীত চিত্তাবস্থাকে স্থিত রাখতে পারলেই পরবর্তী পর্যায়ের অনুশীলন করা যায়। এভাবে দীর্ঘদিনের সাধনায় এক-একটি স্তর অতিক্রম সম্ভব হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে এগুলোকে মার্গ ও ফললাভের সাধনা বলা হয়। এগুলো হলো : ১) শ্রোতাপত্তি-মার্গ ২) শ্রোতাপত্তি-ফল ৩) সকৃতাগামী-মার্গ ৪) সকৃতাগামী-ফল ৫) অনাগামী-মার্গ ৬) অনাগামী-ফল ৭) অর্হৎ-মার্গ ৮) অর্হৎ-ফল। সুতরাং অর্হৎ বলতে আট স্তরের উচ্চতর সাধন প্রক্রিয়ার পূর্ণতাকে বোঝায়। যিনি এ স্তরে উন্নীত হন, তিনি সর্বজয়ী সাধক।

সম্যক সমুদ্ধ বলতে স্ব-উদ্দেয়োগে আর্যসত্যকে সম্যকভাবে স্বয়ং জ্ঞাত হওয়াকে বোঝায়। এজন্য তাঁকে তিন স্তরের জ্ঞান- মহিমায় সম্পূর্ণতা অর্জন করতে হয়েছে। এগুলো হলো : ১) যা জানা অপরিহার্য তা তিনি জেনেছেন, যেমন আর্যসত্য জ্ঞান ; ২) যা চিন্তা করার যোগ্য তা তিনি চিন্তা করেছেন, সে অনুযায়ী নিজেকে প্রয়োজনীয় সকল কর্ম সম্পাদন করে স্বয়ং জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং ৩) যা ত্যাগ করার যোগ্য তাঁর দ্বারা তা স্যন্তে ত্যাগকৃত। এভাবে তিনি ত্রুটাহীন বিশুদ্ধ মহাপুরুষ হয়েছেন। অনুরূপভাবে বুদ্ধগুণের প্রত্যেক স্তর গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বলা হয় বুদ্ধগুণ অবগন্তীয়, অচিন্তনীয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের নয়টি গুণ কী কী?

মার্গ ও ফললাভের সাধনার স্তরগুলোর নাম লেখ

পাঠ : ৩

বুদ্ধের প্রকারভেদ

বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে তিনি প্রকার বুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যথা :

১. সম্মা সমুদ্ধ বা সম্যক সমুদ্ধ।
২. পচেক বুদ্ধ বা প্রত্যেক বুদ্ধ।
৩. সাবক বুদ্ধ বা শ্রাবক বুদ্ধ।

এখন আমরা এই তিনি প্রকৃতির বুদ্ধ সম্পর্কে জানব।

সম্যক সমুদ্ধ

বুদ্ধগণের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সম্যক সমুদ্ধ। সম্যক সমুদ্ধ বলতে বোঝায়, যিনি কোনো গুরুর সাহায্য ছাড়া স্থীর আদর্শ ও কর্মের দ্বারা নিরলস প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন। তিনি সর্বোত্তম জ্ঞানের অধিকারী। সম্যক সমুদ্ধগণ জন্মজন্মাত্ত্বের সাধনায় দশ পারমী পূর্ণ করেন। তিনি শেষজন্মে মানবকুলে উপযুক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পূর্বের অনন্ত জন্মের সুকর্মের প্রভাবে এই জন্মে তিনি অর্হত্ব ফল বা সর্বজ্ঞতা অর্জন করে বুদ্ধ হন।

সম্যক সমুদ্ধগণ শুধু নিজের জন্য বুদ্ধ হন না। তাঁরা জগতের সর্বসন্তার পরম মুক্তির দ্বার উন্মোচনের ব্রত নিয়েই বুদ্ধ হন। এজন্যে সকল জীবের কল্যাণে তাঁরা দুঃখমুক্তির পথ ও নির্বাণলাভের উপায় প্রচার করেন।

বৌদ্ধমতে, জগতে সম্যক সমুদ্ধের আবির্ভাব অতীব দুর্লভ। একই সময়ে পৃথিবীতে দুজন সম্যক সমুদ্ধের আবির্ভাব ঘটে না। একজন সম্যক সমুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভ করার হাজার হাজার বছর পর অন্য এক সম্যক সমুদ্ধের আবির্ভাব হয়। সে অনুযায়ী পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আটাশজন সম্যক সমুদ্ধের আবির্ভাবের কথা জানা যায়। এই আটাশজন সম্যক সমুদ্ধ হলেন :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| ১. ত্রিষাক্ষর বুদ্ধ | ১৫. সুজাত বুদ্ধ |
| ২. মেধক্ষর বুদ্ধ | ১৬. প্রিয়দর্শী বুদ্ধ |
| ৩. শরণক্ষর বুদ্ধ | ১৭. অর্থদর্শী বুদ্ধ |
| ৪. দীপক্ষর বুদ্ধ | ১৮. ধর্মদর্শী বুদ্ধ |
| ৫. কৌগুণ্য বুদ্ধ | ১৯. সিদ্ধার্থ বুদ্ধ |
| ৬. মঙ্গল বুদ্ধ | ২০. তিস্স বুদ্ধ |
| ৭. সুমন বুদ্ধ | ২১. ফুস্স বুদ্ধ |
| ৮. রেবত বুদ্ধ | ২২. বিপ্সসী বুদ্ধ |
| ৯. শোভিত বুদ্ধ | ২৩. শিখী বুদ্ধ |
| ১০. অনোমদর্শী বুদ্ধ | ২৪. বেস্সভু বুদ্ধ |
| ১১. পদুম বুদ্ধ | ২৫. ককুসন্ধ বুদ্ধ |
| ১২. নারদ বুদ্ধ | ২৬. কোণাগমন বুদ্ধ |
| ১৩. পদুমুন্ত্র বুদ্ধ | ২৭. কশ্যপ বুদ্ধ এবং |
| ১৪. সুমেধ বুদ্ধ | ২৮. গৌতম বুদ্ধ। |

‘বুদ্ধবৎস’ নামক ঘৃত্ত পাঠে আটাশজন বুদ্ধের কথা জানা যায়। এ-গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী গৌতম বুদ্ধই হলেন সর্বশেষ সম্যক সম্মুদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা আড়াই হাজার বছরেরও আগে থেকে গৌতম বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মপালন করে আসছেন। তাঁরই প্রতিমূর্তি অথবা ছবি সামনে রেখে বৌদ্ধেরা উপাসনা করেন। কারণ সর্বশেষ সম্যক সম্মুদ্ধরাপে তিনি মানুষের দুঃখমুক্তি ও ত্রুট্যাঙ্করণের পথ প্রদর্শন করেছেন, নির্বাগলাভের উপায় নির্দেশ করে গেছেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আর্য মৈত্রের নামে আর একজন সম্যক সম্মুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। এভাবে সময়ের স্রোতে দশ পারমী পূর্ণ করে অনন্তকালের ব্যবধানে একেক জন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়।।

প্রত্যেকবুদ্ধ

প্রত্যেকবুদ্ধ হলো আত্মামুক্তি সাধনায় পূর্ণতা অর্জনকারী বিমুক্ত মহাপুরুষ। তাঁরা সম্যক সম্মুদ্ধের দেশিত সাধনপ্রণালী অনুশীলন করে সর্ব ত্রুট্য ক্ষয় করেন। এভাবে স্থীর সাধনাবলে অর্হত্ব ফল লাভ করে তাঁরা বুদ্ধ হন। প্রত্যেকবুদ্ধগণ জীবনাবসানে নির্বাণ লাভ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন। প্রত্যেকবুদ্ধগণের সাধনালক্ষ জ্ঞান কেবল নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁরা অন্যদের নিকট মুক্তিপথ উন্মোচন করেন না।

প্রত্যেকবুদ্ধগণ মূলত সম্যকসম্মুদ্ধের অনুগামী বুদ্ধ। অর্হত্ব ফললাভী এবং নির্বাণগামী এরূপ অসংখ্য প্রত্যেকবুদ্ধ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন। এজন্য বৌদ্ধেরা বিশ্বাস করেন জগৎ অর্হৎ বা বুদ্ধশূন্য নয়। সম্যক সম্মুদ্ধগণের মতো প্রত্যেকবুদ্ধগণ সরব নয়। তাঁরা নীরবে নিভৃতে সাধনা করে থাকেন।

শ্রাবকবুদ্ধ

শ্রাবকবুদ্ধ হলো সম্যকসম্মুদ্ধের অনুশীলন অনুশীলনে পারঙ্গম পুণ্যপুরুষ। একজন সম্যকসম্মুদ্ধের অনেক শিষ্য থাকেন। এই শিষ্যদেরও অনেক শিষ্য থাকেন। এসব শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ সম্যকসম্মুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে মুক্তিসাধনায় রত থাকেন। এঁদের মধ্যে অনেকে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। তাঁরা আর জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করবেন না। তাঁরা নির্বাণগামী। এরূপ বিমুক্ত পুরুষকে বলা হয় শ্রাবকবুদ্ধ।

সম্যক সম্মুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন অনুশীলনের শীর্ষে অবস্থান করেন শ্রাবকবুদ্ধগণ। প্রত্যেক সম্যকসম্মুদ্ধের অনুসারীদের মধ্যে শ্রাবকবুদ্ধ থাকেন। গৌতম বুদ্ধের অনেক শিষ্যশ্রাবক বুদ্ধ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন, মহাকশ্যপ, বিনয়ধর উপালি, ধর্মভাণ্ডারিক আনন্দ, লাভাশ্রেষ্ঠ সীবলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বুদ্ধের সময় অনেক শ্রাবক বুদ্ধ ছিলেন। তাঁরা জীবজগতের কল্যাণে নিজেদের নির্যোজিত রাখেন এবং অন্যদের নির্বাগলাভে সহায়তা করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

তিনি প্রকার বুদ্ধের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ কোনটির অন্তর্গত?

প্রত্যেকবুদ্ধের শুণাবলি বর্ণনা কর

কয়েকজন শ্রাবকবুদ্ধের নাম বল

পাঠ : ৪

বোধিসন্দের গুণাবলি

বোধিসন্দের পরম গুণ হলো দশ পারমীর পূর্ণতা সাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এটি বোধিসন্দের অনুশীলনীয় মুখ্য বিষয়। এই পারমীসমূহ চর্চার ফলে বোধিসন্দের জীবনচারণে স্বাভাবিকভাবে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়, যা অন্য মানুষদের থেকে বোধিসন্দের অনন্য ও অসাধারণ করে তোলে। এই অসাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহই হলো বোধিসন্দের গুণ।

বোধিসন্দের গুণ হঠাতে সৃষ্টি হয় না। গুণগুলো বোধিসন্দের সাধনার ক্রমধারায় ধাপে ধাপে অর্জিত হয়। যেমন বোধিসন্দের চেতনা সকলের অঙ্গে বিরাজমান হলেও সকলেই বোধিসন্দের পদবাচ্য নয়। যিনি বুদ্ধত্বলাভে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে পারমী পূর্ণতার সাধনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, তিনিই প্রকৃত অর্থে বোধিসন্দের পারমী পূর্ণতার অভিপ্রায়ে যে-চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী হওয়া যায় সেগুলোই হলো বোধিসন্দের গুণ।

বোধিসন্দের অনুশীলন একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া। জন্মজন্মান্তরে এটি অনুশীলন করতে হয়। বোধিসন্দের জীবনলাভের জন্য কিছু গুণ অর্জন করতে হয়। এগুলো এক জন্মের সাধনায় অর্জন করা যায় না। এর জন্য জন্মজন্মান্তরের অব্যাহত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এরূপ নিরবচ্ছিন্ন কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই বোধিসন্দের গুণের অধিকারী হতে হয়। বোধিসন্দের গুণ নিম্নরূপ :

১. সর্ববিষয় অনিত্য – এ ধারণাকে বোধিসন্দের জীবনচারণের সর্বোচ্চ সত্য হিসেবে গ্রহণ করেন।
২. তথাগত বুদ্ধের দর্শনকেই বোধিসন্দের একমাত্র পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করে সর্বসন্তার কল্যাণকামী হন।
৩. স্বৃকৃত কর্মকেই জন্মজন্মান্তরের সঙ্গী হিসেবে বোধিসন্দের গ্রহণ করেন। তাই নিঃস্বার্থ, নির্মোহ কর্ম অনুশীলনই বোধিসন্দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৪. বোধিসন্দের একমাত্র লক্ষ্য বুদ্ধত্বলাভ। নাম, যশ, খ্যাতি নিয়ে তাঁরা চিন্তা করেন না।
৫. বোধিসন্দুগ্ণ জীবন বিসর্জন দিতে পারেন, কিন্তু সত্যসাধনা হতে বিচ্যুত হন না।
৬. বোধিসন্দুগ্ণ সত্য, ন্যায় ও ত্যাগের আদর্শে উদ্বৃদ্ধ হয়ে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলনে বদ্ধপরিকর হন।
৭. বোধিসন্দুগ্ণ সর্বাদা সর্বসন্তার কল্যাণ কামনা করেন। তাঁদের কাছে আপন-পর ভেদাভেদ নেই।
৮. বোধিসন্দুগ্ণ মৈত্রী, করণা, মুদিতা ও উপেক্ষার সর্বোত্তম অনুশীলনকারী হন।
৯. বোধিসন্দুগ্ণ দশ পারমী অঙ্গীকারবদ্ধ হন।
১০. বোধিসন্দের একটি স্বতঃস্ফূর্ত সাধনা, বোধিসন্দুগ্ণ আপন চেতনা বলে বলীয়ান হয়ে স্বচিন্তকে নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হন।

উপরে বোধিসন্দের শুধুমাত্র উল্লেখযোগ্য ও বিরল গুণসমূহ তুলে ধরা হলো।

অনুশীলনমূলক কাজ

কী কী গুণ থাকলে আমরা বোধিসন্দের চিনতে পারি – উল্লেখ কর

পাঠ : ৫

বৌদ্ধিসন্দেশ প্রকারভেদ

বৌদ্ধিসন্দেশ সাধনা অত্যন্ত দুষ্কর। কঠোর তপস্যা ও চরম আত্মত্যাগের দৃঢ় চেতনায় প্রত্যয়াবদ্ধ হয়েই এ-সাধনা করতে হয়। মানুষ সহজে বৌদ্ধিসন্দেশ অনুশীলন করতে পারে না। কারণ মানুষের সহজাত স্বার্থাচিন্তা মানুষকে সহজপ্রাপ্তির দিকে ধাবিত করে। পরম মুক্তির কথা মানুষ ভাবতে পারে না। বৌদ্ধধর্ম মতে বৌদ্ধিসন্দেশ তিনি প্রকার। যথা :

- ক) শ্রাবকবৌদ্ধিসন্দেশ
- খ) প্রত্যেকবৌদ্ধিসন্দেশ
- গ) সম্যকসম্মোদ্ধিসন্দেশ

ক) শ্রাবকবৌদ্ধিসন্দেশ : এখানে শ্রাবক অর্থে শ্রবণকারী, শ্রোতা, শিষ্য বা শ্রদ্ধানুরাগে অনুপ্রাণিত হয়ে বৌদ্ধিজ্ঞান লাভকারীকে বোঝানো হয়। একপ বৌদ্ধিসন্দেশ সাধনার ইচ্ছা শ্রবণ বা দর্শন থেকে জগ্নিত হলেও আবেগতাড়িত নয়। স্থির সিদ্ধান্তপ্রসূত। গৌতম বুদ্ধের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ যাঁরা এরপ জ্ঞান মার্গের সাধনাব্রতে রত ছিলেন তাঁদের শ্রাবক বৌদ্ধিসন্দেশ বলা হয়। সাধনমার্গের পূর্ণতায় শ্রাবকবৌদ্ধিসন্দেশগণ শ্রাবক বুদ্ধে উন্নীত হন। শ্রাবকবৌদ্ধিসন্দেশ শারিপুত্র, মোদগল্যায়ন প্রমুখ বুদ্ধের সময়ে শ্রাবক বুদ্ধ হন।

খ) প্রত্যেকবৌদ্ধিসন্দেশ : স্ব-উদ্দেয়গে ও স্বাধীনভাবে কোনো গুরুর অধীন না হয়ে বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে বৌদ্ধিজ্ঞান লাভের সাধনায় নিয়োজিত সাধককে প্রত্যেকবৌদ্ধিসন্দেশ বলে। প্রত্যেকবৌদ্ধিসন্দেশগণ বৌদ্ধিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ গুণে গুণান্বিত হলেও তাঁরা নিজ গুণ প্রভায় অন্যকে প্রতাবান্বিত করতে পারেন না। বুদ্ধের অনেক শিষ্যই এই স্তরের ছিলেন।

গ) সম্যকসম্মোদ্ধিসন্দেশ : বৌদ্ধিসন্দেশ সাধনার সর্বোত্তম প্রক্রিয়া এটি। সর্বসত্ত্বার কল্যাণব্রত নিয়ে বৌদ্ধ চিন্ত সাধনার অনুসরণকারীকে সম্যকসম্মোদ্ধিসন্দেশ বলে। তাঁরা সাধনার পূর্ণতায় সম্যক সমৃদ্ধ হন। যেমন গৌতম বুদ্ধ একজন সম্যক সমৃদ্ধ। সম্যকসম্মোদ্ধিসন্দেশগণ সর্বজীবের মুক্তির মাধ্যমেই নিজের মুক্তি প্রত্যাশা করেন। এভাবেই তাঁরা পারমী অনুশীলন করেন।

আবার সাধনাব্রতের উৎস বিচারেও বৌদ্ধিসন্দেশকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। কোন প্রেক্ষিতে কীভাবে বৌদ্ধিচিন্ত বা বৌদ্ধিসন্দেশ সাধনার উৎসাহ জগ্নিত হলো সে উৎসের ভিত্তিতে বৌদ্ধিসন্দেশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. প্রজ্ঞাধিক বৌদ্ধিসন্দেশ
২. শ্রদ্ধাধিক বৌদ্ধিসন্দেশ
৩. বীর্যাধিক বৌদ্ধিসন্দেশ

১. প্রজ্ঞাধিক বৌদ্ধিসন্দেশ — যে বৌদ্ধিসন্দেশ লক্ষ্য অর্জনে প্রজ্ঞাসাধনাকে সর্বাপ্রে স্থান দেয় তাঁকে প্রজ্ঞাধিক বৌদ্ধিসন্দেশ বলে। এ-স্তরের বৌদ্ধিসন্দেশগণ প্রজ্ঞা পারমী'র অনুশীলনের মাধ্যমে স্বীয় চিন্তকে নিয়ন্ত্রণে এনে ক্রমে অন্য পারমীর পূর্ণতা সাধন করেন।

এরপ বৌদ্ধিসন্দেশ সর্বক্ষেত্রে বিশ্লেষণধর্মী হন। তাঁরা প্রজ্ঞার আলোকে প্রত্যেকটি বিষয় বিচার-বিশ্লেষণ করেন। অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে তাঁরা স্বীয় পথপরিক্রমায় অগ্রসর হন।

২. শ্রদ্ধাধিক বৌদ্ধিসন্দেশ — যে-বৌদ্ধিসন্দেশ লক্ষ্য অর্জনে শ্রদ্ধাকেই সর্বাপ্রে স্থান দেন তাঁকে শ্রদ্ধাধিক বৌদ্ধিসন্দেশ বলে। এ স্তরের বৌদ্ধিসন্দেশগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে ক্রমাবয়ে সকল পারমীর পূর্ণতা সাধন করেন।

শ্রদ্ধাধিক বৌদ্ধিসত্ত্বগণ নিবেদিত প্রাণ সাধক হন। তাঁরা শ্রদ্ধা চিন্তে একবার যে আদর্শকে গ্রহণ করেন আমৃত্যু সে-ব্রত পূরণে প্রত্যয়াবদ্ধ থাকেন।

৩. বীর্যাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব – যে বৌদ্ধিসত্ত্ব লক্ষ্য অর্জনে কর্ম প্রচেষ্টাকেই সর্বাত্থে স্থান দেন তাঁকে বীর্যাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব বলে। এ-স্তরের বৌদ্ধিসত্ত্বগণ বীর্য পারমী'র অনুশীলনের মাধ্যমে স্থীয় চিন্তকে নিয়ন্ত্রণে এনে ক্রমে অন্য পারমীর পূর্ণতা সাধন করেন।

বীর্যাধিক বৌদ্ধিসত্ত্বগণ কঠিন সাধনা ব্রতের অনুরাগী হন। তাঁরা কঠোর সাধনায় নিয়োজিত থাকেন। বীর্য পারমীর বলে মহীয়ান হয়ে তাঁরা সাধনায় অটল থাকেন।

অনুশীলনমূলক কাঙ্গ

শ্রাবক বৌদ্ধিসত্ত্বের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর

প্রজ্ঞাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

পাঠ : ৬

বুদ্ধ ও বৌদ্ধিসত্ত্বের পার্থক্য

যিনি বৌদ্ধিজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করেন তাঁকে বৌদ্ধিসত্ত্ব বলে। বৌদ্ধিসত্ত্ব বুদ্ধ নন। তাঁদের ভাবী বুদ্ধ বা বুদ্ধাঙ্কুর বলা হয়। ভবিষ্যতে কোনো এক জন্মে তিনি বুদ্ধ হবেন। বুদ্ধ হওয়ার জন্য তাঁকে বিভিন্ন কুলে অসংখ্যবার জন্ম নিতে হয় এবং দশ উপপারমী, দশ পারমী ও দশ পরমার্থ পারমী পূর্ণ করতে হয়। অর্থাৎ জন্মজন্মাত্তরের কর্মের ধারাবাহিকতায় দশ পারমীর প্রত্যেকটি ত্রি-পর্যায়ে অনুশীলন করে আত্মবিশুদ্ধির সাধনায় পরিপূর্ণতা অর্জন করতে হয়। নিজেকে সকল আসক্তি থেকে বিমুক্ত করাই বৌদ্ধিসত্ত্বের প্রধান লক্ষ্য।

গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধাঙ্কুরের পূর্বে অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাঠে একথা জানা যায়। এসব জন্মে বিভিন্ন নামে তাঁকে আখ্যায়িত করা হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় হলো বৌদ্ধিসত্ত্ব। বৌদ্ধিসত্ত্বের এক জন্মে তিনি পূর্ববর্তী বুদ্ধ দীপক্ষরের কাছ থেকে আশীর্বাদপূর্ণ হয়েছিলেন। দীপক্ষের সম্যকসম্মুদ্ধ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন লক্ষকল্প বছর আগে। সেসময় গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধিসত্ত্ব জীবনসাধনায় রত ছিলেন। তিনি তখন বৌদ্ধিসত্ত্ব সুমেধ তাপস নামে অমরাবতী নগরে বাস করতেন। দীপক্ষের বুদ্ধ সশিষ্য এ অমরাবতী নগরে নিমিত্তিত হয়েছিলেন।

অমরাবতী নগর ধনধান্যে পরিপূর্ণ হলেও এর যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন উন্নত ছিল না। তখন ছিল বর্ষাকাল। বৃষ্টিতে পথঘাট কর্দমাক্ত ছিল। নগরবাসীগণ বুদ্ধের যাতায়াতের জন্য রাস্তা মেরামতে ব্যস্ত ছিলেন। সুমেধ তাপসও সবার সাথে একাজে অংশ নিলেন। এদিকে বুদ্ধের আগমনের সময় হলো। কিন্তু রাস্তার কাজ তখনও সম্পূর্ণ শেষ হয়নি। এদিকে দীপক্ষের বুদ্ধ শিষ্যদের নিয়ে সেই অসমাপ্ত রাস্তার কাছে এসে পড়েছেন। আর মাত্র কয়েক হাত রাস্তার কাজ বাকি। নগরবাসীগণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। সুমেধ তাপস দেখলেন আর কোনো উপায় নেই। তিনি হাতের কোদাল ফেলে পরম শ্রদ্ধাভরে সেই কাদাভরা রাস্তার ওপর শুয়ে পড়লেন। অত্যন্ত বিনীতভাবে তিনি দীপক্ষের বুদ্ধকে অনুরোধ করলেন তাঁর শায়িত দেহের ওপর দিয়ে যাওয়ার জন্য। দীপক্ষের বুদ্ধ তাঁর মানসচেতনা উপলক্ষ্মি করলেন। সুমেধ তাপসের মধ্যে তিনি অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। অতঃপর দীপক্ষের বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন। রাস্তা পার হওয়ার জন্য তিনি সুমেধ তাপসের গায়ের ওপর পা রাখলেন। ঠিক সে-সময় সুমেধ তাপস দীপক্ষের বুদ্ধের কাছে সশ্রদ্ধ চিন্তে ভবিষ্যতে সম্যকসম্মুদ্ধ হওয়ার প্রত্যশা পূরণের আশীর্বাদ কামনা করেন। দীপক্ষের বুদ্ধ সুমেধ তাপসের মধ্যে ভাবী বুদ্ধের সব লক্ষণ দেখতে পেলেন। তখন তিনি সুমেধ তাপসের প্রার্থনা পূরণের জন্য আশীর্বাদ করেন। তাঁর আশীর্বাদ সুমেধ তাপসের বৌদ্ধিসত্ত্ব জীবনের সাধনাকে অনেক বেগবান করে। জন্মজন্মাত্তরের সাধনায় তিনি সকল পারমী পূর্ণ

করতে সমর্থ হন। এ-সুকৃতির ফলে শেষ জন্মে তিনি রাজা শুক্রদেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। এ-সময় তাঁর নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। উপর্যুক্ত সময়ে সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে একাগ্র সাধনায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং 'বুদ্ধ' নামে খ্যাত হন।

বুদ্ধ সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের আগে অসংখ্য জন্ম বোধিসত্ত্ব সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁর বোধিসত্ত্ব জীবনের সাধনার কথা জাতক সাহিত্যে বর্ণিত আছে। জাতকের বর্ণনামতে গৌতম বুদ্ধ ৫৫০ বার বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিভিন্ন জাতকের কাহিনীতে তিনি দান, ধর্ম ও সেবা ইত্যাদি সৎকাজ দ্বারা পারমী পূর্ণ করেন বলে উল্লেখ আছে। এই পারমী পূরণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তিনি মানুষ, পশু-পাখিসহ নানা জাতিতে জন্ম নিয়েছিলেন। মহাসুদর্শন জাতকে দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব কুশাবতী নগরে মহাসুদর্শন নামে এক রাজা হয়ে জন্মেছিলেন। বানরিন্দ্র জাতকে বানররূপে জন্মেছিলেন। মথাদেব জাতকে রাজা মথাদেররূপে এবং মহাজনক জাতকে রাজা মহাজনকরূপে জন্মেছিলেন। এছাড়া বোধিসত্ত্ব চণ্ঠাল, শুদ্র, ক্ষত্রিয়, ময়ূর, কপোত, হাতি, ইত্যাদি নানা কুলেও জন্ম নিয়েছিলেন। এ-জন্মসমূহের একমাত্র লক্ষ্য ছিল পারমী পূরণ করে বুদ্ধত্ব লাভ করা। এ-আলোচনা বোঝা যায়, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

বুদ্ধ	বোধিসত্ত্ব
১. বুদ্ধ — সম্যক জ্ঞানে ও গুণে পূর্ণতা বিষয়ক অভিধা বা উপাধি।	১. বোধিসত্ত্ব — সম্যক জ্ঞান চর্চাকারীর অভিধা বা উপাধি।
২. দশ পারমীর সাধনা পূর্ণ করেই বুদ্ধত্ব অর্জিত হয়। বুদ্ধগণ সর্ব ত্রুট্যামৃত বলে পরিনির্বাণ লাভ করেন।	২. অনন্ত জন্মের কর্মপ্রচেষ্টায় বোধিসত্ত্বগ্রহণের পারমী চর্চা গতিশীল হয়। বোধিসত্ত্ব অবস্থায় কারো পক্ষে নির্বাণলাভ সম্ভব নয়।
৩. বুদ্ধগণ বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত থাকেন। তাই তাঁদেরকে ত্রিকালদর্শী বলে।	৩. বোধিসত্ত্বগ্রহণ ত্রিকালদর্শী নন। তাঁরা বর্তমান জন্মে সচেতনভাবে কুশলকর্ম সম্পাদনে বেশি তৎপর থাকেন।
৪. বুদ্ধগণ সর্বজ্ঞ। তাঁরা সকল পার্থিব ও লোকোন্তর বিষয় সম্পর্কে জানেন। মানুষসহ সকল জীবের ইহকাল ও পরকাল সম্পর্কে ভবিষ্যত্বাণী করতে পারেন।	৪. বোধিসত্ত্বগ্রহণ সর্বজ্ঞ জ্ঞানলাভের চর্চাকারী। জীবের ইহকাল ও পরকাল তাঁদের অঙ্গাত। এ-ব্যাপারে ভবিষ্যত্বাণী করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।
৫. বুদ্ধগণ স্থিত চিত্তের অধিকারী। লোভ, দ্বেষ, মোহ, নিন্দা, প্রশংসা ইত্যাদির অনেক উর্ধ্বে তাঁদের অবস্থান। তাঁরা বিমুক্ত মহাপুরুষ।	৫. বোধিসত্ত্বগ্রহণের চিত্তচাপ্ত্বল্য ঘটতে পারে। বুদ্ধদের মতো তাঁরা বিমুক্ত মহাপুরুষ নন। ভবিষ্যতে বুদ্ধ হওয়াই তাঁদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য।
৬. বুদ্ধগণ ভবিষ্যৎ বুদ্ধের আগমন সম্পর্কে আভাস দিতে পারেন।	৬. বোধিসত্ত্বগ্রহণের পক্ষে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করা সম্ভব নয়।
৭. বুদ্ধগণ আত্ম ধর্ম দর্শন প্রচার করেন।	৭. বোধিসত্ত্বগ্রহণ নিজে কোনো দর্শন প্রচার করেন না। তাঁরা সর্বদা বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম দর্শনের অনুসারী

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. ‘বুদ্ধ’ শব্দের সরল অর্থ -----।
২. দশ পারসীর সাধনা পূর্ণ করেই ----- বুদ্ধত্ব অর্জিত হয়।
৩. যিনি বোধিজ্ঞান লাভের জন্য সাধনা করেন ----- বলে।
৪. প্রত্যেক সম্যক সম্মুক্তির অনুসারিদের মধ্য ----- বুদ্ধ থাকেন।
৫. বোধিসত্ত্বগণ ----- পারমী অনুশীলনে অঙ্গীকার বন্ধ হন।
৬. জাতকের বর্ণনা মতে গৌতম বুদ্ধ ----- বার বোধিসত্ত্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন।
৭. বোধিসত্ত্ব অবস্থায় কারও পক্ষে ----- লাভ সম্ভব নয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বুদ্ধ কত প্রকার ও কী কী?
২. বোধিসত্ত্ব কত প্রকার ও কী কী?
৩. বুদ্ধ শুণে কেন অচিন্তনীয়?
৪. বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনী কোথায় বর্ণিত আছে?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বুদ্ধত্বলাভের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।
২. বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
৩. বুদ্ধ শুণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।
৪. সুমেধ তাপস কে? তিনি কীভাবে বুদ্ধ হয়েছিলেন লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- ১। ‘বোধি’ শব্দের অর্থ কী ?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ক. পরমজ্ঞান | খ. জাতিস্মর জ্ঞান |
| গ. সাধারণ জ্ঞান | ঘ. ব্রহ্মজ্ঞান |

- ২। সম্যক সম্মুক্তকে সর্বোন্ম বুদ্ধ বলার প্রধান কারণ কোনটি ?

- | | |
|--|------------------------------------|
| ক. একাধিক শিষ্য থাকা | খ. আত্মুক্তি সাধনায় পূর্ণতা অর্জন |
| গ. দুঃখমুক্তি ও ত্রুট্যাক্ষয়ের পথপ্রদর্শন | ঘ. গুরুর শরণাপন্ন না হওয়ার জন্য |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ত ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বেস্সান্তর রাজা সর্বজীবের প্রতি দয়ালু ছিলেন। তিনি কারো দৃঢ় সহ্য করতে পারতেন না। সর্বজীবকে মুক্ত করার মানসে তিনি দান পারমী পূর্ণ করতে গিয়ে সমস্ত সম্পদ দান করে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেন।

৩। বেস্সান্তর রাজাকে কোন ধরনের বৌদ্ধিসত্ত্ব বলা হয় ?

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| ক. প্রত্যেক বৌদ্ধিসত্ত্ব | খ. সম্যক সম্মেধিসত্ত্ব |
| গ. শ্রা঵ক বৌদ্ধিসত্ত্ব | ঘ. শ্রদ্ধাধিক বৌদ্ধিসত্ত্ব |

৪। সর্বজীবকে মুক্ত করার মানসে বেস্সান্তর রাজা বৃন্দ ও বৌদ্ধিসত্ত্ব যে-জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন -

- i. আর্যসত্য জ্ঞান
- ii. সম্যক জ্ঞান
- iii. সর্বজ্ঞ জ্ঞান

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন :

১। বিজয় বড়ুয়া ত্রিভুবনের সেবক ছিলেন। তিনি সর্বদা কুশলকর্মে রত থাকতেন। ভিক্ষুদের ধর্মদেশনা খুব শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করতেন। তিনি জানতে পারলেন, মার্গলাভী এক ভিক্ষু গভীর জঙ্গলে ধ্যান করতে যাচ্ছেন। তা শুনে ভিক্ষু পৌঁছার আগে তিনি সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে জঙ্গল পরিষ্কার করে সুন্দর একটি আসনের ব্যবস্থা করেন এবং বহুদূরে লোকালয়ে গিয়ে পিণ্ডাচরণের সুযোগ করে দিলেন।

- ক. জাতিস্মর জ্ঞান কী ?
- খ. বৌদ্ধিসত্ত্ব সাধনা অত্যন্ত দুর্ঘর কেন সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
- গ. বিজয় বড়ুয়ার সাথে কোন সাধকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. “বিজয় বড়ুয়া যে-কোনো এক জনে শ্রা঵ক বৃন্দ হওয়ার যোগ্য” – একথাটির সাথে তুমি কী একমত? উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২।

পারমী চর্চা
গতিশীল

স্বীয় সাধনায়
অর্হতফল লাভ
করেন

সম্যক সম্মুদ্দেশের
অনুসারী লাভাশ্রেষ্ঠ
সিবলী

ছক-১

ছক-২

ছক-৩

- ক. জগতে কার আবির্ভাব অত্যন্ত দুর্লভ ?
- খ. বুদ্ধগুণ অচিন্তনীয় কেন ? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর ।
- গ. ছক ১-এ কাদের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. ছক ২ ও ৩-এ যাঁদেরকে নির্দেশ করছে তাঁদের কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক পার্থক্য বিশ্লেষণ কর ।

তৃতীয় অধ্যায়

ত্রিপিটক

‘ত্রিপিটক’ বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনই ত্রিপিটকের মূলভিত্তি। ত্রিপিটক পালি ভাষায় রচিত। ধর্মীয় গ্রন্থ হলেও প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম-দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে ত্রিপিটকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এজন্য ত্রিপিটককে ভারতীয় উপমহাদেশের ঐতিহাসিক তথ্যভাণ্ডার হিসেবেও অভিহিত করা হয়। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু ধর্মীয় জ্ঞানকে যেমন সমৃদ্ধ করে, তেমনি মানুষের নৈতিক ও মানবিক গুণাবলিকে বিকশিত করে, এ-অধ্যায়ে আমরা পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ ত্রিপিটক সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * পটভূমি উল্লেখসহ ত্রিপিটক সম্পর্কে ধারণা দিতে পারব;
- * ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের নামসহ বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারব;
- * ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

ত্রিপিটকের পটভূমি

বুদ্ধ লিখিত আকারে কোনো ধর্মোপদেশ দান করেননি। তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ধর্মোপদেশ দান করতেন তা শিষ্যরা কঠিন করে ধারণ করে রাখতেন এবং প্রচার করতেন। বুদ্ধের শিষ্যরা ছিলেন শ্রতিধর। তাঁরা বুদ্ধবাণী সহজে স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে পারতেন। বুদ্ধশিষ্যরা একেক জন একেক রকম গুণসম্পন্ন ছিলেন। কেউ ছিলেন বিনয়ে পারদর্শী, কেউ সুত্রে, কেউ বুদ্ধের ধর্মবাণী ব্যাখ্যায়, কেউ দর্শনে, কেউ ধর্ম দেশনায়। এ-কারণে বুদ্ধশিষ্যগণ বিভিন্ন উপাধিতে ভূষিত হতেন। যেমন : বিনয়ধর, সূত্রধর, অভিধর্মধর, ধর্মকথিক, অগ্রাহাবক, মহাগ্রাবক ইত্যাদি। ভিক্ষু উপালি ছিলেন বিনয়ধর। তিনি বুদ্ধভাষিত বিনয় ধারণ, পালন ও ব্যাখ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অদ্বপ্রাপ্ত আনন্দ ছিলেন সূত্রধর। তিনি বুদ্ধভাষিত সূত্রসমূহ ধারণ করে রাখতেন। এজন্য তাঁকে ‘ধর্মভাষারিক’ বলা হতো। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় মহাকচ্ছায়ন, সারিপুত্র, মহাকোট্ঠিত থের ছিলেন অগ্রগণ্য। এরূপ বুদ্ধের অসংখ্য শিষ্য ছিলেন। শ্রতিধর এসব শিষ্য বুদ্ধের ধর্মবাণী ধারণ, পালন এবং প্রচারে খুবই যত্নশীল ছিলেন। তখন কেউ এই অমূল্যবাণী লিখে রাখার কথা ভাবেননি।

বুদ্ধশিষ্যগণ সবসময় এক স্থানে থাকতেন না। তাঁরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে বুদ্ধবাণী প্রচার করতেন। বুদ্ধের জীবিতকালে সঙ্গে যে-কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে তা বুদ্ধ সমাধান করতেন। কখনো বুদ্ধের মেত্হানীয় শিষ্যগণ তাঁর অনুমতিসাপেক্ষে সমাধান করতেন। ফলে বুদ্ধের জীবিতকালে বড় ধরনের কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভে কতিপয় দুর্বিনীত ভিক্ষু বুদ্ধের মহাপারিনির্বাণে পুলকিত বোধ করেন। কারণ, তাঁদের আর বুদ্ধের বিনয়-বিধান মেনে চলতে হবে না। বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করলে বুদ্ধশিষ্যগণ কান্না করতে থাকেন। তখন বুদ্ধের শেষ শিষ্য সুভদ্রা ভিক্ষুদের শোক করতে নিয়ে থেকে করেন এবং বলেন, মহাশ্রমণের মৃত্যুতে আমরা উপদ্রব হতে মুক্ত হয়েছি এবং এখন থেকে আমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারব। বুদ্ধশিষ্যগণ সুভদ্রের উক্তি এবং দুর্বিনীত শিষ্যদের মনোভাব বুঝে বুদ্ধবাণীর পরিহানির আশঙ্কায় শক্তি হয়ে ওঠেন। তাঁরা আশঙ্খা করলেন, বুদ্ধবাণী অসংকলিত অবস্থায় থাকলে যে-কোনো সময় বিকৃত হতে পারে। অতঃপর, বুদ্ধশিষ্যগণ মহাকশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে প্রথম সঙ্গীতি আয়োজন করে

বুদ্ধবাণী সংকলিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর রাজা অজাতশত্রু পঠপোষকতায় রাজগৃহের সপ্তগণী গুহায় এ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীতিতে পাঁচশত অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীতিতে বুদ্ধের অন্যতম শিয় উপালি ও আনন্দ যথাত্মে ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি করেন। উপস্থিত ভিক্ষুসম্মত তাঁদের আবৃত্তিকৃত ধর্ম-বিনয় বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদন করেন। এ সঙ্গীতি সাত মাসব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। এভাবে ভিক্ষুসম্মের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী ধর্ম ও বিনয় হিসেবে দুভাগ করে সংকলন করা হয়।

প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত ধর্ম-বিনয় বুদ্ধশিয়গণ কঠস্তু করে সংরক্ষণ ও প্রচার করতেন। কিন্তু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশত বছর পরে বজ্জপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিনয় বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান চালু করলে সঙ্গে বিভাজন সৃষ্টি হয় এবং বুদ্ধবাণী নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। তখন এ বিতর্ক নিরসনের জন্য দ্বিতীয় সঙ্গীতির আয়োজন করা হয়। বৈশালীর বালুকারামে যশ স্থাবিরের নেতৃত্বে এবং রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতি আটমাস স্থায়ী হয়েছিল। এতে সাত শত অর্হৎ ভিক্ষু অংশ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে উপস্থিত ভিক্ষুগণ বজ্জপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত বিধিবিধান বিচার-বিশ্লেষণ করে বিনয় বহির্ভূত হিসেবে রায় প্রদান করেন এবং প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত ধর্ম ও বিনয় পুনরায় আবৃত্তিপূর্বক প্রকৃত বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদন করেন। ভিক্ষুগণ তা কঠস্তু করে সংরক্ষণ ও প্রচার করতে থাকেন। কিন্তু সন্মাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সংকরণ বেড়ে গেলে অন্যান্য ধর্মের তীর্থিকগণ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করে সঙ্গে প্রবেশ করতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। ফলে সঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টি হয় এবং প্রকৃত বুদ্ধবাণী নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। এ-সমস্যা নিরসনের জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর সন্মাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মোঞ্চলিপুত্র তিয় থেরের সভাপতিত্বে পাটলীপুত্রের অশোকারাম বিহারে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সঙ্গীতি নয় মাস স্থায়ী হয় এবং এতে এক হাজার অর্হৎ ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির অনুকরণে এ-সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী পুনর্বার আবৃত্তিপূর্বক সংকলন করা হয়। এ-সঙ্গীতিতে বুদ্ধের দর্শনিক বাণীসমূহ অভিধর্ম নাম দিয়ে পৃথকভাবে সংকলন করা হয়। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করেন যে, ধর্মের মধ্যে অভিধর্ম অস্তর্ভুক্ত ছিল। তাই প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী কেবল ধর্ম-বিনয় নামে বিভক্ত ছিল। তৃতীয় সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী তিন ভাগে বিভক্ত করে সূত্র, বিনয় এবং অভিধর্ম হিসেবে বিন্যস্ত করে সংকলন করা হয়, যা ত্রিপিটক নামে পরিচিতি লাভ করে।

তৃতীয় সঙ্গীতির সন্মাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধবাণী ভারতের বাইরে প্রচার লাভ করে। সন্মাট অশোকপুত্র মহিন্দ্র স্থাবির কতিপয় সঙ্গীসহ ত্রিপিটক কঠস্তু করে সিংহলে নিয়ে যান। সেখানে তা মুখেমুখে প্রচার করা হতো। যুদ্ধবিঘ্ন, দুর্ভিক্ষ এবং নানা কারণে সিংহলে বুদ্ধশাসন পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। বুদ্ধবাণী বিকৃত ও বিলুপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য লিখিতরূপ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। অতঃপর, খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলের রাজা বটগামিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় তালপত্রে বা ভূর্জপত্রে ত্রিপিটক লিখে রাখা হয় এবং এভাবে বুদ্ধবাণীর স্থায়ী রূপ দান করা হয়। কালক্রমে আরও স্থায়িত্বান্বিত জন্য ত্রিপিটক তালপত্র থেকে পাথরে খোদাই করে, কাগজে লিখে এবং টেপেরেকর্টেরে ধারণ করে সংরক্ষণ করা হয়। গ্রন্থরূপ প্রদানের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনের পালি টেকস্ট সোসাইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ছাড়াও থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা এবং মিয়ানমারসহ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সংগঠন বুদ্ধবাণী পুস্তক আকারে প্রকাশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে বুদ্ধবাণী নানা চড়াই-উত্তরাই পার হয়ে ত্রিপিটকের রূপ পরিগ্রহ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধবাণী প্রথম কেন এবং কোথায় সংকলন করা হয়েছিল?

কখন বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক আকারে সংকলিত হয়েছিল?

বুদ্ধবাণী কোথায় এবং কখন লিখিতরূপ পরিগ্রহ করেছিল?

পাঠ : ২

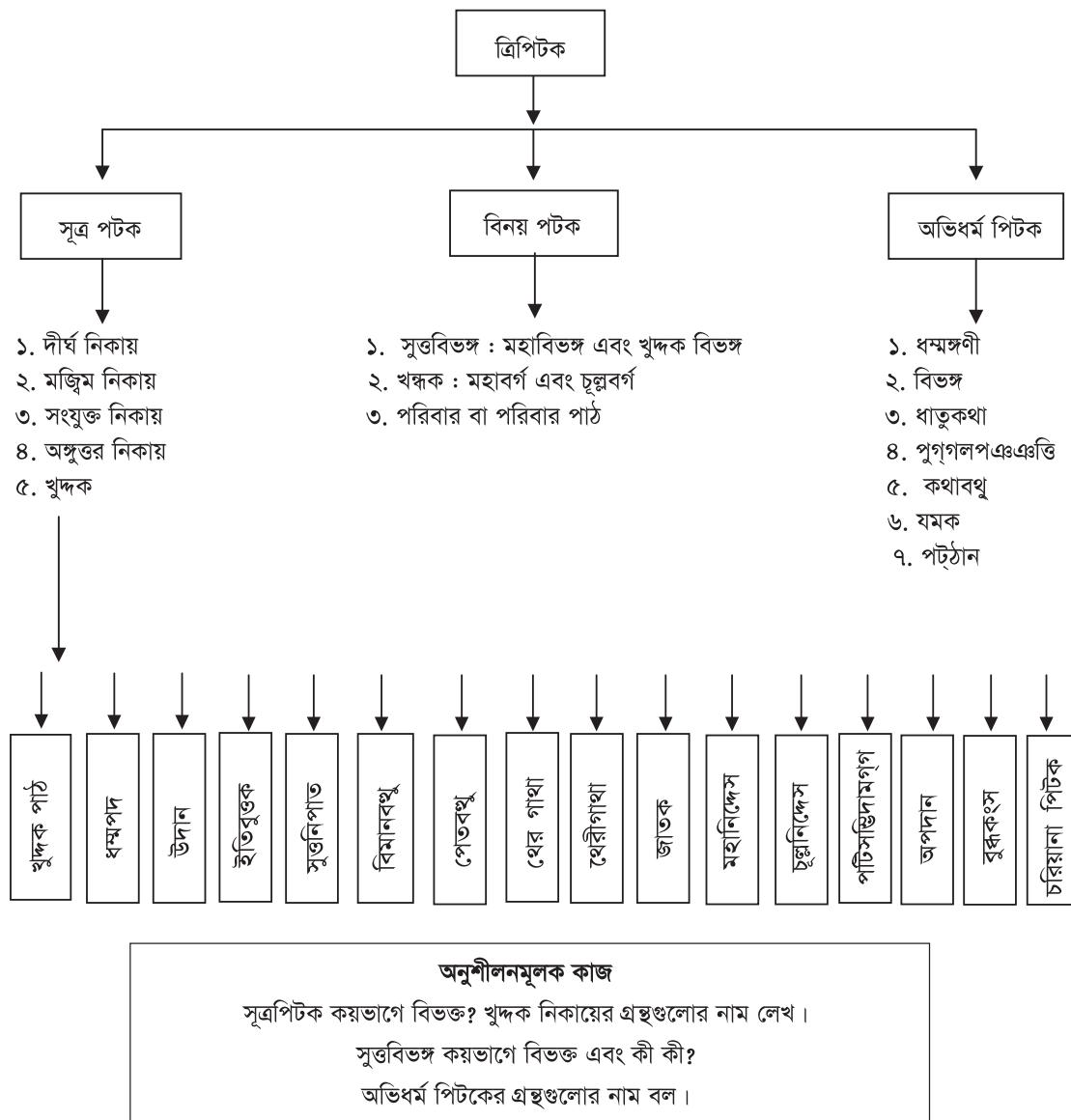
ত্রিপিটক পরিচিতি

মহামতি বুদ্ধের মুখনিঃসূত অমূল্য বাণীর সংকলন হলো ‘ত্রিপিটক’। ত্রিপিটক শব্দটি ‘ত্রি’ এবং ‘পিটক’ শব্দের সমষ্টয়ে গঠিত। ‘ত্রি’ শব্দের অর্থ ‘তিনি’ আর ‘পিটক’ শব্দের অর্থ হলো আধার, পেটিকা, বুড়ি ইত্যাদি। বুদ্ধবাণী ধরনা ও প্রকৃতি অনুসারে তিনটি ধারায় বিভক্ত করে তিনটি পেটিকা বা আধারে সংরক্ষণ করা হয় বলে তা ত্রিপিটক নামে অভিহিত। তিনটি পিটক হলো : ১ সূত্র পিটক ২ বিনয় পিটক এবং ৩ অভিধর্ম পিটক। বুদ্ধের ধর্মবাণী সূত্র আকারে গ্রথিত ভাগকে সুত্র বা সূত্রপিটক বলে। সূত্রপিটক পাঁচটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যথা : দীর্ঘ নিকায়, মজ্জিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদক নিকায়। নিকায় শব্দের অর্থ দল, ভাগ, সম্প্রদায় ইত্যাদি। বুদ্ধভাষিত দীর্ঘ সূত্রগুলো দীর্ঘ নিকায়ে বা ভাগে সংকলিত করা হয়। তাই এটি দীর্ঘ নিকায় নামে অভিহিত। মধ্যম আকৃতির সূত্রসমূহ যে-নিকায় বা ভাগে সংকলিত করা হয়েছে তা মজ্জিম নিকায় নামে পরিচিত। পূর্ববর্তী দুটি নিকায়ের তুলনায় ক্ষুদ্র এবং বিভিন্ন আঙিকের বিষয়বস্তু সংযুক্ত সূত্রসমূহ যে নিকায়ে সংকলিত করা হয়েছে তা সংযুক্ত নিকায়ে নামে কথিত। সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ধারায় বিধৃত সূত্রসমূহ যে-নিকায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা অঙ্গুত্তর নিকায়ে নামে খ্যাত। এ-নিকায়ে বিষয়বস্তুসমূহ এক নিপাত, দুই নিপাত, তিন নিপাত একুপ সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধির ধারায় বিন্যস্ত করে সংকলিত করা হয়। ‘খুদক’ শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র বা ছোট। বুদ্ধভাষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রসমূহ যে-নিকায়ে সংকলিত তা খুদক নিকায় নামে পরিচিত। খুদক নিকায়ে ঘোলটি গ্রহ আছে। যথা : খুদক পাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিরুত্তক, সুত্রনিপাত, বিমানবথু, পেতবথু, থের-গাথা, থেরী-গাথা, জাতক, মহানিদেস, চূল্লানিদেস, পটিসম্মিদামগ্রগ, অপদান, বুদ্ধবৎস এবং চরিয়া পিটক।

‘বিনয়’ শব্দের অর্থ হলো নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা বা বিধিবিধান। বুদ্ধ-নির্দেশিত বিধিবিধান যে-পিটকে সংকলিত আছে তা বিনয় পিটক নামে অভিহিত। ভিক্ষুসংঘ সুশৃঙ্খল, ন্যায়-নিষ্ঠা, পারম্পরিক সৌহার্দ্য এবং সুষ্ঠুভাবে পারিচালিত হওয়ার মানসে বুদ্ধ এসব বিনয় বা বিধিবিধান নির্দেশ করেছিলেন। বিনয়পিটক প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : ১ সূত্রবিভঙ্গ ২ খন্দক এবং ৩ পরিবার। সূত্রবিভঙ্গ আবার দুভাগে বিভক্ত : মহাবিভঙ্গ এবং খুদকবিভঙ্গ। মহাবিভঙ্গে পারাজিকা এবং সংঘাদিসেসহ ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় বিধিবিধানসমূহ রয়েছে বলে এটি পারাজিকাকেও বা ভিক্খুবিভঙ্গও বলা হয়। খুদকবিভঙ্গে ভিক্ষুগীদের প্রতিপালনীয় বিধিবিধানসমূহ রয়েছে। এটিকে পাচিত্তিয়া বা ভিক্খুগীবিভঙ্গও বলা হয়। সূত্রবিভঙ্গের দুটি গ্রন্থে বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহকে একত্রে পাতিমোক্ত (পাতিমোক্ষ) বলা হয়। খন্দক দুভাগে বিভক্ত। যথা : মহাবগ্গ এবং চূল্লবগ্গ। মহাবগ্গ গ্রন্থে বুদ্ধের বুদ্ধতুলাভ থেকে সংজ্ঞ প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বুদ্ধের জীবনকাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। চূল্লবগ্গ গ্রন্থে ভিক্ষুসংঘের বিভিন্ন নিয়মকানুনসহ বুদ্ধের মহাপরিনির্বাগের পরে অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির বর্ণনা পাওয়া যায়।

বুদ্ধের দর্শনের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্মা বিশ্লেষণই অভিধর্ম। বৌদ্ধ দর্শনই অভিধর্ম পিটকের মূল আলোচ্য বিষয়। অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা : ১ ধ্যমসঙ্গণী ২ বিভঙ্গ ৩ ধাতুকথা ৪ পুগ্গলপঞ্চঞ্চতি ৫ কথাবথু ৬ যমক এবং ৭ পট্টান।

নিম্নে ত্রিপিটকের বিভাজন ছকে প্রদর্শন করা হলো :



পাঠ : ৩

সূত্র পিটক

সূত্র পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা : দীঘ নিকায়, মজ্জিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুর নিকায় এবং খুদক নিকায়। নিম্নে নিকায়সমূহের বর্ণনা দেওয়া হলো :

ক. দীঘ নিকায় : দীঘ নিকায় সূত্র পিটকের প্রথম ভাগ। দীঘ নিকায়ে সর্বমোট চৌত্রিশটি সূত্র আছে। সূত্রগুলো তিনটি বর্গে বিভক্ত। যথা : শীল স্কন্দবর্গ, মহাবর্গ এবং পাটিকবর্গ। প্রথম বর্গে তেরোটি সূত্র আছে। সূত্রগুলো গদ্যে রচিত। দ্বিতীয় বর্গে দশটি সূত্র, তৃতীয় বর্গে এগারোটি সূত্র আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গের বহু সূত্র গদ্যে ও পদ্যে রচিত। দান, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, ধ্যান, বিমোক্ষ, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, চিত্ত, চৈতসিক ও নির্বাণ ইত্যাদি দীঘ নিকায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এ নিকায়ে প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদশের ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পাওয়া যায়। বিশেষত বাষটি প্রকার ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদ এবং জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে দীঘ নিকায়ে যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তা বুদ্ধের সমসাময়িককালের প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে সচ্ছ ধারণা প্রদান করে। এ-ছাড়া এ-নিকায়ের মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধের জীবন চরিত্রের চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। দীঘ নিকায়ে ধর্ম-দর্শন অপেক্ষা নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠনে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

খ. মজ্জিম নিকায় : এটি সূত্র পিটকের দ্বিতীয় ভাগ। মধ্যম নিকায়ের পঞ্চ নিকায়ের মধ্যে সর্বোত্তম। যে-সূত্রগুলো মধ্যম আকৃতির সেগুলো এনিকায়ে স্থান পেয়েছে। এতে একশত বায়ানটি সূত্র আছে। সূত্রগুলো তিনটি বর্গে বিভক্ত। যথা : মূল পঞ্চঞ্চাসক, মজ্জিম পঞ্চঞ্চাসক বর্গ এবং সেল পঞ্চঞ্চাসক বর্গ। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্গে পঞ্চাশটি, তৃতীয় বর্গে বায়ানটি সূত্র আছে। এ নিকায়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো : চারি আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্যসমূৎপাদ নীতি, পার্থিব ভোগসুখের অসারাতা, পরমার্থ সত্য, নির্বাণ ইত্যাদি। এ-গ্রন্থে বুদ্ধের সমকালীন ছয়টি তীর্থিক সঙ্গের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তা ছাড়া ভিক্ষুদের জীবনযাত্রা, ভিক্ষুসঙ্গের সাথে গৃহী ও রাজন্যবর্গের সম্পর্ক, বুদ্ধকালীন ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও ধর্মীয় অবস্থার বিবরণও পাওয়া যায়। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অপরিহার্য আচরণীয় বিষয়সমূহ এ-গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ও সরলভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই পাঁচটি নিকায়ের মধ্যে মজ্জিম নিকায়কে সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়। বিখ্যাত আচার্য বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থসমূহের মধ্যে মজ্জিম নিকায়কে সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

গ. সংযুক্ত নিকায় : সংযুক্ত নিকায়ে ছাপ্তান্তি সংযুক্ত বা অধ্যায় আছে। এগুলো পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। সগাথা বর্গে এগারোটি, নিদান বর্গে বারোটি, খন্দ বর্গে তেরোটি, সলায়তন বর্গে দশটি এবং মহাবর্গে বারেটি অধ্যায় আছে। পাঁচটি বর্গে মোট সূত্রসংখ্যা ২৮৮৯টি। সূত্রগুলো নৈতিক, মনস্তন্ত, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে সম্পর্কীয় সূত্রের সমবায়ে রচিত। দীঘ ও মজ্জিমনিকায়ের তুলনায় সংযুক্ত নিকায়ের সূত্রগুলো ছোট হলেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বিষয়বস্তু তিনটি ধারায় বিভাজন করে অবস্থান করে উপস্থাপন করা হয়েছে : ১. ধর্ম-দর্শন ২. দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি সম্পর্কীয় ঘটনা এবং ৩. ধর্মীয় ব্যক্তি। প্রথম বর্গে শীল, আচার-অনুষ্ঠান, আদর্শ জীবনযাপন ও চরিত্র গঠনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বর্গ ধর্ম, দর্শন ও বিবিধ আলোচনায় সমৃদ্ধ। এ-নিকায়ে কিছু ছোট ছোট কবিতা বা গাথা আছে যার সাহিত্যিক ও দার্শনিক মূল্য অপরিসীম। কথোপকথনের আকারে এসব কবিতা রচিত। এ ছাড়া, কোশলরাজ প্রসেনজিত, মহাপ্রজাপতি গৌতমী, মারকে পরাভব, বুদ্ধ কর্তৃক ত্রাক্ষণদের উপদেশ, বুদ্ধ ও যক্ষের কথোপকথন, বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করা, লাভ সৎকারের বিষয়, পঞ্চক্ষন্থ, তিন প্রকার বেদনা প্রভৃতি সম্পর্কে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বলা যায়, সংযুক্ত নিকায় আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও দার্শনিক বিষয়ের বর্ণনায় খুবই সমৃদ্ধ।।

ঘ. অঙ্গুত্তর নিকায় : অঙ্গুত্তর নিকায়ে মোট ২৩০৮টি সূত্র রয়েছে। সুত্রগুলো গদ্যে ও পদ্যে রচিত এবং এগারোটি নিপাত বা অধ্যায়ে বিভক্ত। আলোচ্য বিষয়ের সংখ্যা অনুসারে নিপাতসমূহের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন : এক নিপাতে একটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। অন্দপ দুক বা দুই নিপাতে দুইটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রত্যেকটি নিপাত আবার কতিপয় বর্ণে বিভক্ত। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় রকমের সূত্র রয়েছে। এ নিকায়ে বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমাবেশ ঘটেছে। অন্যান্য নিকায়ের মতো অঙ্গুত্তর নিকায়ে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, শ্রদ্ধা, বীর্য ও বিনয়-সম্পর্কিত বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়াও এখানে চতুর্ল চিত্তকে সং্যত করা, পাপ পরিত্যাগ, তিনি প্রকার লোকের কথা, ইন্দ্রিয়দমন, মিতাহার, ও অপ্রমত্তা – তিনটি বিষয়ের প্রতি সজাগতা থাকা, দেবদন্তের পরিগাম, নারী-পুরুষের চরিত্র, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, বৌদ্ধ উপাসক-উপাসিকার দায়িত্ব-কর্তব্য ও আচার-আচরণ, উপোসথ এবং উপোসথের উপযোগিতা, সুখ-দুঃখ, শোতাপত্তি মার্গ ও ফল, স্কন্দাগামী মার্গ ও ফল, অনাগামী মার্গ ও ফল এবং অর্হত্ত মার্গ ও ফল ইত্যদি বিষয়ে মূল্যবান বিবরণ এখানে পাওয়া যায়।

অঙ্গুত্তর নিকায় প্রাচীন ভারতের দণ্ডবিধান পদ্ধতি, ভৌগোলিক, সামাজিক, ধর্মীয় অবস্থারও নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। এ ছাড়া, সে-সময়কার রাজা-মহারাজা, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী, উপাসক-উপাসিকা প্রভৃতি সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। তাই অঙ্গুত্তর নিকায়ের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

ঙ. খুদ্দক নিকায় : খুদ্দক নিকায় সুত্র পিটকের সর্বশেষ সর্বশেষ ভাগ। এ-নিকায়ের বিষয়বস্তু শোল ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ খুদ্দক নিকায় মোলটি গ্রন্থের সমন্বয়ে গঠিত। একেকটি গ্রন্থের বিষয়বস্তু একেক রকম। গ্রন্থসমূহের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতা নেই। খুদ্দক নিকায়ে বৈচিত্র্যময় বিষয়ের সমাহার লক্ষ করা যায়। তাই খুদ্দক নিকায়কে প্রকীর্ণক সংগ্রহও বলা হয়। আকারে ছোট হলেও গ্রন্থগুলোর বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অপরিসীম। নবদীক্ষিত ভিক্ষু-শ্রমণরা অন্যান্য গ্রন্থ শিক্ষা করার পূর্বে খুদ্দক নিকায়ের গ্রন্থগুলো শিক্ষা করেন। খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থগুলো হলো : ১. খুদ্দক পাঠো ২. ধ্যাপদ ৩. উদান ৪. ইতিবৃত্তক ৫. সন্তনিপাত ৬. বিমান বথু ৭. পেতবথু ৮. থের গাথা ৯. থেরী গাথা ১০. জাতক ১১. মহানিদেস ১২. চূল্ণনিদেস ১৩. পাটিসম্মিদামঘ ১৪. অপদান ১৫. বুদ্ধবংস এবং ১৬. চরিয়াপিটক।

অনুশীলনীযুক্ত কাজ

ত্রিপিটকের গ্রন্থগুলো ছকে প্রদর্শন কর
অঙ্গুত্তর নিকায়ে বিষয়বৃত্ত কীভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে?
খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর তালিকা তৈরি কর

পাঠ : ৪

বিনয় পিটক

বিনয়কে বুদ্ধশাসনের আয়ু বলা হয়। কারণ বিনয় ব্যতীত বুদ্ধশাসনের স্থিতি অপরিকল্পনীয়। বিনয়ের স্থিতিতেই বুদ্ধশাসনের স্থিতি নির্ভরশীল। বলা হয়ে থাকে যে, সুত্র ও অভিধর্ম লুপ্ত হয়ে গেলেও যদি বিনয় পিটক পরম আদরে, গভীর শ্রদ্ধায় ও গৌরবের সাথে অনুশীলিত হয় তবে বুদ্ধের ধর্ম কখনো লুপ্ত হবে না। এ-বিনয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাগের তিন মাস পরে অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম বিনয় সংগ্রহ করা হয়েছিল।

বিনয়ের অপর নাম ‘নিয়ম’, ‘নীতি’ বা ‘শৃঙ্খলা’ ইত্যাদি। বিনয়কে সহজ অর্থে ‘শীল’ বলা হয়। পৃথিবীর সবকিছুই নিয়ম ও শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত হয়। গ্রহ, তারা, নক্ষত্র সবই একটি নিয়মের মধ্য দিয়েই আবর্তিত। পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য, রংধনুর সমারোহ, সূর্যরশ্মি পর্যন্ত কার্যকারণ নিয়মে আবদ্ধ। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর্যোগিতা সবচেয়ে বেশি। অসংযম, আলস্যপরায়ণ, প্রমাদপরায়ণ, অনৈতিকতা, অমিতব্যয়িতা, লোভ, দেষ, মোহ, দুঃশীলতা সকল প্রকার উন্নতির পরিপন্থী। অপরদিকে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম, চরিত্রবল, শীল, সমাধি, উদ্যম, উৎসাহ, প্রচেষ্টা, নিয়মানুবর্তিতা, আত্মত্যাগ, শুদ্ধি, সন্তুষ্টি, প্রজ্ঞা, সৎকর্ম সকল প্রকার উন্নতির মূল চাবিকাঠি। বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের উন্নতির জন্যই বিনয়ের শিক্ষাপদসমূহ বিধিবদ্ধ করেছিলেন। বিনয়ের নিয়মগুলো দৈনন্দিন জীবনযাপন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অপরিহার্য। তাই বুদ্ধ বলেছেন :

সতবস্সোপি পবক্ষজ্ঞা সিক্খন্তো পিটকন্ত্যৎ

ওবাদৎ নানুবত্তন্তে নিরযং সো উপলজ্জতি ।

অর্থাৎ “যদি কোনো ভিক্ষু শতবর্ষব্যাপী ত্রিপিটক অধ্যয়ন করেও সম্যকরণে শীল পালন না করেন, তবে মৃত্যুর পর তাঁকে নরকে যেতে হয়।”

তিনি আরও বলেছেন :

তস্সপাসাধিকৎ হোতি পত্তীবরং ধারণং

পবক্ষজ্ঞা সফলা তস্স যস্স সীল সুনির্মলং ।

অর্থাৎ পাত্র চীবর ধারণ তারই শোভা পায়, যার শীল সুনির্মল। শীলবান ব্যক্তির জীবন সবচেয়ে বেশি সুখকর হয়।

উপরিউল্লিখিত গাথাগুলোর মর্মার্থ অনুধাবন করে জ্ঞানীমাত্রাই বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং বিনয়ী আচরণ করা উচিত। বিনয় সকল প্রকার কুশলকর্মের ভিত্তিস্বরূপ। বিনয় ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্যপালনীয় বিধিবিধান হলেও এতে উন্নত পারিবারিক জীবনযাপনের সুন্দর দিকনির্দেশনা রয়েছে। বিনয়ে অনুশীলনে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি জাহাত হয়। তাই বিনয়ের পঠনপাঠন একান্ত প্রয়োজন।

বিনয় পিটকের প্রধানত তিনিভাগে বিভক্ত। যথা :

ক. সুত বিভঙ্গ : এটি ভিক্খুবিভঙ্গ এবং ভিক্খুণী বিভঙ্গ নামে দুভাগে বিভক্ত।

খ. খন্দক : এটি মহাবর্গ এবং চূল্বর্গ নামে দুভাগে বিভক্ত এবং

গ. পরিবার বা পরিবার পাঠ

ক. সুত বিভঙ্গ

বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ হলো সুত বিভঙ্গ। সুত শব্দের অর্থ হলো সূত্র, আর ‘বিভঙ্গ’ শব্দের অর্থ ভেঙে ফেলা অর্থাৎ ভেঙে বা সুস্থাপিসূক্ষ্মভাবে ভাবার্থ ব্যাখ্যা করা। অতএব ‘সুত বিভঙ্গ’ শব্দের অর্থ হলো ‘সূত্র ব্যাখ্যা’ অর্থাৎ বিনয়ের নিয়ম-নীতি বা মূল শিক্ষাপদের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। পাতিমোক্ষে ২২৭টি শীলের বিস্তৃত ব্যাখ্যা সুত বিভঙ্গে পাওয়া যায়। এতে নিয়মগুলো কোথায় কীভাবে বুদ্ধ প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল? শীল ভঙ্গকারী কে? শীলবিশুদ্ধ সম্পর্কীয় অপরাধসমূহ কীভাবে নির্ধারণ করতে হয়? কী প্রকারে শাস্তি প্রদান করলে আপত্তিপ্রাণ ভিক্ষু শীলবিপত্তি হতে নিষ্ক্রিয়াভ করতে পারে? এসব বিষয়ের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণই সুত বিভঙ্গের মূল উপজীব্য বিষয়। সুত বিভঙ্গের নীতিসমূহের গুরুত্ব অনুসারে আটভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিসঙ্গীয়া, পাচিভিয়া, পতিদেসনিয়া, সেখিয়া এবং অধিকরণ সমূহ।

এই নীতিগুলো ভিক্খু বিভঙ্গ এবং ভিক্খুণী বিভঙ্গ -এ দুটি এন্টে সংকলিত। কোনো নীতি লজ্জানে কী অপরাধ এবং কীনা তার প্রতিকার তার ব্যাখ্যা এন্টেয়ে পাওয়া যায়। তাই সুন্ত বিভঙ্গকে আইন বা নীতিশাস্ত্র হিসেবেও গণ্য করা হয়।

১. **ভিক্ষু বিভঙ্গ :** বিনয় পিটকের প্রথম ঘৃত্ত। এ-ঘৃত্তে ভিক্ষুদের বিনয়সম্পর্কিত নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ আছে। বৃক্ষ কোথায়, কীভাবে, কাকে উদ্দেশ করে এসব নিয়ম-নীতি নির্দেশ করেন, শীল ভঙ্গকারীর দোষ এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণিত আছে। ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় নিয়মগুলো এ-ঘৃত্তে আটভাগে ভাগ করে বর্ণনা করে হয়েছে। যথা : পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিসংশীয়া, পাচিত্তিয়া, পাটিদেসনিয়া সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ। এতে সর্বমোট ২২৭টি শীলের ব্যাখ্যা আছে।
২. **ভিক্ষুণী বিভঙ্গ :** ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় নিয়মগুলো এ-ঘৃত্তে লিপিবদ্ধ আছে। ভিক্ষু বিভঙ্গের পরিপূরক হিসেবে এটি রচনা করা হয়। এ-ঘৃত্তে ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় নিয়মগুলো আট ভাগে বিভক্ত করে বর্ণিত হয়েছে। যথা : পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিসংশীয়া, পাচিত্তিয়া, পাটিদেসনিয়া সেখিয়া এবং অধিকরণ সমথ। ভিক্ষুণীদের শীলের সংখ্যা ৩১। উল্লেখ থাকে যে, ভিক্ষুদের চেয়ে ভিক্ষুণীদের শীলের সংখ্যা ৮৪টি বেশি।

সুন্ত বিভঙ্গের অন্তর্গত ভিক্খু বিভঙ্গ ও ভিক্খুণী বিভঙ্গ এন্টেয়ে পারাজিকা ও পাচিত্তিয়া নামেও পরিচিত।

৪. খন্দক

বিনয় পিটকের দ্বিতীয় ভাগের নাম খন্দক। এতে গৌতম বুদ্ধের সম্বোধিলাভের পরের ঘটনাগুলো বর্ণিত আছে। খন্দকের বিশেষত্ত্ব হচ্ছে যে এতে বিনয়ের বিধিবিধানসমূহকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে প্রাচীন ভারতের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, ভ্রমণ, নির্মাণ ও উন্নয়ন একুপ বহু ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যে খন্দক সমৃদ্ধ। খন্দক মহাবগ্গ এবং চূল্লবগ্গ এ-নূতনে বিভক্ত।

১. মহাবগ্গ

মহাবগ্গ গ্রন্থটি দশটি অধ্যায় বা ক্ষক্তে বিভক্ত। যথা : ১. মহাখন্দক ক্ষক্ত ২. উপোসথ ক্ষক্ত ৩. বৈসুপনায়িক ক্ষক্ত ৪. প্রবারণা ক্ষক্ত ৫. চর্ম ক্ষক্ত ৬. তৈবজ ক্ষক্ত ৭. কর্তৃন ক্ষক্ত ৮. চীবর ক্ষক্ত ৯. চম্পেয় ক্ষক্ত এবং ১০. কৌশান্ধিক ক্ষক্ত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের আকার বৃহৎ বলেই গ্রন্থটি মহাবগ্গ নামে অভিহিত। এ-ঘৃত্তে গৌতম বুদ্ধের সম্বোধিলাভের পরের ঘটনাগুলো বর্ণিত আছে। বিশেষত বুদ্ধত্বলাভ হতে সম্ভ প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বুদ্ধের জীবনের নানা কাহিনী মহাবগ্দগে আলোচিত হয়েছে। বুদ্ধের ধারাবাহিক জীবনী রচনার জন্য গ্রন্থটির মূল্য অপরিসীম। বুদ্ধত্বলাভের পর থেকে শুরু করে সম্ভ প্রতিষ্ঠাকাল পর্যন্ত বুদ্ধ যেসব বিনয়বিধান চালু করা হয়েছিল তার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। গ্রন্থটিতে বুদ্ধের সমসাময়িক কালের অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ রয়েছে। বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের ইতিহাস, বৌদ্ধসংজ্ঞের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ধর্মচক্র প্রবর্তন, পঞ্চবর্ণীয় শিয়ের দীক্ষা, বুদ্ধের সাথে সাক্ষাতের জন্য ধনাত্য যশের পরিভ্রমণ, রাজা বিবিসারের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাত্সহ গুরুত্বপূর্ণ বহু ঐতিহাসিক তথ্যে গ্রন্থটি ভরপূর। এ ছাড়াও শিক্ষাদান পদ্ধতি, গুরু-শিয়ের সম্পর্ক, আদর্শ জীবনগঠনের সঠিক দিক নির্দেশনাও রয়েছে।

২. চূল্লবগ্গ

চূল্লবগ্গে বারোটি অধ্যায় বা ক্ষক্ত আছে। যথা : ১. কর্ম ক্ষক্ত ২. পারিবাসিক ক্ষক্ত ৩. সমুচ্ছয় ক্ষক্ত ৪. শমথ ক্ষক্ত ৫. ক্ষুদ্রবন্ধু ক্ষক্ত ৬. শয়ন আসন ক্ষক্ত ৭. সংযতভেদক ক্ষক্ত ৮. ব্রত ক্ষক্ত ৯. প্রাতিমোক্ষ ক্ষক্ত ১০. ভিক্ষুণী ক্ষক্ত ১১. পঞ্চশতিকা ক্ষক্ত এবং ১২. সপ্তশতিকা ক্ষক্ত। ‘চূল্ল’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র। নামকরণ হতে সহজেই বোৰা যায় এন্টের ক্ষক্তগুলো ক্ষুদ্র। অধ্যায় বা ক্ষক্তগুলোর আয়তন মহাবগ্গের তুলনায় ক্ষুদ্র বলে গ্রন্থটিকে চূল্লবগ্গ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

প্রথম থেকে দশম অধ্যায় পর্যন্ত বুদ্ধ জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে কী উদ্দেশ্যে কোন বিধিবিধান প্রবর্তন করেছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে। একাদশ অধ্যায়ে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির বিবরণ বর্ণনা করা হয়। দ্বাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় সঙ্গীতির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ পাওয়া যায়। নারীজাতির সংষে প্রবেশ, মহাপ্রজাপতি গৌতমীসহ অন্যান্যদের দীক্ষাদান, তিক্ষুগীদের নিয়ম-কানুন, বুদ্ধ কী কী শর্তে ভিক্ষুণী সঙ্গ প্রতিষ্ঠায় সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন প্রভৃতি সম্পর্কেও চূল্পবগ্গে বর্ণনা পাওয়া যায়।

গ. পরিবার বা পরিবার পাঠ্টো

বিনয় পিটকের এটি শেষ গ্রন্থ। বুদ্ধকালীন সময়ের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্গের আচার-আচরণে আপত্তিজনক বিষয়াবলি গ্রন্থটিতে বর্ণিত আছে। বিশেষত, বিনয়ের জটিল এবং দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ প্রশ্নোভরের মাধ্যমে এ-গ্রন্থে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নতুন শিক্ষার্থী ভিক্ষুদের জন্য বিনয়শিক্ষার উপকরণ হিসেবে গ্রন্থটি অত্যন্ত মূল্যবান। ছোট-বড় সব মিলে এতে সর্বমোট একুশটি অধ্যায় আছে। এগুলো গদ্যে ও পদ্যে রচিত। প্রত্যেক অধ্যায়ই বিনয়-সংঘটিত শিক্ষাপদসমূহের ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। তাই গ্রন্থটিকে বিনয় পিটকের সারবস্ত্র বলা হয়।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

বিনয়কে কেন বুদ্ধশাসনের আয়ু বলা হয়?

সুন্ত বিভঙ্গকে কেন আইন বা নীতিশাস্ত্র হিসেবেও গণ্য করা হয়?

পরিবার গ্রন্থটিকে কেন বিনয় পিটকের সারমর্ম বলা হয়?

পাঠ : ৫

অভিধর্ম পিটক

ত্রিপিটকের তৃতীয় বা শেষ ভাগ হলো অভিধর্ম পিটক। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের সমৃদ্ধ আলাচনায় গ্রন্থটি ভরপুর। সূত্র পিটকে যেসব দার্শনিক ও নৈতিক বিষয়সমূহ অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন সেসব বিষয় অভিধর্ম পিটকে সূক্ষ্ম ও বিস্মৃতভাবে ব্যাখ্যা করে উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় বৌদ্ধদর্শন ও পরমার্থ সত্য। যথা : ক্ষক্ষ, আয়তন, ধাতু, চৃতি, প্রতিসংক্ষি, বল, নির্বাণ ও প্রজ্ঞাপ্তি ইত্যাদি। অভিধর্ম পিটকে বৌদ্ধ মননশীলতার চরম বিকাশ ঘটে। অভিধর্ম বিষয়ে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ব্যুত্তীত কেউ উন্নত ধর্ম দেশনা করতে পারে না। এতে কাঞ্চনিক কোনো বিষয়ের অবতারণা নেই। কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের সাহায্যে মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। বুদ্ধের মনন্ততাত্ত্বিক উপদেশই অভিধর্মের মূল বিষয়বস্তু। বিশেষত চিন্ত, চেতনিক, রূপ এবং নির্বাণ প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অভিধর্ম পিটকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই অভিধর্মকে উচ্চতর ধর্মও বলা হয়।

অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. ধর্মসঙ্গনি ২. বিভঙ্গ ৩. ধাতুকথা ৪. পুঁজলপঞ্চাশ্রমণি ৫. কথাবস্থু ৬. যমক এবং ৭. পট্টান।

১. ধর্মসঙ্গনি : অভিধর্ম পিটকের প্রথম গ্রন্থ হলো ধর্মসঙ্গনি। ‘ধর্মসঙ্গনি’-এর অর্থ ধর্মের সংগননা বা ধর্মের শ্রেণিবিভাগ অথবা ধর্মের ব্যাখ্যা। ধর্ম অর্থাৎ লৌকিক ও লোকাত্মক বিষয়সমূহ শ্রেণিবিভাগ করে ব্যাখ্যা করায় গ্রন্থটির একান্প নামকরণ করা হয়। ধর্মসঙ্গনিকে অভিধর্ম পিটকের মূলস্তুপ বলা হয়। এতে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের ছোট-বড়

যাবতীয় ব্যাপারসমূহকে চিন্ত, চৈতসিক ও জড় পদার্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। নাম-রূপকে কার্যকারণীতি অনুসারে কুশল-অকুশল এবং অব্যাকৃত ধর্ম হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করে এ-গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। ধর্মসঙ্গগির আলোচ্য বিষয়সমূহকে চার ভাগে ভাগ করে বিশ্লেষণ করা যায়। এগুলো হলো যথাক্রমে—

- ক. চিন্ত ও চৈতসিকের পরিচয়
- খ. রূপ বা জড় পদার্থের পরিচয়
- গ. পূর্বে উল্লিখিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ বা নিক্ষেপ
- ঘ. অঞ্চুদার বা অব্যাকৃত ধর্ম

চিন্ত চৈতসিকে কামাবচার, রূপাবচার, অরূপাবচার এবং লোকেন্ত্র - এই চার প্রকার চিন্ত পঞ্চকঙ্ক, জীবিতেন্দ্রিয় প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রূপ পরিচয় বিভাগে কামলোক তথা নরক, মনুষ্য ও দেবলোক প্রভৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিক্ষেপ শব্দের অর্থ হচ্ছে সারমর্ম বা সারসংঘর্ষ। এ-বিভাগে চিন্ত ও চৈতসিক সম্পর্কে পূর্ববর্তি বিভাগে যেসব আলোচনা আছে তার সারমর্ম রয়েছে। অঞ্চুদার শব্দের অর্থ হলো বিশ্লেষণ। অর্থ উদ্ধার বা সত্য উদ্ঘাটনের জন্য বিশ্লেষণ হলো অঞ্চুদার। এ-বিভাগে কুশল-অকুশল বিষয়ের কারণ উদ্ধার করা হয়েছে। এ ছাড়া অব্যাকৃত বিষয় সম্পর্কেও বর্ণনা পাওয়া যায়।

২. বিভঙ্গ : অভিধর্ম পিটকের দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম ‘বিভঙ্গ’। বিভঙ্গ শব্দের অর্থ বিশদ ব্যাখ্যা। এতে ধর্মসঙ্গগি বিষয়সমূহের উচ্চতর বা বিশদ ব্যাখ্যা লক্ষ করা যায়। গ্রন্থটিতে আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে। অধ্যায়গুলোতে পঞ্চকঙ্ক, দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু, চার আর্যসত্য, দ্বাবিংশতি ইন্দ্রিয়, প্রতীত্যসমৃৎপাদ, চার স্মৃতি প্রস্থান, চার সম্যক প্রধান, চার খন্দিপাদ, সপ্তবোধ্যঙ্গ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ধ্যান, চার অপ্রমেয়, শিক্ষাপদ, চারি প্রতিসম্মিলিত, জ্ঞান-বিভঙ্গ, ক্ষুদ্রবস্তু বিভঙ্গ (চিন্তের অকুশল অবস্থার দীর্ঘ তালিকা) প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

৩. ধাতুকথা : অভিধর্ম পিটকের তৃতীয় গ্রন্থ। ধাতুকথা শব্দের অর্থ ‘ধাতু’ সম্পর্কিত আলোচনা। চিন্ত ও চৈতসিকের আলোচনায় ভরপুর গ্রন্থটি। এ-গ্রন্থের প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো : পঞ্চকঙ্ক (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংক্ষার ও বিজ্ঞান), দ্বাদশ আয়তন (চক্ষু, শ্রোত্র, আণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, মন এবং ধর্ম), আঠারো প্রকার ধাতু (চক্ষু, শ্রোত্র, আণ, জিহ্বা, কায়, রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ, চক্ষুবিজ্ঞান, শ্রোত্রবিজ্ঞান, আণবিজ্ঞান, জিহ্বাবিজ্ঞান, কায়বিজ্ঞান, মন, মনোবিজ্ঞান, ধর্ম), চার প্রকার ধ্যান (প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান এবং চতুর্থ ধ্যান), পঞ্চবল (শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা), অষ্টাঙ্গিক মার্গ (সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি) প্রভৃতি।

৪. পুঁঁঁলপঞ্চঞ্চতি : ‘পুঁঁঁল’ শব্দের অর্থ পুরুষ, সত্ত্ব বা আত্মা। ‘পঞ্চঞ্চতি’ অর্থ প্রজন্মতি, ধারণা, পরিচয় অথবা যথার্থ বলে নির্দেশ করা ইত্যাদি বোায়। সুতরাং ‘পুঁঁঁলপঞ্চঞ্চতি’ শব্দের অর্থ যে-পুস্তক পুঁঁঁল বা ব্যক্তিবিশেষের পরিচয় প্রদান করে। গ্রন্থটি দশটি অধ্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের পুঁঁঁল বা ব্যক্তির বর্ণনা আছে। পুঁঁঁল বা ব্যক্তিবিশেষের স্বরূপ ও বিকাশ দেখানোর জন্য পুঁঁঁলকে নানাভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : সম্যক সমুদ্ধি, প্রত্যেক বুদ্ধ, আর্যপুঁঁল ও তাদের শ্রেণিবিন্যাস, শ্রোতাপন্ন, সকৃদাগামি, অনাগামি, শৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য এবং পৃথকজন লোভচরিত, দেবচরিত এবং মোহচরিত ইত্যাদি। গ্রন্থটিতে প্রথমে ছয়টি প্রজন্মতি কী কী উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর, একবিধ পুঁঁঁল, দ্বিবিধ পুঁঁঁল, ত্রিবিধ পুঁঁঁল, চতুর্বিধ পুঁঁঁল, পঞ্চবিধ পুঁঁঁল, ষড়বিধ পুঁঁঁল, সপ্তবিধ পুঁঁঁল, অষ্টবিধ পুঁঁঁল, নববিধ পুঁঁঁল এবং দশবিধ পুঁঁঁল-এর ব্যাখ্যা রয়েছে। গ্রন্থটির ভাষাশৈলী ও বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা অভিধর্ম পিটকের অন্যান্য গ্রন্থ থেকে ভিন্ন।

৫. কথাবর্থু : অভিধর্ম পিটকের মধ্যে অন্যতম মূল্যবান গ্রন্থ হলো ‘কথাবর্থু’। ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর মধ্যে একমাত্র কথাবর্থু গ্রন্থের সংকলকের নাম পাওয়া যায়। সন্ত্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অবসানে মোগলিপুত্র তিয় স্থবির গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে তেইশটি অধ্যায় আছে। গ্রন্থটির প্রত্যেক অধ্যায়ে আট থেকে বারোটি করে থ্রেশোন্টর মালা রয়েছে। এই থ্রেশোন্টর পর্বে প্রাচীন ভারতের জীবনযাত্রা তথা সে-সময়ের মানুষের মন ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মহামতি সন্ত্রাট অশোকের সময় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সঙ্গীতির সময় মোগলিপুত্র তিয় স্থবির গ্রন্থটি সংকলন করেন। এটাকে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন-সম্পর্কিত তর্কশাস্ত্র বলা হয়। এ-গ্রন্থে বিভিন্ন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের উত্তর-প্রত্যুষের রয়েছে। অভিধর্মের কঠিন এবং দুর্বোধ্য দার্শনিক বিষয়গুলোকে এ-গ্রন্থে যুক্তি তর্কে সহজভাবে উপস্থাপন করা। গ্রন্থটিতে বুদ্ধবাণী উদ্ভৃতির মাধ্যমে অন্যান্য দার্শনিক তত্ত্ব খণ্ডন করা হয়েছে এবং বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের নির্যাস প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রন্থটি ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৬. যমক বা যমক প্রকরণ : যুগল বা জোড়া বা যুগ্ম অর্থে ‘যমক’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ‘যমক’ বলতে একই বিষয়ে দুটি প্রশ্নের অবতারণা করাকে বোঝায়। এই প্রশ্ন দুটিতে কারণ থেকে কারণ নির্ণয় করা বা কারণ থেকে কারণের সত্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রন্থটি দশ অধ্যায়ে বিভক্ত। গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো : মূল-যমক, ক্ষক্ষ যমক, আয়তন যমক, ধাতু যমক, সত্য যমক, সংক্ষার যমক, অনুশয় যমক, চিত্ত যমক, ধর্ম যমক, ইন্দ্রিয় যমক ইত্যাদি। মূল-যমকে কুশল এবং অকুশল ও তাদের মূল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ক্ষক্ষ-যমকে পঞ্চ ক্ষফের বর্ণনা রয়েছে। ধাতু যমকে অষ্টাদশ প্রকার ধাতুর বিস্মৃত অর্থ বর্ণিত হয়েছে। সত্য যমকে চারি আর্যসত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। সংক্ষার যমকে তিন প্রকার সংক্ষারের আলোচনা দৃষ্ট হয় (কায় সংক্ষার, বাক্যৎসংক্ষার এবং মন সংক্ষার)। অনুশয় যমকে বিবিধ প্রকার অনুশয়ের দার্শনিক বিচার (কাম, রাগ, সন্দেহ, মান, অবিদ্যা ইত্যাদি) পাওয়া যায়। চিত্ত যমকে চিত্ত ও চৈতসিক সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ধর্ম যমকে কুশল এবং অকুশল ধর্মের তাৎপর্য বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইন্দ্রিয় যমকে বাইশ প্রকার ইন্দ্রিয়ের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

৭. পট্ঠান : অভিধর্ম পিটকের শেষ গ্রন্থ। ‘পট্ঠান’ শব্দের অর্থ হলো সম্বন্ধ, কারণ বা প্রধান কারণ, প্রকৃত কারণ, হেতু ইত্যাদি। গ্রন্থটিতে নাম-ক্রপের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রতীত্যসমূহগুলি নামিত আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থটিতে চারটি বিভাগ রয়েছে। যথা : অনুলোম পট্ঠান, পচলীয় পট্ঠান, অনুলোম পচলীয় পট্ঠান এবং পচলীয় অনুলোম পট্ঠান। চার বিভাগকে আবার চারিশ প্রকার প্রত্যয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। ‘প্রত্যয়’ শব্দের অর্থ হলো ‘কারণ’ ‘নিদান’ ‘হেতু’ ইত্যাদি। যার মাধ্যমে কোনো কার্য সংঘটিত হয় তা-ই প্রত্যয়। পট্ঠান গ্রন্থে বর্ণিত ২৪ প্রকার প্রত্যয়সমূহ হলো : হেতু, আরম্ভ, অধিপতি, অনস্তর, সমস্তর, সহজাত, অঞ্চলের অঞ্চল, নিস্সেয়, উপনিস্সেয়, পুরোজাত, পচাজাত, আসেবন, কম্ম, বিপাক, আহার, ইন্দ্রিয়, ধ্যান, মংস, সম্পযুক্ত, বিশ্঵যুক্ত, অথি, নথি, বিগত এবং অবিগত প্রত্যয়।

অনুশীলনীমূলক কাজ

অভিধর্ম পিটকে কয়টি গ্রন্থ ও কী কী?

ধর্মসংগ্রহ মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ কী?

কথাবর্থু গ্রন্থটিকে কেন ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হলো?

পাঠ : ৬

ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা

বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনই ত্রিপিটকের মূল উপজীব্য বিষয়। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে এ-গ্রন্থে বুদ্ধের সমকালীন সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, রাজনীতি, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কেও আলোচনা রয়েছে। তাই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস জানার জন্য ত্রিপিটকের গুরুত্ব অপরিসীম। ত্রিপিটকের প্রতিটি বাণী মানুষকে নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে উদ্বৃদ্ধ করে। অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকতে উৎসাহিত করে। সকলপ্রকার পাপ বর্জন করে ধর্মময় জীবনযাপনে প্রেরণা যোগায়। মানুষকে দুঃখহীন নৈর্বাণিক পথে পরিচালিত করে। ত্রিপিটকপাঠে কুশল-অকুশল কর্ম, চিত্তের প্রকৃত স্বরূপ, মানুষের বৈশিষ্ট্য, ঘনোজগতের নানা অবস্থা, দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখমুক্তির উপায়, অনিত্য, অনাত্মা, নির্বাণ, নির্বাণলাভের উপায়, জগতের প্রকৃত স্বরূপ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। তা ছাড়া, বুদ্ধজীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ত্রিপিটকে বর্ণিত আছে। ত্রিপিটকের অমৃতবাণীসমূহ রাগ-ব্রেষ-মোহ বিদূরিত করে মানুষে মানুষে পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সৌহার্দ্য ও ঐক্যসৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। ভারতবর্ষে জাতিভেদ ও বর্ণপ্রথার নামে যে-নির্ণয়ে প্রচলিত ছিল তা দূরীভূত করতে বুদ্ধবাণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণবৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্ফুরণ নিয়ে বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রতিটি বাণী ছোট-বড় সকল প্রাণীকে রক্ষার প্রেরণা যোগায়। সেই আদর্শকে বিকশিত করার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংজ্ঞ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞে জাতি, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল। এভাবে তিনি সমাজে এবং তাঁর অনুসারীদের মধ্যে সাম্যনীতির আদর্শ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ-নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুসরণে মানুষ বিনয়ী, শীলবান এবং চরিত্রবান হয়। ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজজীবন সুখের হয়। অতএব, বলা যায়, ত্রিপিটক পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. বুদ্ধের জীবিত অবস্থায় কেউ তাঁর ধর্মবাণী করে রাখেন নি।
২. সিংহলের রাজা বটগামিনীর রাজত্বকালে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।
৩. সূত্র পিটক প্রধানত নিকায় বা খণ্ডে বিভক্ত
৪. খুদ্দক নিকায়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রয়েছে।
৫. অভিধর্ম পিটকের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ হলো।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ত্রিপিটক-এর শব্দগত অর্থ কী?
২. সুত্র পিটকে কয়টি গ্রন্থ ও কী কী?
৩. বিনয় পিটকের শিক্ষা কী?
৪. অভিধর্ম বলতে তুমি কী বোঝা? বল।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. ত্রিপিটক রচনার পটভূমি আলোচনা কর।
২. সুস্থ পিটক সম্পর্কে একটি ধারণা প্রদান কর।
৩. বিনয় বলতে কী বোঝা? বিনয় পিটকে কয়টি গ্রন্থ? প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত ধারণা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। অতিথিম পিটকের অন্যতম প্রধান গ্রন্থের নাম কী ?

- | | | | |
|----|---------|----|--------------|
| ক. | বিভঙ্গ | খ. | ধর্মসংগ্রন্থ |
| গ. | ধাতুকথা | ঘ. | কথাবথু |

২। ভিক্ষুদের বিনয়চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে হবে -

- i. নীতিবোধ জাগ্রত
- ii. সাধনালাভ
- iii. উন্নত জীবনযাপন লাভ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i | খ. | i ও ii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ঢ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধিমত্ত্ব ভিক্ষু নতুন উপসম্পদা লাভের পর ভিক্ষুত্ব জীবনের নিয়ম, নীতি, শৃঙ্খলা জানার জন্য লাইব্রেরি থেকে একটি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। গ্রন্থটিতে বিনয়ের জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়গুলো সহজ ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

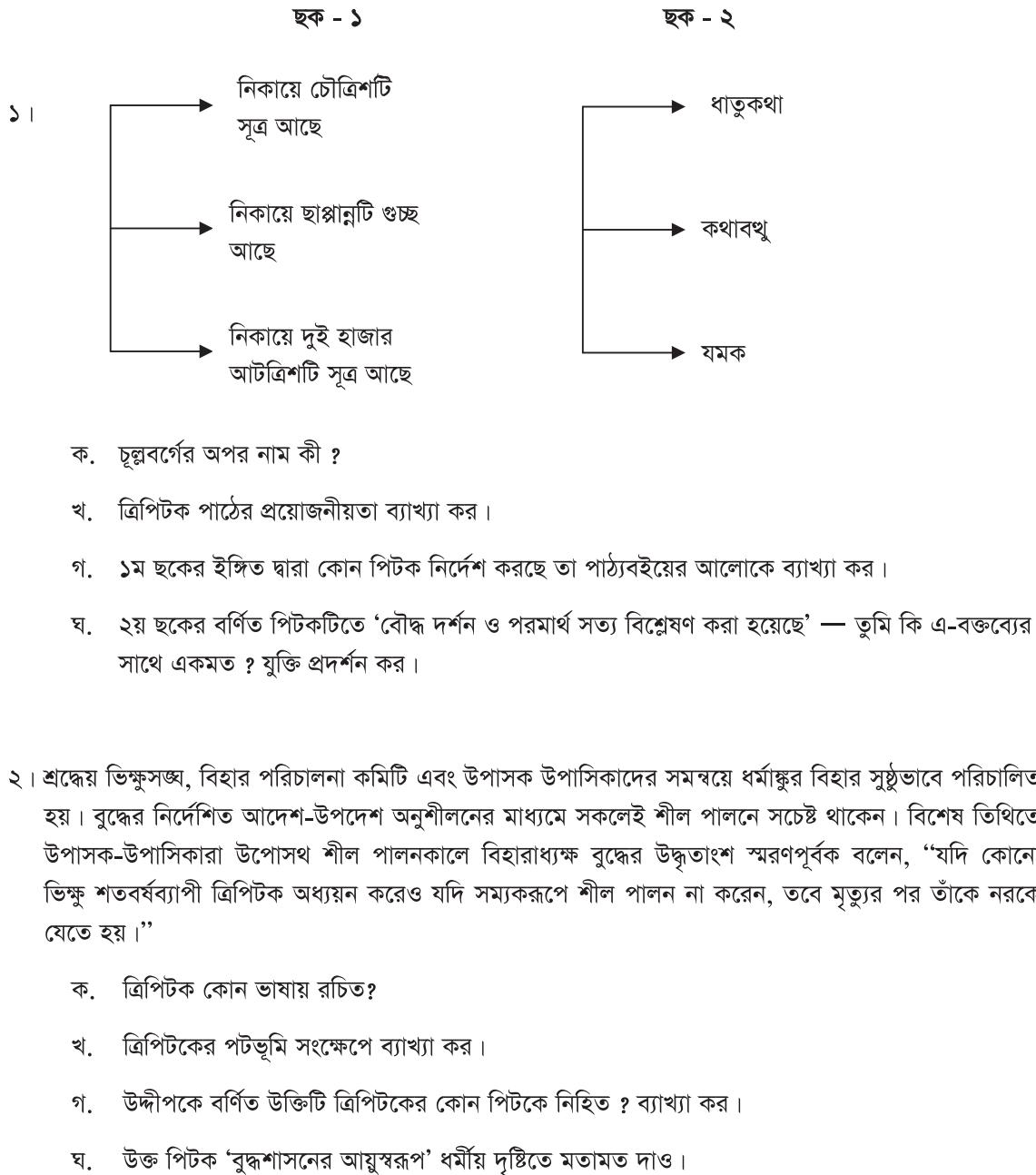
৩। শ্রদ্ধেয় বৌদ্ধিমত্ত্ব ভিক্ষু বিনয়ের কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন ?

- | | | | |
|----|-------------|----|-------------|
| ক. | সূত্রবিভঙ্গ | খ. | খন্দক |
| গ. | মহাবর্গ | ঘ. | পরিবার পাঠো |

৪। উক্ত গ্রন্থটিকে বিনয় পিটকের কী বলা হয় ?

- | | | | |
|----|-------------------|----|---------------|
| ক. | সারবন্ধ | খ. | সারসংগ্রহ |
| গ. | পরিশুল্ক জীবনবিধি | ঘ. | অন্যতম গ্রন্থ |

সূজনশীল প্রশ্ন :



চতুর্থ অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

সূত্র ও নীতিগাথা হলো ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে বুদ্ধ তাঁর শিষ্য ও উপাসক-উপাসিকাদের এগুলো দেশনা করেছিলেন। এগুলো ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের বিভিন্ন প্রচ্ছে পাওয়া যায়। সূত্র ও নীতিগাথাসমূহ বুদ্ধের শিক্ষা বা দর্শনের মর্মবাণী ধারণ করে আছে। এগুলো নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের পাশাপাশি ইহলৌকিক মঙ্গলও সাধন করে। এগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়। সাধারণত বিভিন্ন রকম প্রাকৃতিক দুর্ঘোগ, দুর্ঘটনা, বিপদ, রোগ, শোক এবং ভূত, প্রেত, যক্ষ জাতীয় অঙ্গত শক্তির কুপভাব প্রভৃতি হতে সুরক্ষা এবং সর্বপ্রকার মঙ্গল কামনা করে পাঠ করা হয়। তবে একেক সূত্র একেক রকম উদ্দেশ্যে পাঠ করা হয়। যেমন, রতন সূত্র দুর্ভিক্ষ ও মহামারি হতে রক্ষা পেতে করণীয় মৈত্রী সূত্র ভূত, যক্ষ প্রভৃতির উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে সু-পুরণহ সূত্র অঙ্গত গ্রহের প্রভাব হতে রক্ষা পেতে ভোজ্ঞস সূত্র সকল প্রকার রোগ-শোক হতে রক্ষা পেতে অঙ্গুলিমাল সূত্র গর্ভযন্ত্রণা হতে মুক্তি পেতে পাঠ করা হয়। ত্রিপিটকে এরপ আরও অনেক সূত্র আছে যেগুলো পাঠ করলে নানারকম বিপদ হতে রক্ষা পাওয়া যায় এবং বহুরকম মঙ্গল সাধিত হয়। এ-অধ্যায়ে আমরা রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্র অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা

* রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব ;

* রতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারব।



উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ বৌদ্ধভিক্ষুর নিকট সূত্র পাঠ শুনছেন

পাঠ : ১

রতন সূত্রের পটভূমি

বৈশালী ভারতের লিচ্ছবিদের গণরাজ্য ছিল। এটি বর্তমানে বেসার নামে পরিচিত। তথাগত বুদ্ধের সময় বৈশালী অত্যন্ত সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সেখানে রাজা, যুবরাজ, শ্রেষ্ঠ, সেনাপতি, কৃষক, বণিক প্রভৃতি নানা শ্রেণি ও জাতের লোক বসবাস করত। নানাপ্রকার খাদ্য সম্ভারে বৈশালী পরিপূর্ণ ছিল। অধিবাসীগণ পরম সুখে বসবাস করছিল।

একসময় বৈশালী নগরীতে প্রচণ্ড অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মাঠ-ঘাট-ক্ষেত সব শুকিয়ে যায়। চাষবাস ও শস্য উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নগরীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অনাহারে প্রচুর লোক মৃত্যুবরণ করল। শবদেহ নগরের বাইরে নিষ্কিঞ্চ করা হলো। পচাগঙ্কে অনেক অমনুযোগ-পিশাচদি নগরে প্রবেশ করল। অমনুযোগের উপদ্রবে আরও অনেক লোক মারা গেল। বায়ু দূষণের কারণে শুরু হয় মহামারি। এতেও প্রচুর মানুষ ও জীবজন্মের প্রাণহানি ঘটতে লাগল।

অবশেষে বৈশালীবাসী দুর্ভিক্ষ, অমনুযোগ ও মহামারি – এ তিনি উপদ্রবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাজার কাছে গিয়ে নিবেদন করল, “মহারাজ ! নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হয়েছে। পূর্বের সশ্র রাজবংশের রাজত্বকালে এরপ দুর্দশার কথনো উৎপন্ন হয়েনি।” রাজার অধার্মিকতার কারণে এই দুর্দশা সৃষ্টি হয়েছে কি না তা জানার জন্য রাজজ্যোতিষীকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। জ্যোতিষী গণনা করে দেখলেন, এতে রাজার কোনো দোষ নেই। তারপর কীভাবে দুর্দশা দূর করা যায় তা নিয়ে সকলে চিন্তা করতে লাগলেন। চিন্তা করে সকলে স্ত্রী করলেন যে, একমাত্র সর্বলোকহিতানুকম্পণী, মহাখন্দি ও মহানুভবসম্পন্ন ভগবান বুদ্ধের আগমনেই এ-দুর্দশা দূর হবে। অতঃপর প্রজাদের মঙ্গলের কথা ভেবে রাজা ঠিক করলেন, ভগবান বুদ্ধকে বৈশালীতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসবেন। রাজা ভাবলেন, বুদ্ধ এলে বৈশালীর মানুষদের দুর্দশা কেটে যাবে, প্রাণ রক্ষা পাবে, মনোবল ফিরে পাবে এবং সমস্ত ভয় ও অঙ্গজল কেটে যাবে।

বুদ্ধ সেসময় রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। বৈশালীর রাজা তখন ভগবান বুদ্ধকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। দুইজন লিচ্ছবি কুমার সৈন্যবাহিনী ও উপটোকনসহ বুদ্ধকে আনতে যাত্রা করলেন। লিচ্ছবি কুমারগণ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক জানালেন, “ভন্তে ! আমাদের নগরে ত্রিবিধ ভয় উৎপন্ন হয়েছে। যদি করুণার আধার ভগবান করুণাবশত বৈশালীতে একবার পদার্পণ করেন, তা হলে আমাদের অশেষ কল্যাণ সাধিত হবে।” বৈশালীবাসীর প্রতি অনুকম্পাবশত ভগবান বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এবং বৈশালীতে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। বৈশালীবাসীসহ রাজা ও রাজসমাজের পূজা ও সৎকার করতে করতে ভগবান বুদ্ধকে স্বরাজ্যে নিয়ে যান। ভগবান বুদ্ধ বৈশালী পৌছলে দেবরাজ ইন্দ্র দেবতাগরিবেষ্টিত হয়ে ভগবানকে অভ্যর্থনা করতে আসলেন। দেবগণের আগমনে অমনুযোগণ পালিয়ে গেল।

অতঃপর ভগবান বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে ডেকে বললেন, “আনন্দ, এই রতন সূত্র শিখে লিচ্ছবিদের নিয়ে বৈশালী নগর ঘুরে ঘুরে আবৃত্তি কর। এই সূত্রের প্রভাবে বৈশালীর দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও ভয় দূর হয়ে যাবে।” বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির রতন সূত্র আবৃত্তি শুরু করলেন এবং বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্রে জল নিয়ে সিঞ্চন করতে লাগলেন। সর্বার্থসাধক রতনসূত্র পাঠে রোগভয়, অমনুযোগ ভয় এবং দুর্ভিক্ষভয় – এই ত্রিবিধ ভয় দূর হয়ে যায়। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। আবার মাঠে মাঠে শস্যের সমারোহ ঘটে। বৈশালীবাসীর জীবনে শান্তি ফিরে এল। নগরের মানুষ আনন্দে উৎফুল্ল। সবাই ভগবান বুদ্ধের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবাই করজোড়ে বুদ্ধের সম্মুখে এসে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। এ হলো রতন সূত্রের পটভূমি। সূত্রাটি সুত্রপিটকের অন্তর্গত খুদকনিকায়ের খুদক পাঠ গ্রন্থে পাওয়া যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৈশালী কেমন নগরী ছিল?

বৈশালীতে কয় প্রকার উপদ্রব দেখা দিয়েছিল? কী কী?

ভগবান বুদ্ধের নির্দেশে আনন্দ স্থবির কী করলেন?

পাঠ : ২
রতন সুন্ত (পাণি)

- ১। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূস্মানি বা যানি বা অন্ত লিকখে
সবেব ভূতা সুমনা ভবত্তু
অথোপি সকচ সুগন্ধি ভাসিতৎ ।
- ২। তস্মাহি ভূতা নিসামেথ সবেব
মেন্তৎ করোথ মানুসিয়া, পজায
দিবা চ রত্তো চ হরন্তি যে বলিঃ
তস্মাহি নে রক্খথ অপ্রমতা ।
- ৩। যৎ কিঞ্চিৎ বিন্দৎ ইধ বা হুরৎ বা
সংগেসু বা যৎ রতনৎ পণীতৎ,
ন নো সমৎ অথি তথাগতেন
ইদম্পি বুদ্ধে রতনৎ পনীতৎ
এতেন সচেন সুবর্থি হোতু ।
- ৪। খৎৎ বিরাগৎ অমতৎ পণীতৎ
যদজ্বাগা সক্যমুনী সমাহিতো,
ন তেন ধমেন সমথি কিঞ্চিৎ
ইদম্পি ধম্যে রতনৎ পণীতৎ
এতেন সচেন সুবর্থি হোতু ।
- ৫। যমুন্দসেট্টো পরিবণ্যী সুচিঃ
সমাধিমানন্ত রিকঞ্জ এওয়াহু,
সমাধিনা তেন সমো ন বিজ্ঞতি ।
ইদম্পি ধম্যে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবর্থি হোতু ।
- ৬। যে পুঁগলা অট্টসতস্পসথা
চতুরি এতানি যুগানি হোন্তি ,
তে দক্খিনেয়া সুগতস্স সাবকা
এতেসু দিন্নানি মহপ্রফলানি
ইদম্পি সজ্জে রতনৎ পণীতৎ
এতেন সচেন সুবর্থি হোতু ।
- ৭। যে সুপ্লয়ুতা মনসা দল্হেন,
নিঙ্কামিনো গোতমসাসনম্হি
তে পশ্চিপন্তা অমতৎ বিগয়হ
লদ্বা মুধা নিবুতিং ভুঁঝমানা ।
ইদম্পি সজ্জে রতনৎ পণীতৎ
এতেন সচেন সুবর্থি হোতু ।
- ৮। যথিন্দখালো পঠবিং সিতো সিয়া
চতুরভি বাতেভি অসম্পকম্পযো,
তথুপমৎ সঞ্চারিসৎ বদামি
যো অরিয়সচানি অবেচ পস্সতি ।
ইদম্পি সজ্জে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবর্থি হোতু ।
- ৯। যে অরিয়সচ চানি বিভাবযন্তি
গল্পীরপঞ্চেন সুদেসিতানি
কিঞ্চাপি তে হোন্তি ভুসঞ্চমতা
ন তে ভবৎ অট্টমৎ আদিযন্তি ।
ইদম্পি সজ্জে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবর্থি হোতু ।
- ১০। সহা 'বস্স দস্সনসম্পদায
ত্যস্সন্সু ধম্মা জহিতা ভবন্তি ,
সক্তায়দিত্তং বিচিকিচ্ছত্পঃ ।
সীলববতৎ বাপি যদথি কিঞ্চিৎ
চতুহ'পায়েহি চ বিপ্লবুন্তো
ছচাভিঠানানি অভবো কাতুৎ,
ইদম্পি সজ্জে রতনৎ পণীতৎ,
এতেন সচেন সুবর্থি হোতু ।
- ১১। কিঞ্চাপি সো কমৎ করোতি পাপকৎ
কায়েন বাচা উদ চেতসা বা,
অভবো সো তস্স পটিচ্ছাদায
অভবতা দিট্টপদস্স বুতা
ইদম্পি সজ্জে রতনৎ পণীতৎ
এতেন সচেন সুবর্থি হোতু ।

- ১২। বনশঙ্গুম্বে যথা ফুস্সিতঞ্জে
গিম্হানমাসে পঠমস্মিৎ গিম্হে
তথুপং ধম্মবরং অদেসযী
নিবানগামিং পরমং হিতায় ।
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং,
এতেন সচেন সুবিধি হোতু ।
- ১৩। বরো বরঞ্চে বরদো বরাহরো
অনুভরো ধম্মবরং অদেসযী
ইদম্পি বুদ্ধে রতনং পণীতং
এতেন সচেন সুবিধি হোতু ।
- ১৪। থীণং পুরাণং নবং নথি সম্ভবং
বিরান্তিতা আযতিকে ভবস্মিৎ,
তে থীনবীজা অবিবৃল্লহিচন্দা
নিবন্তি থীরা যথাযং পদীপো
ইদম্পি সজ্জে রতনং পণীতং,
এতেন সচেন সুবিধি হোতু ।

- ১৫। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্পানি বা যানি বা অন্ত লিকখে
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
বুদ্ধং নমস্সাম সুবিধি হোতু ।
- ১৬। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্পানি বা যানি বা অন্ত লিকখে
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
ধম্মং নমস্সাম সুবিধি হোতু ।
- ১৭। যানীধ ভূতানি সমাগতানি
ভূম্পানি বা যানি বা অন্ত লিকখে
তথাগতং দেবমনুস্সপূজিতং
সজ্জং নমস্সাম সুবিধি হোতু ।

অনুশীলনমূলক কাজ

দলগতভাবে শুন্ধ উচ্চারণে রতন সূত্র পাঠ কর

পাঠ : ৩
রতন সূত্র (বাংলা)

১. ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যেসব প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছে, সকলে আনন্দিত হও । তারপর আমার বাক্য শ্রবণ কর ।
২. হে ভূতগণ ! সেইহেতু আমার উপদেশ তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর । মানুষের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে তাদের হিত চিন্তা কর । তারা দিনরাত তোমাদের পূজা করে । এ কারণে অপ্রমতভাবে তাদের রক্ষা কর ।
৩. ইহলোক বা পরলোকে যা কিছু বিন্দ (রত্ন) আছে, অথবা স্বর্গলোকে যা কিছু উত্তম রত্ন আছে, তাদের কোনোটিই তথাগতের সমান নয় । এ সকল রত্ন হতে বুদ্ধ রত্ন শ্রেষ্ঠ । এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক ।
৪. ধ্যানপরায়ণ শাক্যমুনি যে লোভ, দ্বেষ ও মোহ ক্ষয়কর, বিরাগ ও উত্তম অমৃত (নির্বাণ) ধর্ম অবগত হয়েছেন, সেই ধর্মের সমান কিছুই নেই । সকল রত্ন হতে এ ধর্মরত্ন শ্রেষ্ঠ । এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক ।

৫. বুদ্ধশ্রেষ্ঠ যে শুটি (পবিত্র) সমাধির প্রশংসা করেছেন, যার ফল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায় তার সমান অন্য কোনো সমাধি নেই। সকল রাত্ত হতে ধর্মরত্ন (বুদ্ধ-প্রশংসিত সমাধি) শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
৬. যে আট পুদ্গল (পুরুষ) বুদ্ধাদি সাধুগণ কর্তৃক প্রশংসিত, যাঁরা মার্গ ও ফল ভেদে চার জোড়, তাঁরা সুগতের শ্রাবক এবং দক্ষিণার উপযুক্ত পাত্র। সকল রাত্ত হতে এই সজ্ঞরত্ন (ভিক্ষুসম্মিলিত) শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
৭. যাঁরা নিষ্কাশ এবং গৌতমের শাসনে (ধর্মে) স্থিরচিত্তে নিবিষ্ট, তাঁরা অম্বতে ডুব দিয়ে বিনামূল্যে লক্ষ নির্বাণ ভোগ করেছেন এবং প্রাপ্তব্য প্রাপ্ত (যা লাভ করতে হয় তা লাভী) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। সকল রাত্ত হতে এই সজ্ঞরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
৮. ভূমিতে দৃঢ়রূপে প্রোথিত ইন্দ্ৰীয়ীল (শুষ্ঠ) চারদিকের প্রবল বায়ুতেও কাঁপে না। যিনি চতুরার্থ সত্য সম্যকরূপে দর্শন করেছেন সেই সৎ পুরুষকেও আমি ইন্দ্ৰীয়ীলের সঙ্গে তুলনা করি। সকল রাত্ত হতে এই সজ্ঞরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
৯. গভীর প্রজ্ঞাবান (বুদ্ধ) কর্তৃক সুন্দরভাবে দেশিত চতুরার্থ সত্য যাঁরা (নিজে উত্তোলনে অবগত হয়ে) বিস্তারভাবে প্রকাশ করেন, তাঁরা অত্যন্ত প্রমত্ত হলেও আটবারের বেশিভাবে জন্মগ্রহণ করেন না। সকল রাত্ত হতে এই সজ্ঞরত্ন (যিনি চতুরার্থ সম্যকভাবে জ্ঞাত ও প্রকাশ করেন) শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১০. স্ন্যাতাপন্ন ব্যক্তির দর্শন সম্পদ (সম্যক দৃষ্টি) লাভের সঙ্গে যা কিছু সৎকায় দৃষ্টি, সন্দেহ ত্রিরত্নে অশৰ্দ্ধা—এই তিনি ধর্ম (আন্ত ধারণা) থাকে, তা দূরীভূত হয়। তিনি চার প্রকারের অপায় (নরক) হতে বিমুক্ত এবং ছয় প্রকার মহাপাপ (মাত্তহত্যা, পিত্তহত্যা, অর্হত্বহত্যা, বুদ্ধের রক্তপাত, বুদ্ধ ব্যতীত অন্য শরণ গ্রহণ, সজ্ঞভেদ) করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। সকল রাত্ত হতে এই সজ্ঞরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১১. তিনি (স্ন্যাতাপন্ন ব্যক্তি) কায়, বাক্য ও মনে কোনো পাপ করে গোপন করতে পারেন না। কারণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে পাপ গোপন করা সম্ভব নয়। সকল রাত্ত হতে এই সজ্ঞরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১২. গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম মাসে (চৈত্র মাসে) বনের তরুলতায় ফুল ফুটলে বনভূমি যেমন মনোহর হয় তেমনি নির্বাণগামী উত্তমধর্ম পরম হিতের জন্য (তথাগত বুদ্ধ) দেশনা করেছেন। সকল রাত্ত হতে এই বুদ্ধরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ-সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১৩. শ্রেষ্ঠ (বর), নির্বাণজ্ঞ (বরাজ্ঞ), বিমুক্তি সুখদাতা (বরদ), উত্তম প্রতিপদ আহরণকারী (বরাহরো), অনুত্তর (বুদ্ধ) উত্তম বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম দেশনা করেছেন। সকল রাত্ত হতে এই বুদ্ধরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১৪. (যাঁরা নির্বাণপ্রাপ্ত হয়েছেন তাঁদের) পুরাতন কর্ম ক্ষীণ, নতুন কর্ম উৎপত্তি সম্ভাবনা নেই, পুনর্জন্মে আসক্তিহীন, (পুনর্জন্মের) বীজ ক্ষীণ (নষ্ট), বৃদ্ধির ইচ্ছা নেই সেই সকল পঞ্চিত ব্যক্তি প্রদীপের মতো নির্বাণপ্রাপ্ত হন। সকল রাত্ত হতে এই সজ্ঞরত্ন শ্রেষ্ঠ। এ সত্য বাক্য দ্বারা শুভ (মঙ্গল) হোক।
১৫. (তারপর দেবরাজ ইন্দ্ৰ বললেন) ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সমস্ত প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছে, এসো সকলে মিলে দেবমানব পূজিত তথাগত বুদ্ধকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ (মঙ্গল) হোক।

১৬. ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সমস্ত প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছে, এসো সকলে মিলে দেবমানব পৃজিত ধর্মকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ (মঙ্গল) হোক।
১৭. ভূমিবাসী ও আকাশবাসী যে সমস্ত প্রাণী এখানে সমবেত হয়েছে, এসো সকলে মিলে দেবমানব পৃজিত সংঘকে নমস্কার করি। এই নমস্কারের প্রভাবে সকলের শুভ (মঙ্গল) হোক।

শব্দার্থ

সমাগতানি-সমবেত; ভূম্পানি-ভূমিবাসী; অন্ত লিক্খে-আকাশে; সুমনা-সুখী, সক্রচৎ-মনোনিবেশসহকারে; নিসামেথ-শুনুন; মানুসিয়া পজায়- মানবগণের জন্য; হুরৎ-পরলোক; অমতৎ-অমৃত; পরিবপ্নয়ী-বর্ণনা করা হয়েছে; সমাধি মানস্ত রিক্তঞ্চমাহু-যে সমাধির ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়; পসথা-প্রশংসা; দক্ষিণেয়া-দক্ষিণার যোগ্য; সুপ্লয়ত্বা-উত্তমরূপে কাজে নিযুক্ত; দল্হন-দৃঢ়ভাবে; নিকামিনো-নিকাম; পতিপত্তা-সর্বশ্রেষ্ঠ পাওনা; যথিন্দুবীলো-যেরূপ ইন্দ্ৰিয়ীল বা স্তুত, অরিয়সচানি-আর্যসত্যসমূহ; ভূসপ্তমত্বা-পৃথিবীতে সপ্তমন্ত থাকা (প্রমাদবহুল); আদিযন্তি-অধিক জন্মগ্রহণ করেন না; দস্সনসম্পদায়-অন্ত দৃষ্টি বা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন ; বিচিকিত্তক্ষণ-সংশয়; বিঙ্গমুত্তো-বিমুক্ত; দিট্টপদস্মস-সত্যদৃষ্টি সম্পন্ন; বরঞ্চে-নির্বাণজ্ঞ; বরদো-বিমুক্তি সুখদাতা; বরাহরো-উত্তম প্রতিপদ আহরণকারী বা নির্বাণরূপ শ্রেষ্ঠ মার্গ আহরণ করেছেন যিনি।

পাঠ : ৪

করণীয় মৈত্রী সুন্দের পটভূমি

একদা ভগবান বুদ্ধ শ্রাবণ্তীতে বাস করছিলেন। তখন বর্ষা সমাগত। বর্ষাবাসের জন্য ভিক্ষুরা পর্বতের গুহা বা বনের মধ্যে সুবিধামতো কোনো স্থান বসবাসের জন্য বেছে নিতেন। হিমালয় পর্বতের পাশে বনের মধ্যে সেরাপ স্থান ঠিক করে পাঁচশত ভিক্ষু বর্ষাবাস শুরু করলেন। কাছাকাছি থাম থেকে তাঁরা ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ও ভোজন করে পরম সুখে কর্মস্থান তাবনা করতেন। নির্মল জলবায়ু সেবন এবং সুখাদ্যে তাঁদের শরীর-মন বেশ ভালো হলো।

সেই বনের মধ্যে ছিল বহু বৃক্ষদেবতা। তারা ভিক্ষুদের ধর্মজীবন ও শীলতেজের প্রভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। শীলের তেজ সহ্য করতে না পেরে বৃক্ষদেবতারা গাছ ছেড়ে পরিবার পরিজন নিয়ে যত্নত্ব পালিয়ে বেড়াতে লাগল। তারা কেবল ভাবছিল, কবে ভিক্ষুরা এই স্থান ত্যাগ করবে। যত তাড়াতাড়ি ভিক্ষুরা এই স্থান ত্যাগ করবে তত তাড়াতাড়ি তাঁরা আবার তাঁদের নিজের আবাসে ফিরে যেতে পারবে। কিন্তু বৃক্ষদেবতারা দেখল, ভিক্ষুরা বর্ষাবাস শেষ না করে স্থান ত্যাগ করবে না।

একদিন ভিক্ষুদের বিভাড়িত করার উদ্দেশ্যে বৃক্ষদেবতারা এক রাতে ভয়ংকর আকৃতির মূর্তি ধারণপূর্বক ভিক্ষুদের সামনে ভীষণ চিত্কার করে ভয় দেখাতে লাগল। এতে ভিক্ষুরা খুব ভয় পেলেন। ফলে তাঁরা ধ্যান-সমাধিতে চিন্ত নির্বিট করতে পারলেন না। ক্রমে তাঁরা অত্যন্ত কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়লেন। তারপর বৃক্ষদেবতাগণ ভয়ানক দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল। এতে ভিক্ষুদের ভয়ানক শিরঃপীড়া উৎপন্ন হলো। একদিন তাঁরা পরম্পর আলোচনা করে বর্ষবাসব্রত ত্যাগ করে শ্রাবণ্তীতে ভগবান বুদ্ধের কাছে চলে এলেন। ভিক্ষুদের দেখে বুদ্ধ তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি বর্ষাবাসের সময় ভ্রমণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন ভিক্ষুরা বুদ্ধের কাছে বর্ষাবাসের স্থান ছেড়ে আসার সব ঘটনা খুলে বললেন।

সব শুনে বুদ্ধ বললেন, “ভিক্ষুগণ, তোমরা আবার সে-স্থানে ফিরে যাও। আমি তোমাদের বৃক্ষদেবতাদের ভয় থেকে পরিআগের উপায় বলে দিচ্ছি। বৃক্ষদেবতা বা যক্ষদের সাথে শত্রুভাব পোষণ না করে মৈত্রীভাব পোষণ কর। তোমরা ধৈর্য ধরে তাদের প্রতি মৈত্রী ও করণা প্রদর্শন কর।” এই বলে বুদ্ধ তাঁদের করণীয় মৈত্রী সূত্র দেশনা করলেন এবং বললেন, “এই সূত্র শিক্ষা করে বনে ফিরে যাও। প্রতিমাসে অষ্টধর্ম শ্রবণ দিবসে (আটটি উপোসথ দিবসে) এই সূত্র উচ্চস্বরে পাঠ করবে। এ বিষয়ে ধর্মকথা বলবে, প্রশ্নোত্তর করবে, অনুমোদন করবে। সেই অমনুষ্যগণ আর ভয় দেখাবে না। তোমাদের উপকারী ও হিতৈষী হবে।”

বুদ্ধের উপদেশমতো ভিক্ষুরা সেই স্থানে ফিরে গিয়ে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ ও মৈত্রী-ভাবনায় রত হলেন। করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠের প্রভাবে বৃক্ষদেবতাদের উপদ্রব বন্ধ হলো। মৈত্রী ও করণার প্রভাবে বৃক্ষদেবতারা আর ভিক্ষুদের কোনো উৎপাত করল না, অধিকম্ভ অত্যন্ত সম্প্রস্তুত তাঁদের সেবায় রত হলো। অবশেষে ভিক্ষুরা সেখানে বর্ষাবাস শেষ করতে সক্ষম হন। এই সূত্রে নির্বাগলাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের করণীয় মৈত্রী-ভাবনার নির্দেশনা আছে, তাই সূত্রটির নাম ‘করণীয় মৈত্রী সূত্র’। পালিতে এই সূত্রের নাম ‘করণীয় মেন্দুসুত্রং’।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৃক্ষ দেবতারা কেন আতঙ্কিত হয়েছিলেন?
ভিক্ষুরা কেন বর্ষাবাসব্রত ত্যাগ করেছিলেন?
ভিক্ষুদের কথা শুনে বুদ্ধ কী বলেছিলেন?

পাঠ : ৫

করণীয় মেন্দুসুত্রং (পালি)

১. করণীয়মথকুসলেন যন্তং সন্তং পদং অভিসমেচ,
সকো উজু চ সুজু চ সুবচো চস্ম মুদু অনতিমানী।
২. সন্তস্সকো চ অঞ্চিচো চ সম্মহুকবৃত্তি,
সন্তিন্দ্রিযো চ নিপকো চ অঞ্চগব্ভো কুলেসু অননুগিদো
৩. ন চ খুদং সমাচরে কিপ্তি যেন বিএওএও পরে উপবদ্যেয়ং,
সুখিনো বা খেমিনো হোষ্ট সবে সত্তা ভবত্তু সুখিতত্ত্বা
৪. যে কেচি পানাভূতথি তসা বা থাবরা বা অনবসেসা,
দীঘা বা যে মহত্তা বা মজ্জিমা বস্ককাণুকা থূলা।
৫. দিট্টা বা যেবা অদিট্টা যে চ দূরে বসন্তি অবিদূরে,
ভূতা বা সম্ববেসী বা সবে সত্তা ভবত্তু সুখিতত্ত্বা।

৬. ন পরো পরং নিকুরেথ নাতিমঞ্চেও কথচি নং কঞ্চি,
ব্যারোসনা পটিষ্ঠসঞ্চও নাঞ্চেওমঞ্চস্স দুক্খমিচ্ছেয় ।
৭. মাতা যথা নিযং পুন্তৎ আযুসা একপুন্তমনুরক্তে,
এবস্মিপ সববভূতেসু মানসং ভাবযে অপরিমাণং ।
৮. মেতুঞ্চ সববলোকস্মিৎ মানসং ভাবযে অপরিমাণং,
উজ্জং অধো চ তিরিযঞ্চ অসমাধং অবেরং অসপন্তৎ ।
৯. তিট্ঠং চরং নিসিন্নো বা সযন্নো বা যবতস্স বিগতমিক্ষো,
এতং সতিং অধিট্ঠেয় ব্রহ্মমেতং বিহারমিধমাহ ।
১০. দিট্ঠিঞ্চ অনুপগন্ম্য সীলবা দস্সনেন সম্পন্নো,
কামেসু বিনেয় গেধং নহি জাতু গব্ভসেযং পুনরেতীতি ।।

অনুশীলনমূলক কাজ

দলগতভাবে শুন্দি উচ্চারণে করণীয় মৈত্রী সূত্র পাঠ কর

পাঠ : ৬
করণীয় মৈত্রী সূত্র (বাংলা)

১. শান্তিময় নির্বাণপদ লাভে অভিলাষী, করণীয় বিষয় সম্পূর্ণরূপে জাত ব্যক্তি – সক্ষম, সরল বা খঙ্গ, খুব সরল, সুবাধ্য, কোমলস্বভাব ও অভিমানহীন হবেন ।
২. (তিনি সর্বদা যথালাভে) সন্তুষ্ট, সুখপোষ্য, অল্পে তুষ্ট, শান্তেদ্বিয়, অভিজ্ঞ, অপ্রগল্ভ বা বিনীত এবং গৃহীদের প্রতি অনাসঙ্গ হবেন ।
৩. এমন কোনো ক্ষুদ্র (নীচ) আচরণ করবেন না যাতে অন্য বিজ্ঞগণ নিন্দা করতে পারেন । সকল প্রাণী সুখী হোক, ভয়হীন বা নিরাপদ হোক, শান্তি ও সুখ উপভোগ করুক—এরূপ চিন্তা করতে হবে ।
৪. যেসব প্রাণী অস্ত্রির বা স্থির, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বাহুস্ব, ছোট বা স্তুল ।
৫. দেখা যায় বা দেখা যায় না, দূরে বা কাছে বাস করে, জন্মেছে বা জন্ম নেবে সেই সকল প্রাণীগণ সুখী হোক ।
৬. একে অপরকে বধনা কোরো না, কোথাও কাউকেও অবজ্ঞা কোরো না । হিংসা বা ক্রেত্ববশত কারো দুঃখ কামনা কোরো না ।
৭. যা যেমন একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে ।

১. সর্বলোকের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। উৎকর্ষ, নিম্নে ও বক্রভাবে (যত প্রাণী আছে তাদের প্রতি) ভেদজ্ঞান-রহিত, বৈরীহীন ও শক্রতাহীন হবে।
২. দাঁড়ানো অবস্থায়, চলমান অবস্থায়, বসা বা শোয়া অবস্থায় এবং না ঘুমানো পর্যন্ত এই স্মৃতি অধিষ্ঠান করবে। একে ব্রহ্মাবিহার বলে।
৩. শীলবান ও সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন স্নোতাপন্ন ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগপূর্বক কাম ও ভোগবাসনাকে দমন করে পুনর্বার গর্ভাশয়ে জন্মাই করেন না।

শব্দার্থ : সন্তৎ-শান্ত; সঙ্কো-সক্ষম বা সমর্থ; অভিসমোচ-সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে; উজু-খাজু বা সরল; সুজুচ-সুখাজু বা অতি সরল; সন্তুস্মসকো-সন্তুষ্ট ব্যক্তি; সুভরো-সুখপোষ্য বা সহজে প্রতিপালন বা সাহায্য করা যায়; অঞ্চলিকচো-অঙ্গকৃত্য বা অঞ্চল কর্তব্যযুক্ত; সন্তুষ্ট কর্তৃতি-যে ব্যক্তি সহজে অভাব বোধ করে না এবং অভাববোধ করলে তা সহজে পূর্ণ করে নিতে পারে, অল্পে তুষ্ট ; সত্ত্বিদ্বো-শান্তেন্দ্বিয়; নিপকো-প্রজ্ঞাবান; অঞ্চলগ্রত্তো-অপ্রগল্ভ, বিনীত, অহংকারহীন, বিবেকবান, লজ্জাশীল, শিষ্ট; অননুগিদ্বো-অনাসক্ত; উপবদ্যেয়-নিন্দা করা; খেমিনো-যিনি নিরাপত্তা বা শান্তি উপভোগ করেন; পাণ্ডুতথি-জগতের প্রাণিকুল; থাবরা-স্ত্রি, অনবসেস-সম্পূর্ণরূপে; তিরিয়ৎ-বক্রভাবে, অসরলভাবে; অসমাধি-ভেদজ্ঞানরহিত; অবেং-বৈরীহীন, অসপত্ত-শত্রুতাহীন; তিট্ট-দাঁড়ানো; বিগতমিদ্বো-না ঘুমানো পর্যন্ত; অধিষ্ঠেষ্য-অধিষ্ঠান; নিকুবেথ-বথওনা; মানসৎ ভাবসে-মৈত্রী পোষণ করবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

করণীয় মৈত্রী সূত্রের বাংলা অনুবাদ লেখ (দলগত কাজ)

পাঠ : ৬

রাতন সূত্র ও করণীয় মৈত্রী সূত্রের গুরুত্ব

মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে রাতন সূত্রের প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। রাতন সূত্রে বুদ্ধ রত্ন, ধর্ম রত্ন ও সংজ্ঞ রত্নের গুণকীর্তন করা হয়েছে। এই তিনটি রত্নকে একত্রে ত্রিরত্ন বলা হয়। ত্রিরত্নের শরণ নিলে সবরকম অকৃশল কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়। চিন্তের সংযম রক্ষা করা যায়। রাতন সূত্রে চতুরার্য সত্যের মধ্যে যে অন্তর্নির্দিত শক্তি আছে সেই শক্তির কথা বলা হয়েছে। চতুরার্য সত্যকে যিনি জানতে পারেন তিনি সংসাররূপ মহাসাগরের সমস্ত কামনা, বাসনা, লোভ, দ্বেষ, মোহ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। কামনা-বাসনা বা ত্রুষ্ণাহীন ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ীল বা প্রোথিত স্তুপের সাথে তুলনীয়। ইন্দ্রিয়ীল যেমন প্রবল বায়ুর চাপেও কখনো কম্পিত হয় না, তেমনি চতুরার্য সত্য সম্যকভাবে জ্ঞাত ব্যক্তি লোভ-ত্রুষ্ণায় কম্পিত বা আসক্ত হন না। তিনি লক্ষ্যে অবিচল থাকেন। তাই বলা যায়, রাতন সূত্র সকল প্রকার অঙ্গল ও অকৃশল কর্ম থেকে বিরত রেখে কুশলকর্ম সম্পাদনে উৎসাহী করে, স্বর্ধমের পথে পরিচালিত হতে উদ্বৃদ্ধ করে। স্বর্ধমের পথে পরিচালিত ব্যক্তি সর্ব দুঃখের অবসান করে নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।

করণীয় মৈত্রী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা হলো, প্রত্যেক জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করা। কোনো জীবকে অবহেলা না করা। কারো অঙ্গল কামনা না করা। ঘুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করা উচিত।

কারণ-মৈঠী ভাবনা চিন্তকে সমাহিত করে। কায়-মন-বাক্য সংযত করে। বৈরিতা বা শক্রতা দূর করে। ভালোবাসা জাগ্রত করে। নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে সকল জীবের প্রতি মৈঠীভাবাপন্ন হতে শিক্ষা দেয়। অস্থির বা স্থির, দীর্ঘ বা বড়, মধ্যম বা ছুট, ছোট বা স্তুল; দৃশ্য-অদৃশ্য, কাছের-দূরের, জনপ্রিয়-জনহৃৎ করেছে বা করবে-এরপ সকল আণীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে এবং সর্বদা মঙ্গলকামনা করতে উদ্বৃদ্ধ করে। বঞ্চিতা ও অবজ্ঞা করা থেকে বিরত রাখে। হিংসা পরিত্যাগ ও ক্রোধ দমন করতে সাহায্য করে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথার্থরূপে অনুসরণে প্রেরণা যোগায়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণকারী ব্যক্তি কায়-মন-বাক্যে কোনো পাপ করেন না। ফলে তাঁর দ্বারা কোনো অকুশল কর্ম সম্পাদনও সম্ভব হয় না। ফলে তিনি নিজে এবং তাঁর সঙ্গে বসবাসকারীগণ নিরপত্র বা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারেন। এভাবে মৈঠীভাবনাকারী ত্রুট্য নিরোধ করে পুনর্জন্ম রোধ করেন এবং নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। অতএব বলা যায়, স্বর্ধমের পালনে বুদ্ধদেশিত রাতন সূত্র ও করণীয় মৈঠী সূত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

রাতন সূত্রের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উপস্থাপন কর (দলীয় কাজ)
করণীয় মৈঠী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান কর :

১. একসময় বৈশালী নগরীতে প্রচণ্ড----- দেখা দেয়।
২. এতেন সচেন----- হোতু।
৩. সেই বনের মধ্যে ছিল বহু -----।
৪. ----- যথা নিয়ং পুনঃ আযুসা একপুনরুকখে
৫. মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে----- সূত্রের প্রভাব অপরিসীম।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. বৈশালীতে অনাবৃষ্টির সময় ভগবান বুদ্ধ কোথায় অবস্থান করছিলেন ?
২. ভগবান বুদ্ধ বৈশালীর সীমানায় পা রাখার সাথে সাথে কী ঘটলো ?
৩. বৃক্ষদেবতারা কেন পরিবার-পরিজন নিয়ে পালিয়ে গেল ?
৪. করণীয় মৈঠী সূত্রের নৈতিক শিক্ষা কী ?
৫. ভিক্ষুরা কীভাবে তাঁদের বর্ধাবাস শেষ করল ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. রাতন সূত্র ও করণীয় মৈঠী সূত্রের পটভূমি ব্যাখ্যা কর।
২. করণীয় মৈঠী সূত্রের বাংলা অনুবাদ লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। কোন সূত্র পাঠের মাধ্যমে অঙ্গভ গ্রহের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ?

- | | |
|--------------------|------------------------|
| ক. ভোঞ্জাঙ্গ সূত্র | খ. সু-পূর্বণ্হ সূত্র |
| গ. অঙ্গলিমাল সূত্র | ঘ. করণীয় মৈত্রী সূত্র |

২। শুমে, জাগরণে, ধ্যানে সর্বদা সকল জীবের প্রতি মৈত্রী-ভাবনা করা উচিত, কারণ এতে -

- i কায়-মন-বাক্য সংযত হয়
- ii শক্রতা দূর হয়
- iii বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ঢ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রদ্ধেয় ধর্মস্ত্রী ভিক্ষু একাগ্র চিত্তে নিবিটি হয়ে চতুর্বার্য সত্য সম্যকবৃপ্তে দর্শন করেছেন। এই সম্যক জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সৎকায়দৃষ্টি, সন্দেহ, ত্রিভবের প্রতি অগ্রদূষ এই তিনি ধরনের ভাস্তু ধারণা দূরীভূত হয়।

৩। শ্রদ্ধেয় ধর্মস্ত্রী ভিক্ষুকে কিসের সঙ্গে তুলনা করা যায় ?

- | | |
|------------|-------------|
| ক. সন্ত | খ. ধর্মরত্ন |
| গ. সংঘরত্ন | ঘ. সমাধি |

৪। উক্ত ভিক্ষুর তিনি ধরনের ভাস্তু ধারণা দূরীভূত হওয়ার ফলে, তিনি —

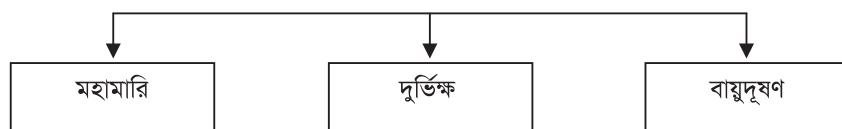
- i চার প্রকার নরক হতে মুক্তি পাবেন
- ii মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা করা থেকে বিরত হবেন
- iii বার বার জনপ্রাণ করবেন।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন :

বর্তিকা নগরীর সমস্যা



- ক. করণীয় মৈত্রী সূত্রের নেতৃত্বিক শিক্ষা কী ?
- খ. ভিক্ষুরা কেন বর্ষাবাস ত্যাগ করেছিলেন ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. ছকে বর্ণিত সমস্যাবলির সঙ্গে বুদ্ধের কোন সূত্রের ইঙ্গিত রয়েছে — ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বর্তিকা নগরীর সমস্যা সমাধানে উক্ত সূত্রের প্রভাব ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর।
- ২। পারামিতা বড়ুয়া দশম শ্রেণির মেধাবী শিক্ষার্থী। সে তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান। হঠাৎ সে গাঢ়ি দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করার পর তাদের বাড়িতে বিভিন্ন ধরনের অশুভ আভাস পরিলক্ষিত হয়।
- ক. বৈশালী বর্তমানে কী নামে পরিচিত ?
- খ. সূত্র পাঠ করার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. উল্লিখিত ঘটনার বিষয় কোন সূত্রের ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘উক্ত সূত্র পাঠ ব্যতিরেকে পরিস্থিতি নিরসন সম্ভব নয়’—আলোচনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বৌদ্ধ কর্মবাদ

কর্ম বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করে। তাই বলা হয় কর্মের শক্তি বিশ্বব্যাপী। বৌদ্ধধর্মের মূল ভিত্তিই হলো ‘কর্মবাদ’। মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারে কর্মফল ভোগ করে। ভালো কাজ করলে ভালো ফল এবং মন্দ কাজ করলে মন্দ ফল তাকে ভোগ করতে হবেই। শুধু মানুষ নয়, জীবমাত্রাই কর্মের অধীন। কর্মের জন্য তার উৎপত্তি, কর্মের মাধ্যমে তার স্থীকৃতি, কর্মই তার বস্তু, কর্মই তার আশ্রয়। কর্মের দ্বারা উন্নত জীবন যেমন লাভ হয় তেমনি কর্মের দ্বারা হীন জীবনও লাভ হয়। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

এ অধ্যায় শেষে আমরা –

- * কর্ম-এর ধারণা বলতে পারব;
- * বৌদ্ধ কর্মবাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- * কুশল এবং অকুশল কর্মের পার্থক্য তুলে ধরতে পারব;
- * চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের আলোকে বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করতে পারব।

পাঠ : ১ কর্ম শব্দের ধারণা

‘কর্ম’ বলতে কোনো অনুষ্ঠান করা, নির্মাণ করা বা সম্পাদন করা ইত্যাদি বোবায়। বৌদ্ধধর্মে কর্মকে শুভ-অশুভ, কুশল-অকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে কর্ম বলে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ যা চিন্তা করা যায়, বাক্যে উচ্চারণ করা যায় এবং দেহের দ্বারা সম্পাদন করা যায় তাই কর্ম। কায়-বাক্য ও মন এই ত্রিদ্বারে কর্ম সংঘটিত হয়। চিন্তন, কথন, এবং করণ (দৈহিক) সম্মতই কর্মের অধীন। মনের চেতনাহীন ক্রিয়াকে কর্ম বলা হয় না।। ‘অঙ্গুত্তর নিকায়’ নামক গ্রন্থে বৃক্ষ বলেছেন—

“চেতনাহৎ ভিক্খবে কম্মৎ বদামি। চেতনাকেই ইচ্ছাকে আমি কর্ম বলি। কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

বাঢ়া অনুবাদ : হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকেই (ইচ্ছাকে) আমি কর্ম বলি। কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

কর্মের উৎপত্তিস্তুল হচ্ছে মন বা চিন্ত। চেতনা মনের সহজাত প্রবৃত্তি বিশেষ। চিন্ত থেকে উৎপন্ন উপলব্ধিই চেতনা। একটি ক্ষণের একটি চেতনা সুখ-দুঃখ প্রদান করতে সক্ষম। কায় কর্ম ও বাক্য কর্ম সম্মতই মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বৌদ্ধধর্ম মতে, নিজ নিজ কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে। প্রত্যেক কর্মের ফল আছে। গাছের ফলের মতো কর্মফল মানুষের কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম যদি ভালো বা মন্দ হয় তবে ফলও ভালো বা মন্দ হবে।

কর্মের শ্রেণি বিভাগ

১. করণীয় অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যেমন : ক. জনক কর্ম, খ. উপস্থিতিক কর্ম, গ. উৎপীড়ক বা উপপীড়ক কর্ম, এবং ঘ. উপঘাতক কর্ম।

ক. জনক কর্ম : যে কর্ম পুনর্জন্ম ঘটায়, জীবিতকালে যে কর্ম ক্ষম্ব ও কর্মজনপ উৎপাদক এবং কুশল-অকুশল চেতনামূলক তাই জনক কর্ম। জনক কর্ম অতীত কর্মেরই ফল।

খ. উপস্তুক কর্ম : যে কর্ম জনক কর্মকে সাহায্য করে তাই উপস্তুক কর্ম। উপস্তুক কর্ম জনক কর্মকে ফল প্রদানে সাহায্য করে। জনক কর্মের প্রভাবে জন্ম হয় আর বেঁচে থাকা হয় উপস্তুক কর্মের প্রভাবে।

গ. উৎপীড়ক বা উপগীড়ক কর্ম : এই জাতীয় কর্ম জনক কর্ম বা উপস্তুক কর্মের বিপাককে দুর্বল করে কিংবা বাঁধা দেয়। কুশল উৎপীড়ক কর্ম অকুশল উপস্তুক কর্মকে, অকুশল উৎপীড়ক কর্ম কুশল উপস্তুক কর্মকে বাঁধা দেয় এবং দুর্বল করে।

উপঘাতক কর্ম : এ ধরনের কর্মের কাজ হলো বাঁধা দেওয়া। এ রকম কর্ম শুধু বাঁধা দেয় না জনক কর্মকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে নিজের আধিপত্য বিস্তার করে। ফল উৎপন্ন করাই হলো এর কাজ।

২. জন্মক্ষণে যে কর্ম ফল প্রদান করে তা চার প্রকার। যেমন : ক. গুরু কর্ম, খ. আসন্ন কর্ম, গ. আচরিত কর্ম এবং ঘ. উপচিত কর্ম।

ক. গুরু কর্ম : যে কর্ম নব জন্মক্ষণে সর্বপ্রথম ফল প্রদান করে তাকে বলা হয় গুরু কর্ম।

খ. আসন্ন কর্ম : আসন্ন কর্মকে মরণাসন্ন কর্মও বলা হয়। গুরু কর্ম সম্পাদিত না থাকলে মৃত্যুর পূর্বকালে সম্পাদিত কর্মই ফল প্রদান করে। অর্থাৎ আসন্নকর্ম জনককর্ম হয়। এ সময় কল্যাণ মিত্রের উচিত মৃত্যু মুখে পতিত ব্যক্তিকে কুশল বিষয় স্মরণ করানো।

গ. আচরিত কর্ম : গুরুকর্ম ও আসন্নকর্মের অভাবে মরণোন্নুখ ব্যক্তির নিকট আচরিত কর্ম উপস্থিত হয়। তা জনককর্মরূপে পরিণত হয়। জীবনে বহুবার সম্পাদিত কর্মই আচরিত কর্ম।

ঘ. উপচিত কর্ম : উপরি-উক্ত তিনি প্রকার কর্মের স্মৃতি যদি মৃত্যুর সময় উপস্থিত না হয়, তবে এই জন্মে বা পূর্বজন্মকৃত কর্মের স্মৃতি চিন্ত পথে উপস্থিত হয়ে জনক কর্মরূপে পরিণত হয়।

৩. ইহজন্মে ফল প্রদান অনুসারে কর্ম চার প্রকার। যেমন : ক. দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম, খ. উপপদ্য বেদনীয় কর্ম, গ. অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম, এবং ঘ. ভূতপূর্ব বেদনীয় কর্ম।

ক. দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম : যে কর্ম ইহজীবনে ফল প্রদান করতে সক্ষম তাকে বলা হয় দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম।

খ. উপপদ্য বেদনীয় কর্ম : যে কর্ম পরবর্তী জীবনে ফল প্রদান করে তাকে উপপদ্য বেদনীয় কর্ম বলা হয়।

গ. অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম : এই কর্ম পরবর্তী দ্বিতীয় জন্ম থেকে নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত যে কোনো জন্মে ফল প্রদানকারী কর্ম। অর্থাৎ যে কর্মের ফল অবশ্যই, তাই অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম। এটা সুযোগ ফেলে ফল প্রদান করবেই।

ঘ. ভূতপূর্ব বেদনীয় কর্ম : যে কর্মের ফলপ্রদান শক্তি এক সময় ছিল কিন্তু এখন আর নেই তাকে ভূতপূর্ব কর্ম বলা হয়। এটা নিজ দুর্বলতা হেতু ফলপ্রদানে সক্ষম নয়।

৪. ফল প্রদানের স্থান হিসেবে কর্ম চার প্রকার। যথা : ক. অকুশল, খ. কামাবচর ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম, গ. রূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম, এবং ঘ. অরূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম।

ক. অকুশল : যে পাপকর্ম প্রাণীগণকে মৃত্যুর পর চার প্রকার কাম দুর্গতিতে (অসুর, প্রেত, তির্যক এবং নিরয়) নিষ্কেপ করে সে সব কর্মকে অকুশল কর্ম বলা হয়।

খ. কামাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম : মৃত্যুর পর যে কর্মের প্রভাবে জীবগণ কাম সুগতি ভূমিতে (ছয় শ্রগ ও মনুষ্য) জন্ম গ্রহণ করতে পারে সে সব কুশল ফল প্রদানকারী কর্মকে কামাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম বলা হয়।

গ. রূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশল কর্ম : মৃত্যুর পর যে সব কর্ম জীবগণকে রূপলোকের ঘোলটি ভূমিতে জন্ম ধারণের ফল প্রদান করতে সক্ষম তাকেই রূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম বলা হয়।

ঘ. অরূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম : যে সব সৎ কর্ম বা কুশলকর্ম অরূপলোকের চারটি ভূমিতে প্রাণীগণকে জন্মাদ্বয় করতে ফল প্রদানে সক্ষম এগুলোই অরূপাবচর ফল প্রদানকারী কুশলকর্ম নামে পরিচিতি।

অনুশীলনযুলক কাজ

অঙ্গুত্তর নিকায়ে বুদ্ধ কী বলেছিলেন?
করণীয় অনুসারে কর্ম কয় প্রকার ও কী কী বল।

পাঠ : ২

কর্মবাদের ধারণা

‘কর্ম’ ও ‘বাদ’- দুটি অর্থবোধক শব্দের সমন্বয়ে ‘কর্মবাদ’ গঠিত হয়েছে। ‘কর্ম’ বলতে কায়, বাক্য ও মনে সম্পাদিত কাজ বা ক্রিয়াকে বোঝায়। ‘বাদ’ বলতে তত্ত্ব বা ধারণার বিশ্বাসকে বোঝায়। সুতরাং কর্মবাদ বলতে কর্মফলে গভীর বিশ্বাসকে বোঝানো হয়।

আয়ু-বর্ণে, ভোগ-এশ্বর্যে এবং জ্ঞান-গরিমায় মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তার অন্যতম কারণ কর্ম। জীব মাত্রই নিজ নিজ কর্মের অধীন। কর্মই প্রাণীগণকে হীন-উন্নত বা উচ্চ-নিচু বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত করে। পৃথিবীতে সকল মানুষের আচার-আচরণ যেমন এক রকম নয় তেমনি আবার স্বভাব-চরিত্র একই রকম নয়। ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ নামক গ্রন্থে ভিক্ষু নাগসেন ও শ্রীক রাজ মিলিন্দের কথোপকথনে নাগসেন স্থবির বলেছিলেন - ‘সকল মানুষ এক রকম না হওয়ার কারণ হলো তাদের কৃতকর্ম। বিভিন্ন মানুষের কর্মফলে পার্থক্য আছে বলেই মানুষের মধ্যে নানারকম পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়’। তিনি আরো বলেন - ‘সকল বৃক্ষের ফল সমান হয় না। কিছু টক, কিছু লবণাক্ত, কিছু মধুর রসযুক্ত। এগুলো বীজের নানাত্মক কারণেই হয়’। এভাবে কর্মের নানাত্মক হেতু সকল মানুষ সমান হয় না। কারণ প্রাণী মাত্রই কর্মের অধীন। এ রকম ভিন্নতার অন্যতম কারণ হলো কর্ম।

কর্মই প্রাণীকে নানাভাবে বিভাজন করে। জীবের সুখ এবং দুঃখের দাতা কেউ নয়। এগুলো কর্মেরই প্রতিক্রিয়া। বুদ্ধ সুন্নিপাত নামক গ্রন্থে বলেন -

ন জচ্চা ব্রাক্ষণো হোতি, ন জচ্চা হোতি অব্রাক্ষণো
কম্মুনা ব্রাক্ষণো হোতি কম্মুনা হোতি অব্রাক্ষণো।

বাংলা অনুবাদ : জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাক্ষণ হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ অব্রাক্ষণ হয় না, কর্ম দ্বারা ব্রাক্ষণ হয় এবং কর্ম দ্বারা অব্রাক্ষণ হয়।

কস্সকো কম্মুনা হোতি, সিপ্পিকো হোতি কম্মুনা
বাণিজো কম্মুনা হোতি, পেস্সিকো হোতি কম্মুনা।

বাংলা অনুবাদ : কর্ম দ্বারা কেউ চাষী হয়, কর্ম দ্বারা কেউ কারিগর হয়, কর্ম দ্বারাই মানুষ ব্যবসায়ী হয় এবং কর্ম দ্বারা চাকর হয়।

কম্মুনা বস্তি লোকো, কম্মুনা বস্তি পজা
কম্ম নিবন্ধন সত্তা, রথস্সানীব যাযতো।

বাংলা অনুবাদ : কর্মের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবী সচল। কর্মের মাধ্যমে মানব জন্মের সৃষ্টি। চাকার উপর নির্ভর করে রথ যেমন চলে তেমনি সকল প্রাণী নিজ নিজ কর্মে উপর নির্ভরশীল।

মানুষের জীবন কর্মবিধানের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে আসছে। অতীত কর্মের দ্বারা বর্তমান জীবন নির্ধারিত হয়েছে। আবার বর্তমান কর্মের দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবন নির্ধারিত হচ্ছে। অর্থাৎ অতীতের উপর যেমন বর্তমান জীবন নির্ভর করে, আবার বর্তমানের উপরও ভবিষ্যৎ জীবন নির্ভর করে।

জাতকে দীর্ঘায়ু কুমারের একটি কাহিনী আছে। বারাণসীরাজ দীর্ঘায়ু কুমারের মা-বাবাকে হত্যা করেছিলেন। অনেক দিন পর দীর্ঘায়ু কুমার একবার সুযোগ পেয়েছিলেন রাজাকে হত্যা করার। তিনি রাজাকে নিজের পরিচয় দিয়ে সৎকর্মের প্রভাবে রাজাকে হত্যা না করে বললেন, মহারাজ! আমি আপনার অনিষ্ট করবো না। বরং আপনি আমাকে আমার মা-বাবার মতো হত্যা করুন। তা না হলে আপনার শক্র পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। রাজাও তখন দীর্ঘায়ু কুমারকে বললেন, আমিও আপনার অনিষ্ট করবো না। এ ভাবে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এর মাধ্যমে বোৰা যায়, মন্দ কর্ম জন্মান্তরে সুযোগ থাকলেও কুশল চিন্তার জন্য তা ঘটলো না। এতে দুজনের উপর শুভ অদৃষ্টফলের প্রভাব পড়েছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ

নাগসেন স্থির গ্রীকরাজ মিলিন্দকে কর্ম সম্পর্কে কী বলেছিলেন? বল
সুন্তনিপাতে বর্ণিত কর্মের ধারণা দাও।

পাঠ : ৩ কর্মফলের ব্যাখ্যা

কর্মবাদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষকে তার নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন কর্মফল ভোগ করবে। কর্ম যদি ভালো-মন্দ হয় তবে ফলও ভালো-মন্দ হবে। আপনি যেমন বীজ রোপন করবেন, তেমন ফসল পাবেন। কেউ যদি ধানের বীজ রোপন করে তবে সে ধান পাবে, গম পাবে না। আর যদি কেউ খারাপ ধানের বীজ বপন করে তবে খারাপ ধান পাবে, ভালো ধান পাবে না। পৃথিবীর সর্বত্রেই একই নিয়ম প্রযোজ্য। আমি তোমাকে মুক্ত করবো এ কথা বুঝ কোথাও বলেননি। বর্তমান মুর্হুতের কর্ম পরবর্তী মুর্হুতে ফল প্রদান করে। এটাই পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষ নিজ নিজ ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে। সুন্ত পিটকের অন্তর্গত ‘ধর্মপদ’ নামক গ্রন্থে দেখা যায়;

‘অন্তাহি অন্তনাথো কোহি নাথো পরোসিয়া’।

অন্তনাহি সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং

অর্থাৎ নিজেই নিজের আগকর্তা বা প্রভু, অন্যকোনো আগ কর্তা বা প্রভু নেই। নিজেকে সুসংযত করতে পারলেই যে কোনো দুর্লভ বিষয় লাভ সম্ভব।

আত্মনির্ভরশীল না হলে কারো পক্ষে কোনোপকার কাজে সফলতা আসে না। তাই আত্মপ্রতিষ্ঠাই হলো সর্ববিধ মহৎ কাজের ভিত্তিস্বরূপ। মানুষ তার ভালো-মন্দ কর্মের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করে। কর্ম ফল দেয়, ফল কারণ নির্দেশ করে। বীজ ফল প্রদান করে এবং ফল বীজের বর্ণনা করে। এখানে বীজ এবং ফল উভয়েরই পরম্পর সম্পর্কযুক্ত। সেৱন কর্ম ও কর্মফল পরম্পর নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ফল পূর্ব থেকে কর্মের মধ্যে অক্ষুরণাপে বিদ্যমান থাকে। ‘সঙ্গীতি সূত্রে’ কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিশেষ চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন :

ক. অকুশল বা দুঃখদায়ী পাপকর্ম : এগুলো হচ্ছে লোভ-দ্রেষ-মোহাচ্ছন্ন চিত্তে সম্পাদিত কর্ম। এরপ কর্মের ফল সম্পর্কে ধর্মপদ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে ;

দিসো দিসৎ যৎ তৎ কথিরা বেরী বা পন বেরীনৎ
মিছাপণিহিতৎ চিত্তৎ পাপিযো নৎ ততো করে।

বাংলা অনুবাদ : একজন বিদ্বেষকারী অপর একজন বিদ্বেষকারীর অথবা একজন শক্রর যে ক্ষতি করতে পারে, মিথ্যাপথে পরিচালিত চিত্ত তার চেয়ে অনেক ক্ষতিসাধন করে। ধর্মপদ নামক গ্রন্থে আরো বলা হয়েছে-

ইধ সোচতি পেচ সোচতি পাপকারী উভযথ সোচতি
সো সোচতি নো বিএঞ্জিতি দিষ্মা কম্বকিলট্টমত্তনো

বাংলা অনুবাদ : পাপকারী ইহলোক-পরলোক উভয়লোকে অনুশোচনা করে। সে নিজের পাপকর্ম ও তার ফল দেখে গভীরভাবে অনুশোচনা করতে থাকে।

খ. কুশল বা সুখদায়ী পুণ্যকর্ম : শীল পালন, দানানুশীলন, পরোপকারসাধন প্রভৃতি সৎকর্ম কুশল বা সুখদায়ী। পুণ্যকর্ম সুখময় ফলদায়ক। এরপ কর্মের ফল সম্পর্কে ধর্মপদে বলা হয়েছে-

নৎ তৎ মাতা-পিতা কথিরা অঞ্চেও বাপি চ এগাতকা
সম্মা পণিহিতৎ চিত্তৎ সেয়সো নৎ ততো করে।

বাংলা অনুবাদ : মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বাঙ্কুর যে উপকার করতে পারে না, সুপথে পরিচালিত চিত্ত তার চেয়ে অধিক উপকার করে।

গ. কুশলাকুশল ফলদায়ী পাপ-পুণ্যকর্ম : কুশলাকুশল বিমিশ্রিত চিত্তে সম্পাদিত কর্ম পাপ পুণ্যময় হয় এবং তার ফল সুখ দুঃখময় হয়। এ রকম কর্মের একটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো - কোনো এক ব্যক্তি চুরি, শর্ততা, প্রবন্ধনা প্রভৃতি হীন উপায়ে অর্থ উপার্জন করে। কোনো ব্যক্তি তার কাছ থেকে অর্থ চাইলে সে মুক্ত হতে দান করে। দুঃখীর দুঃখ মোচনে সে সব সময় অংশী ভূমিকা পালন করে। ফল লাভের ক্ষেত্রে সে তার বদান্যতা, উদারতা ও পরের উপকার করার ফলস্বরূপ পরবর্তী জন্মে বিন্দুশালী হয়ে জন্মাই হতে পারে। তবে চুরি, শর্ততা, প্রবন্ধনা প্রভৃতি অপকর্মের জন্য মিথ্যা অপবাদের ভাগী হতে পারে। বিপুল অর্থ থাকা সত্ত্বেও ভোগে বঞ্চিত হতে পারে। দৈহিক ও মানসিক নানাকষ্টের মধ্য দিয়ে তার জীবনের অবসান হয়।

ঘ. সব রকম কর্মক্ষয়কর কর্ম যার দ্বারা মুক্তি লাভ সম্ভব : মানুষ যখন লোভ-দ্রেষ-মোহে আকৃষ্ট হয়, তখন তার মধ্যে নানারকম কামনা-বাসনা উৎপন্ন হয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনকে সংযত করার মাধ্যমে এগুলোকে দমন করা সম্ভব। তাঁর জন্য দরকার একাথ সাধনা, যার মধ্য দিয়ে পরম মুক্তি লাভ সম্ভব। বুদ্ধ সংযুক্ত নিকায়ের 'সমিদি সুন্দে' বলেছেন, 'কায়-বাক্য- মনে কোনোরকম পাপকর্ম করা উচিত নয়। কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করে স্মৃতিমান হয়ে অনর্থক দুঃখ সেবন থেকে বিরত থাকা উচিত'।

সুকর্ম ও সুকর্মের ফল ব্যক্তিকে পুণ্যময় কর্মানুষ্ঠানের দিকে নিয়ে যায়। অঙ্গুলিমাল ছিলেন নরঘাতক দস্যু। তিনি ১৯৯৯ জনকে নিজ হাতে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু সেই অঙ্গুলিমালই তাঁর অস্তিম জন্মে অতীতের সমস্ত পাপকর্ম হতে মুক্ত হয়ে অর্থ হয়েছিলেন। আলবক যক্ষ বুদ্ধের দ্বারা দমিত হয়ে প্রাণী হত্যা পরিত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি তাঁর কর্ম প্রচেষ্টায় স্বোতাপন্তি ফল লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গণিকা আত্মপালি বুদ্ধ নির্দেশিত এবং প্রদর্শিত পথ অনুসরণ

করে অরহত্ব ফল লাভ করেছিলেন। রাজ্য বিস্তারের মোহে সম্মাট অশোক চঙ্গাশোক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সেই চঙ্গাশোক পরবর্তীকালে ধর্মাশোক হিসেবে খ্যাতি লাভ করে বহু জনহিতকর কর্ম সম্পাদন করেছিলেন। পিতৃ হত্যাকারী রাজা অজাতশত্রু বুদ্ধের নিকটে এসে ধর্মানুরাগ ও ভক্তির জন্য আজও বিখ্যাত হয়ে আছেন। কিন্তু পিতৃ হত্যাজনিত পাপকর্মের ফলে মৃত্যুর পর নরক যত্নগ্রাম ভোগ করেন। ত্রাঙ্কণ পুত্র হয়েও ব্রাহ্মণগোচিত আচরণের অধিকারী অনেকেই হতে পারে না। অন্যদিকে শুদ্ধুকুলে জন্ম গ্রহণ করে দৈহিক সুশ্রীতার জন্য অনেক সুনাম-সুখ্যাতির অধিকারী হওয়া যায়। যিনি বৌদ্ধ কর্মফলে বিশ্বাসী তিনি কোনো জরুর্যতম অপরাধীকেও ঘৃণা করে না। কারণ তিনি জানেন ঐ ব্যক্তি সুযোগ পেলে মহামহীয়ান হতে পারেন। আবার তার সুকর্মের দ্বারা তিনি ইহজীবনেই নিজের কর্মফল ভোগ করতে পারেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে কয়তাগে ভাগ করা যায়?

পাঠ : ৪

কুশল ও অকুশল কর্ম

‘কুশল’ শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হলো যথাত্মে – নিপুণ, শুভ, পুণ্যধর্ম, সৎ, ধার্মিক দোষশূন্য, নির্দোষ, প্রশংসনীয়, গুণসম্পন্ন, কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি। লোভ, দেষ, এবং মোহহীন চেতনা দ্বারা সম্পাদিত কর্মকে কুশল কর্ম বলা হয়। এ ধরনের কাজে কোনোরকম পাপের স্পর্শ থাকে না। দান, শীল ভাবনা, সেবা, পুণ্যদান, ধর্ম প্রবণ ইত্যাদি কুশলকর্ম। কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হলে কুশল চিত্তের দরকার। এভাবে ভালো কাজ করলে ভালো ফল লাভ করা সম্ভব। বৌদ্ধধর্মে কুশলকর্মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কুশলকর্মের ফল কুশল হয়। পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন দাসী। একদিন তিনি ভিক্ষু সুজাতকে তিনটি সুমিষ্ট পিঠা দান করেছিলেন। এই কুশল কর্মের ফলে ক্ষেমা সুকৃতি অর্জনপূর্বক বিপর্শী বুদ্ধের সময় মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ককুসঞ্চ বুদ্ধের সময়ে তিনি ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করে সুন্দর এক মনোরম উদ্যান বৃক্ষ প্রমুখ ভিক্ষুসম্পত্তিকে দান করেন। কোনাগমন বুদ্ধের সময়েও তিনি একই রকম দানানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তিনি নৃপতি কিকির জ্যেষ্ঠা কন্যারাপে জন্মগ্রহণ করে সজ্জকে বাসস্থান নির্মাণ করে দেন। অবশেষে গৌতম বুদ্ধের সময়ে তিনি রাজা বিষ্ণিসারের পত্নী হন।

এ প্রসঙ্গে কুশলকর্মের আরো একটি উদাহরণ নিচে প্রদান করা হলো :

বোধিসত্ত্ব একবার গরিব ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি পরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদিন কাজের সন্ধানে তিনি বের হয়ে রাজগৃহের ধনী শ্রেষ্ঠীর পরিবারে কাজ নেন। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে লাগলেন। একদিন সারাদিন ক্ষেত্রে পরিশ্রম করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখলো সকলেই সেদিন পূর্ণিমার উপবাসন্ত পালন করছে। অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ উপবাসন্ত শীল পালন করেছে। তিনি শ্রেষ্ঠীকে বললেন প্রভু! আমার ভূল হয়ে গেছে। আমি জানতাম না আজ উপবাসন্ত দিন। তাই সকালে উপবাসন্ত পালন করতে পারিনি। এখন আমি গ্রহণ করতে চাই। শ্রেষ্ঠীর কথা মতো তিনি সারারাত উপবাস থেকে শীলানুস্মৃতি ভাবনা করেন। দুর্ভাগ্যবশত সারাদিনের পরিশ্রম এবং সারারাত অনাহারে পরিদিন তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে কুশল চিন্তা-চেতনায় মগ্ন ছিল। সেই কুশল কর্ম চেতনার প্রভাবে মৃত্যুর পর রাজপুত্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। এটা কুশলকর্মের ফল।

অকুশল’ শব্দের অর্থগুলো হলো-পাপ, দোষ, ত্রুটি, অপুণ্য, অসৎকার্য, অপরাধ, অশ্রুত কার্য অনিপুণ, অমঙ্গল কর্ম, অহিতকর, অন্যায়, অনুপযুক্ত, নীতিবিরুদ্ধ, অযথার্থ, নিকষ্ট ইত্যাদি। অকুশল কর্মের মধ্যে লোভ, দ্বেষ এবং মোহ বিরাজমান রয়েছে। অকুশলজনিত কাজের ফল সব সময় অকুশল হয়। অকুশল কর্মের ফলে সমাজে মানুষ অপমানিত হয়। মান-সমানের হানি হয়। সর্বোপরি সর্বত্রে তার নিম্না প্রচারিত হয়। অকুশল কর্মের ফল সবাইকে ভোগ করতে হয়। মৌদগল্যায়নকে শেষ বয়সে শারীরিক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। মৌদগল্যায়ন ছিলেন অর্হৎ। তিনি পূর্বজন্মে পরম ময়তাময়ী মাকে কষ্ট দিয়েছিলেন। সেই কষ্টের ফল হিসেবে তাঁকে অর্হৎ হওয়া সত্ত্বেও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছিল। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, অকুশল কর্মের ফল জন্মান্তরেও ভোগ করতে হয়।

দেবদত্ত একবার বুদ্ধের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় তিনি পাহাড় থেকে পাথর ছুঁড়ে দিয়ে বুদ্ধকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। এ সময় বুদ্ধের মতো মহাজ্ঞানীর শরীর থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়েছে। এই অকুশল কর্মের ফলে দেবদত্তকে নরক যত্নণা ভোগ করতে হয়েছে।

মধ্যম নিকায়ের ‘মহাবচছ’ সূত্রে উল্লেখ রয়েছে- এক সময় বুদ্ধ বচ্ছগোত্র পরিব্রাজককে কুশল এবং অকুশল কর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন; ‘লোভ অকুশল আর অলোভ কুশল। দ্বেষ অকুশল, অদ্বেষ কুশল। মোহ অকুশল, অমোহ কুশল’। তিনি আরো বলেন; হিংসা অকুশল, হিংসা হতে বিরতি কুশল। চুরি অকুশল, চুরি হতে বিরতি কুশল। কামাচার অকুশল, কামাচার হতে বিরতি কুশল। মিথ্যাকথা বলা অকুশল, মিথ্যাকথা বলা হতে বিরতি কুশল। বিদ্বেষ পরায়ণ বাক্য অকুশল, বিদ্বেষ পরায়ণ বাক্য হতে বিরতি কুশল। কর্কশ বাক্য অকুশল, কর্কশবাক্য বলা হতে বিরতি কুশল। বৃথাবাক্য বলা অকুশল, বৃথাবাক্য বলা হতে বিরতি কুশল। অভিধ্যা (লোভ) অকুশল, অনভিধ্যা কুশল। করণাহীন অকুশল, করণা কুশল। ভাস্তুধারণা অকুশল, সত্যধারণা কুশল’। এখানে বুদ্ধ এই দশবিধ ধর্মকে (আচার) অকুশল আর দশ বিরত ধর্মকে কুশল হিসেবে অভিহিত করেছেন।

মৃত্যুকালে সম্পাদিত কর্ম কুশল হোক আর অকুশল হোক বিশেষ ফলদায়ী। জীবনে কুশল কর্মের প্রাধান্য সত্ত্বেও মৃত্যুর সময় অকুশল চিন্তা উৎপন্ন হলে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে সারাজীবনে অকুশল কর্মের পরিমাণ বেশি থাকলেও মৃত্যুক্ষণে কুশলচিন্তার উৎপত্তি হেতু উর্ধ্বাগতি লাভ হয়। মৃত্যুক্ষণে কুশল উৎপন্ন হলেই তার গতি সৎ ও সুখের হয়। সুতরাং কুশল চিন্তা উৎপন্ন করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কুশল এবং অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধর?

পাঠ : ৫

চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের বাংলা অনুবাদ

চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সুত্র বা শুন্দ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্র মধ্যম নিকায়ের (তৃতীয় খ-) ১৩৫ নং সংখ্যক সূত্র। এতে কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। নিচে তা তুলে ধরা হলো।

আমি এ রকম শুনেছি যে, এক সময় ভগবান বুদ্ধ জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে বাস করেছিলেন। সে সময় তোদেয় ব্রাহ্মণের পুত্র শুভ মাণবক বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে শুভ মাণবক বুদ্ধের সাথে আনন্দময় আলাপ-আলোচনা করে একপাশে উপবেশন করেছিলেন। তারপর তোদেয় পুত্র শুভ মাণবক বুদ্ধকে বললেন, ‘হে গৌতম পুত্র! কী কারণে মানুষের মধ্যে কেউ হীন ও কেউ উৎকৃষ্ট, কেউ অল্পায় ও কেউ দীর্ঘজীব, কেউ রোগী ও কেউ নিরোগী, কেউ বিশ্রী ও কেউ সুশ্রী, কেউ গরিব ও কেউ ধনী, কেউ অল্পশক্তিযুক্ত ও কেউ মহাশক্তিযুক্ত, কেউ নীচ কুলজাত, কেউ উচ্চ কুলজাত, কেউ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী লোক জগতে দেখা যায়? হে গৌতম! মানুষের মধ্যে এরূপ হীন ও শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ কী?’

তখন বুদ্ধ উভয়ের বললেন, ‘হে মাণবক! এ জগতে জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মই জীবগণের একমাত্র বন্ধু। কর্মই তাদের একমাত্র শরণ বা আশ্রয়। কর্মই জীবগণের একমাত্র রক্ষাকারী। কর্মই জীবগণকে হীন ও শ্রেষ্ঠত্বাবে বিভক্ত করে।

শুভ মাণবক বললো, ‘হে গৌতম! আমি আপনার দেশিত বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পারিনি। আপনি সর্বজ্ঞ। সুতরাং কর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত দেশনা করুন যাতে আমি সহজেই বুঝতে পারি।

তখন বুদ্ধ বললেন, ‘হে শুভ মাণবক! তাহলে শোনো। মন দিয়ে বোঝার চেষ্টার করো।

শুভ মাণবক বললেন, ‘হ্যাঁ তগবান বলুন।’

তখন বুদ্ধ বললেন, ‘হে মাণবক! এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ প্রাণী হত্যাকারী এবং লোভী হয়। তারা সবসময় প্রাণীর রক্তে হাত রঞ্জিত করে। এভাবে হত্যা বা আহত করে জীবের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করে। এ রকম আচরণের ফলে তারা মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক বা নরকে যায়। যদি মানবকুলে জন্ম নেয় তবে তারা কম আয়ু পায়।

‘হে মাণবক! প্রাণীদের প্রতি নিষ্ঠুর হওয়া এবং হতাহত জীবের প্রতি নিষ্ঠুরতাই কম আয়ু পাওয়ার অন্যতম কারণ।

হে মাণবক! কোনো কোনো নারী পুরুষ প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকে। তারা অন্ত্র ফেলে দেয়, প্রাণী হত্যায় লজ্জা অনুভত করে। সকল প্রাণীর প্রতি করুণা প্রদর্শনপূর্বক জীবন ধারণ করে। এভাবে কুশল কাজ করে এবং কুশল জীবিকা অর্জনের মাধ্যমে তারা জীবনধারণ করে। এ জন্য মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে যায়। স্বর্গে না গিয়ে আবার মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও দীর্ঘ জীবন পায়। প্রাণীদের প্রতি করুণা পরায়ণ ও উপকারী হয়ে জীবহত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য তারা দীর্ঘজীবী হয়।’

‘হে মাণবক! পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ প্রাণীদের উপর অত্যাচার করে। তারা চিল, লাঠি বা অস্ত্রের দ্বারা জীবের উপর অত্যাচার চালায়। জীবের উপর এ রকম অত্যাচার করা উচিত নয়। এ ধরনের কষ্ট দেওয়ার জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয়। আর যদি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে তবে তারা সবসময় কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়।’

‘হে মাণবক! ‘এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ রাগহীন হয়। সামান্য কথাতেই তারা রেঁগে উঠে। মন্দ কথা বলে। রাগ, হিংসা দীর্ঘদিন ধরে মনে পুষে রাখে এবং পরে তা আবার প্রকাশ করে। এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোকে অথবা নরকে জন্মগ্রহণ করে। আর যদি তারা মানবকুলে জন্ম নেয়ও তবে তাদের চেহারা খুবই বিশ্রী হয়। এটিই তাদের বিশ্রী হওয়ার কারণ।’

‘হে মাণবক! পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ রাগহীন হয়। তাদের শত কিছু বললেও তারা রাগ করে না, লাফালাফি ও উচ্চবাক্য করে না। এ জন্য তারা মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। স্বর্গে না গিয়ে আবার মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেও দীর্ঘ জীবন পায়। প্রাণীর প্রতি করুণা পরায়ণ ও উপকারী হয়ে জীবহত্যা থেকে বিরত থাকার জন্য তারা দীর্ঘজীবী হয়। হে মাণবক! এটি তাদের সুশ্রী হওয়ার অন্যতম কারণ।’

‘হে মানবক! কোনো কোনো নারী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হয়। যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা পূজা পাওয়া লোকদের তারা ঈর্ষা করে। আক্রোশ প্রকাশ করে। দোষী বলে সাব্যস্ত করে। এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোকে অথবা নরকে জন্মগ্রহণ করে। তারা মানবকুলে জন্ম নিলেও গরিব পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। হে মাণবক! এটাই গরিব পরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ।’

‘হে মাণবক ! কোনো কোনো নারী বা পুরুষ ঈর্ষাপরায়ণ হয় না । যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা পূজা পাওয়ার লোকদের তারা ঈর্ষা করে না । ঈর্ষার কারণে কারো প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করে না । দোষী বলে সাব্যস্থ করে না । এজন্য তারা স্বর্গে যায় । মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করলে মহাপরিবারে জন্ম নেয় । এটাই মহাপরিবারে জন্ম নেওয়ার কারণ ।

‘হে মাণবক ! এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ দাতা হয় না । শ্রমণ ব্রাহ্মণকে খাদ্য, পানীয়, কাপড় কোন কিছুই দান করে না । এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুর লোক অথবা নরকে জন্ম নেয় । আর যদি মানবকুলে জন্ম নেয়ও তবে তারা খুব গরিব হয় । এটাই গরিব হওয়ার কারণ’ ।

‘হে মাণবক ! এ পৃথিবীতে কোনো নারী বা পুরুষ অহংকারী হয় না । সে অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করে না । দাঁড়িয়ে সম্মান জানানোর যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান করে না । আসন দানের যোগ্য ব্যক্তিকে আসন দান করে না । পূজা করার ব্যক্তিকে পূজা করে না । মান্য করার ব্যক্তিকে মান্য করে না । এরূপ কাজের জন্য তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয় । আর যদি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে তারা নীচুকুলে জন্ম নেয় । আর যদি মানবকুলে জন্ম নেয়ও তবে তারা নীচুকুলে জন্ম নেওয়ার কারণ’ ।

‘হে মাণবক, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ অহংকারী হয় না । অভিবাদনের যোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করে । এছাড়া যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করেন, আসন দানের যোগ্য ব্যক্তিকে আসন দান করে, পূজা করার ব্যক্তিকে পূজা করে, মান্য করার ব্যক্তিকে মান্য করে । এজন্য তার স্বর্গে যায় । আর মানুষ হয়ে জন্ম নিলেও উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করে । এটাই উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করার কারণ’ ।

‘হে মাণবক, এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজেস করেন, ভস্তে, কুশল কী ? অকুশল কী ? কী দোষের নয় ? কী সেবা করা উচিত ? কী সেবা উচিত নয় । কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অনিষ্টকর ও দুঃখকর হবে এবং কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘকাল সুখ বয়ে আনবে ? এরূপ কাজ করলে তারা অপায়, দুর্গতি, অসুরলোক অথবা নরকে জন্ম নেয় । আর যদি মানবকুলে জন্মও নেয় তবে তারা প্রজাহীন নয় । এটাই প্রজাহীন হয়ে জন্মগ্রহণের কারণ’ ।

‘হে মাণবক ! এ পৃথিবীতে কোনো কোনো নারী বা পুরুষ, শ্রমণ বা ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজেস করেন, কুশল কী ? অকুশল কী ? কী কী দোষের নয় ? কিসের সেবা করা উচিত ? কিসের সেবা করা উচিত নয় ? কোন কাজ করলে তা দীর্ঘদিন ধরে কষ্ট অনিষ্টকর দুঃখকর হবে ? কোন কাজ করলে তা আমার জন্য দীর্ঘকাল সুখ বয়ে আনবে ? এরূপ কাজের জন্য তারা স্বর্গে যায় । আর মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলে মহাজ্ঞানী হয়ে জন্ম নেয় । এটাই মহাজ্ঞানী হয়ে জন্মগ্রহণ করার কারণ’ ।

‘হে মাণবক ! এরূপে অল্প আয়ু, দীর্ঘ আয়ু, জটিল ব্যাধিগ্রস্থ, নিরোগ, বিশ্রী, সুশ্রী, দুঃখী পরিবার, সুখী পরিবার, গরিব, ধনী, অল্পশক্তিসম্পন্ন, মহাশক্তিসম্পন্ন, উচ্চকুল, নিচুকুল, জ্ঞানহীন, মহাজ্ঞানী নানারকম মানুষ দেখা যায়’ ।

‘হে মাণবক ! কর্মই জীবগণের সঙ্গী । জীবগণ কর্মেরই অধীন । কর্মের মাধ্যমেই মানুষ বিভিন্নকুলে জন্মগ্রহণ করার কারণ হয় । অর্থাৎ তারা দুর্গতি, অপায়, অসুরলোক, নরক বা মানবকুলে জন্ম নেয় । কর্মই বন্ধু । কর্মই প্রতিকারণ । সুতরাং কর্মই মানুষকে হীনকুলে নিয়ে যায় । কর্মই আবার মানুষকে উচ্চকুলে নিয়ে যায় । উচ্চবংশে জন্মাতে সাহায্য করে । শ্রেষ্ঠ করে তোলে’ ।

বুদ্ধ এভাবে কর্মবাদ ব্যাখ্যা করলে তোদেয় পুত্র শুভ মাণবক বুদ্ধকে বললেন ; অতি উত্তম, অতি সুন্দর, অতি মনোরম । তিনি আচ্ছাদিত বস্ত্রে উদ্ঘাটিত করলেন । পথ হারা মানুষকে পথ প্রদর্শন করলেন । এভাবে বুদ্ধ কত

যে ধর্মদেশনা করেছেন তার কোনো শেষ নেই। হে বুদ্ধ ! এখন আমি আপনি, আপনার প্রবর্তিত ধর্ম এবং প্রতিষ্ঠিত সঙ্গের শরণ গ্রহণ করলাম। আজ থেকে আপনি আমাকে আপনার শরণাগত উপাসক মনে করুন।

অনুশীলনযুলক কাজ
চুল্লকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের মূলকথা কী লেখ।

পাঠ : ৬ কর্মবাদের গুরুত্ব

কর্মবাদ বৌদ্ধধর্মে এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধের কর্মবাদ অনুসারে চিন্তা বা চেতনাই হলো কুশলকর্ম এবং অকুশল কর্মের উৎপত্তিস্থল। এই কর্মবাদ অনুসারে খারাপ চিন্তা করাও পাপ। কুশল চেতনার মাধ্যমে কুশলকর্ম সম্পাদিত হয়। কার্যকারণনীতির অমোঘ প্রক্রিয়ার দ্বারা গত জীবনের কর্মফলে বর্তমান জীবন, বর্তমান জীবনের কর্মফলে ভবিষ্যৎ জীবন গঠন করে। স্বর্গ হতে নিম্নতর নরক পর্যন্ত সমস্ত জীব কর্মসূত্রে গ্রহিত। সকলেই কর্মের একই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত। কোনো কর্ম একবার সম্পাদন করলে অনন্তকাল পর্যন্ত তার ফল প্রদান করতে থাকে। এভাবে কর্মেরফল অখণ্ডনীয়। সবাইকে তা ভোগ করতে হবে। তাই কুশল কাজের জন্য মনের সংযতকরণ দরকার। ধর্মপদে এ বিষয়ে দেখা যায়;

মনো পুবৎগমা ধম্মা মনোস্টোষা মনোময়া
মনসা চ পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা,
ততো ন সুখময়েতি ছায়া'ব অনুপায়ীনী

বাংলা অনুবাদ : মন সকল ধর্মের মধ্যে অহঙ্গামী। সব ধর্ম মনের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রসন্ন মনে কেউ যদি কোনো রকম কাজ সম্পাদন করে তাহলে সুখ তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করে।

কর্মের দ্বার তিনটি। যথা : কায় দ্বার, বাক্য দ্বার, এবং মনো দ্বার। প্রতিনিয়ত এই তিনটি দ্বার দিয়ে কর্ম সম্পাদিত হয়। কোনো কোনো কর্মে তিনটি দ্বারই এক সঙ্গে থাকে। কোনো কাজে দুটো এবং কোনো কোনো কাজ কেবল একটি দ্বার দিয়েই সম্পাদিত হয়। তিন দ্বারের মাধ্যমে আমরা যে সব কাজ করছি, তার কোনোটি সৎ, কোনোটি অসৎ আবার কোনোটি নিরপেক্ষ। কোনো কর্ম সৎ নাকি অসৎ তার বিচার করা হয় কর্মফলের দ্বারা। যে কর্মের ফল কর্তার নিজের ও নিজের পারিপার্শ্বিক জীবজগতের পক্ষে কল্যাণময় ও সুখপ্রদায়ী তাকে বলা হয় সৎ কর্ম। যা কর্তার নিজের পারিপার্শ্বিক জীবজগতের অকল্যাণকর বা দুঃখ আনয়ন করে তাই অসৎ কর্ম। যে কর্ম সম্পাদন হলেও ফলপ্রসূ হয় না তাই নিরপেক্ষ কর্ম।

কর্ম দ্বারা সমাজে মানুষের অবস্থান সুদৃঢ় হয় কিংবা প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব, জন্ম দিয়ে নয়। সুন্দরভাবে প্রতিদিনের কর্ম সম্পাদন করলে জীবন সুখময় হয়। তবে সম্পাদিত কর্মের মধ্যে কুশল চেতনা থাকা দরকার। এভাবে কাজ করলে ভালো ফলাফল অবশ্যিকী। সেজন্য বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কর্মের মাধ্যমেই একজন মানুষ তার নিজের জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে। কর্মই মানুষকে উচ্চ আসনে আসীন করে। কর্মের সুফল সবদিকেই প্রবাহিত হয়। কর্মই মানুষের চালিকাশক্তি। মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল বহন করে। পশ্চাতে ফেলে আসে না। বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে, প্রাণী হত্যা না করা, চুরি না করা, ব্যক্তিকারে লিঙ্গ না হওয়া, মিথ্যা কথা না বলা, মাদক জাতীয় সেবন না করাসহ বৃথা বাক্য না বলা, কর্কশ বাক্য না বলা-এর বিধান রয়েছে। সুন্দরভাবে জীবিকা অবলম্বনের জন্য অন্যায় ও অসামাজিক সকল প্রকার কাজ করা উচিত নয়। কেননা, নিন্দিত বা খারাপ কাজ যারা করে তাদেরকে সমাজে সবাই অবজ্ঞা করে। ঘৃণার চোখে দেখে। সুতরাং বুদ্ধের কর্মবাদ মনে রেখে কল্যাণময় কর্ম করা উচিত। শুভ বা কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যে ফল অর্জিত হয় তা কখনো পক্ষাবন ধৰ্মস করতে পারে না। এমন কর্মসম্পাদন করতে হবে যার মাধ্যমে পরিবার, সমাজ সর্বোপরি রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. মানুষ নিজ নিজ কর্ম অনুসারে ভোগ করে।
২. নানাত্ম হেতু সকল মানুষ সমান হয় না
৩. বৌদ্ধধর্মে উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
৪. জীবগণকে হীন ও শ্রেষ্ঠতাবে বিভক্ত করে।
৫. বর্তমান জীবনের ভবিষ্যৎ জীবন গঠন হয়।।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. কর্মবাদ বলতে কী বোঝা?
২. কর্মের অধীন কারা?
৩. কুশল কর্ম বলতে কী বোঝা?
৪. অকুশল কর্ম বলতে কী বোঝা?
৫. কর্মের দ্বার কয়টি ও কি কি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।
২. কুশল এবং অকুশল কর্ম সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
৩. চূল্পকর্ম বিভঙ্গ সূত্রের সারমর্ম তুলে ধর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- ১। কোনু বৃক্ষের সময়ে ক্ষেমা হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ?

- | | |
|-------------|---------------|
| ক. ককুসন্ধি | খ. কশ্যপ |
| খ. কোণাগমন | ঘ. পদুমুত্তুর |

- ২। কর্মবাদ বলতে কী বোঝায় ?

- ক. ধারনার বিশ্বাসকে
- খ. কর্মফলের গভীর বিশ্বাসকে
- গ. পূর্ব জন্মের বিশ্বাসকে
- ঘ. ইহকর্মফলের বিশ্বাসকে

নিচের অনুচ্ছেদ পঠে ঢ়ে ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

দায়ক ও ভাস্তোর কথোপকথন :

দায়ক : বিহারের গিয়ে ত্রিভুবন বন্দনা শেষে ভিক্ষু বন্দনাপূর্বক পাশে বসে প্রশ্ন করেন – মানুষ ধনী-গরিব, সুশ্রী-বিশ্রী হয় কেন ?

ভাস্তে : তিনি দেশনায় বুদ্ধের উদ্ধৃতাংশ দিয়ে বলেন - 'জীবমাত্রই কর্মের অধীন। কর্মই জীবনের একমাত্র বন্ধু। কর্মই তাদের একমাত্র আশ্রয়। কর্মই জীবগণের একমাত্র রক্ষাকারী। কর্মই জীবগণকে হীন ও শ্রেষ্ঠত্বাবে বিভক্ত করে।'

৩। দায়কের প্রশ্নকরণের বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ?

- | | |
|--------------|----------------|
| ক. সুভদ্রের | খ. ব্রাহ্মাণের |
| গ. শুভমানবের | ঘ. উপালির |

৪। ভাস্তের দেশনায় বুদ্ধের উদ্ধৃতাংশটিতে কীসের প্রকাশ পেয়েছে -

- | | |
|--------------|----------------|
| ক. ধ্যানদের | খ. বস্ত্রবাদের |
| গ. কর্মবাদের | ঘ. ভাববাদের |

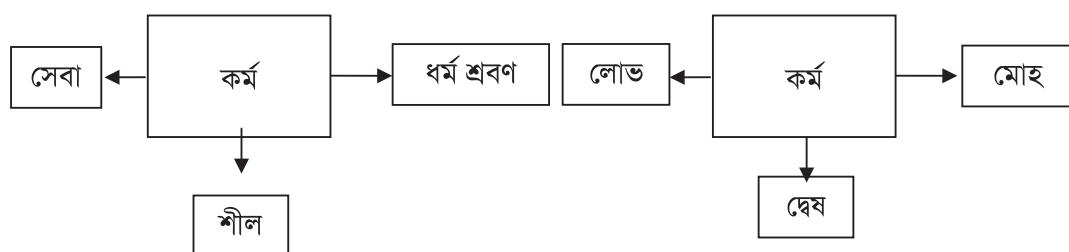
সূজনশীল প্রশ্ন :

১। নতুনপাড়ার দুই প্রতিবেশী পাশাপাশি অবস্থান করেন। তাঁদের মধ্যে দীপান্বিতা চাক্মার পরিবারের সদস্যরা শান্ত ও ভদ্র। যশ-গৌরব, সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা পাওয়া লোকদের তাঁরা ঈর্ষ্যা করেন না বরং বিহারে ও বাড়িতে ভিক্ষুদের আমন্ত্রণ করে খাদ্য, পানীয় ও নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সামর্থ অনুসারে দান দিয়ে থাকেন। তাই অন্য পরিবারের সদস্যরা হিংসা ও আক্রোশমূলক কথাবার্তা বলে তাঁদের বিরক্তি ঘটান।

- ক. 'সঙ্গীতি সুন্দ্রে' কর্মের ফল বিবেচনায় কর্মের বিধানকে কয়ভাগে ভাগ করা হয়েছে ?
- খ. দেবদত্তকে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে কেন ? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
- গ. দীপান্বিতা চাক্মার পরিবারের কর্মকাণ্ডগুলো কোন সুন্দের সাথে মিল পাওয়া যায় ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে দুই পরিবারের আচরণে পারিবারিক ও সামাজিকভাবে কী প্রভাব ফেলবে ? ধর্মীয় দৃষ্টিতে তা বিচার বিশ্লেষণ কর।

২।

ছক-১



- ক. অকুশল শব্দের অর্থ কী ?

- খ. উৎপীড়ক কর্ম কী ? ব্যাখ্যা কর।

- গ. ছক-১ দ্বারা কোন কর্মের ইঙ্গিত বহন করছে - ব্যাখ্যা কর।

- ঘ. ছক-১ ও ২ এ বর্ণিত কর্মফলের পার্থক্য কী হতে পারে ? ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অট্ঠকথা

ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর সহজ-সরল ব্যাখ্যা স্বরূপ পালি ভাষায় এক শ্রেণির সাহিত্যকর্ম রচিত হয় যা পালি সাহিত্যের ইতিহাসে অট্ঠকথা নামে পরিচিত। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে রচিত হলেও অট্ঠকথা পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয়, একটি স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত। অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি নানাবিধি বিষয়ও আলোচিত হয়। এজন্য অট্ঠকথা সাহিত্যকে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ইতিহাসের অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। এই অধ্যায়ে আমরা অট্ঠকথা সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * অট্ঠকথা-এর ধারণা ও রচনার পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
- * অট্ঠকথার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারব;
- * অট্ঠকথা রচয়িতাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ধারণা দিতে পারব;
- * অট্ঠকথার গুরুত্ব ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

অট্ঠকথা'র ধারণা ও রচনার পটভূমি

পালি 'অট্ঠকথা' শব্দটি 'অট্ঠ' এবং 'কথা' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'অট্ঠ' শব্দের দ্বারা 'অর্থ', 'কথা' শব্দের দ্বারা কথা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি নির্দেশ করে। অট্ঠকথাকে সংস্কৃতে 'অর্থকথা' বা 'ভাষ্য', ইংরেজিতে 'commentary' বলা হয়। অতএব অট্ঠকথা বলতে অর্থকথা, ভাষ্য, অর্থবর্ণনা, অর্থবাদ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি বোঝায়। সাধারণত যে গ্রন্থ শব্দের অর্থবর্ণনা বা ব্যাখ্যা করে তাকে অট্ঠকথা বলে। 'সারথাদীপনী' নামক গ্রন্থে অট্ঠকথা প্রসঙ্গে এরূপ বলা হয়েছে: অখো কথিযতি এতায়তি অট্ঠকথা অর্থাত অর্থ বর্ণনা করে বলেই অট্ঠকথা।

ত্রিপিটকে অনেক জটিল, দুর্বোধ্য, দ্ব্যর্থক ও উহ্য পদ বা বিষয় রয়েছে যা সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট সহজে বোধগম্য নয়। সেসব পদ বা বিষয়সমূহ সমার্থক বা প্রতিশব্দ, উদাহরণ, উপযামা, গল্প, ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্যে সহজ-সরলভাবে অট্ঠকথায় উপস্থাপন করা হয়। এভাবে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষায় যে-সাহিত্যকর্ম রচিত হয় তাকে অট্ঠকথা বলে।

দুঃখমুক্তির অমিয় বাণীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন ভারতবর্ষের নানাজাতি, নানা কুল এবং নানা শ্রেণীর অসংখ্য মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন বুদ্ধের সঙ্গে। বৌদ্ধসঙ্গে জ্ঞানী ভিক্ষু-ভিক্ষুণী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন স্বল্পজ্ঞানীও। ফলে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ সবার পক্ষে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হতো না। ফলস্বরূপ বুদ্ধের জীবিতকালেই তাঁর ধর্মোপদেশের বিভিন্ন বিষয় অর্থসহকারে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতো। সঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা ও নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিত। যেমন : কেউ বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও সঙ্গের নিদা করলে, সঙ্গের বিধিবিধান ভঙ্গ করলে, বুদ্ধবাণীর ভুল ব্যাখ্যা করলে, সংঘে অসুন্দর আচরণ করলে, ত্রোধোন্মুক্ত আলোচনা হলে, ধর্ম-দর্শনসংক্রান্ত

কোনো বিষয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক দেখা দিলে, বুদ্ধবাণীর কোনো বিষয় দুর্বোধ্য হলে ভিক্ষুসংঘ সমবেত হয়ে বিষয়সমূহ প্রতিকার বা সমাধানের চেষ্টা করতেন। এক্ষেত্রে কখনো বুদ্ধ, কখনোবা তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করতেন। ত্রিপিটকে এ সম্পর্কে বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন একদা পরিব্রাজক সুপ্রিয় এবং এক তরুণ বুদ্ধ শিষ্যের মধ্যে বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গ বিষয়ে কথোপকথন হচ্ছিল। একদিকে পরিব্রাজক সুপ্রিয় বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্গের নিন্দা করছিলেন। অপরদিকে তরুণ শিষ্য বুদ্ধের উচ্চ প্রসংশা করছিলেন। এতে ভিক্ষুগণ ইতস্তত বোধ করলে বুদ্ধ এ সম্পর্কে করণীয় ও অকরণীয় বিষয় ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা দীর্ঘনিকায়ের সীলক্ষনবংশে উল্লেখ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে দেখা যায়, একদা পরিব্রাজক পোতলিপুত্র নবীন ভিক্ষু সমিদ্ধিকে বুদ্ধবাণী ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন : “বন্ধু সমিদ্ধি ! সাক্ষাৎ শ্রমণ গৌতমকে আমি ঐরূপ বলতে শুনেছি : কায় কর্ম মিথ্যা (নিষ্ফল), বাককর্ম মিথ্যা, একমাত্র মনোকর্মই সত্য। আর সেই সমাপ্তি আছে যা লাভ করে ধ্যানী কিছুই অনুভব করেন না।” তখন ভিক্ষু সমিদ্ধি পরিব্রাজক পোতলিপুত্রকে বলেন, “বন্ধু পোতলিপুত্র ! ঐরূপ বলবেন না, ভগবানের অপবাদ ভালো নয়, ভগবান কখনো ঐরূপ বলবেন না।” ঐরূপ বলার পর পরিব্রাজক পোতলিপুত্র চলে গেলে ভিক্ষু সমিদ্ধি বিষয়টি আনন্দ থেরকে জ্ঞাত করেন। আনন্দ থের তা বুদ্ধকে পরিজ্ঞাত করেন। বুদ্ধ বিষয়টি সুস্পষ্ট করার নিমিত্তে উদাহরণ ও অর্থসহকারে কর্মের সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা প্রদান করেন, যা মহাকম্ববিভঙ্গ সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধসংঘ গঠনের প্রথমদিকে এভাবে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত প্রদানের মাধ্যমে সমস্যাসমূহ বুদ্ধ নিজেই সমাধান করতেন। কিন্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বৌদ্ধসংঘ বিস্তৃতিলাভ করলে তাঁর পক্ষে সকল সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হতো না। ইতিহাসগাঠে জানা যায়, বুদ্ধের ধর্মপ্রচার আরম্ভের কয়েক বছরের মধ্যেই প্রাচীন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বা শহর, যেমন : সারনাথ, রাজগ্রহ, বৈশালী, নালন্দা, পাবা, উজ্জয়নী, চম্পা, মথুরা, শ্রাবণ্তী প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধসংঘ গড়ে উঠে এবং উচ্চ স্থানগুলো বুদ্ধ ধর্ম ও দর্শনচর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিগত হয়। এসব স্থানে সবসময় বুদ্ধের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব ছিল না বিধায় কেন্দ্রসমূহ বুদ্ধের নেতৃস্থানীয় এক-একজন শিষ্যের নেতৃত্বে পরিচালিত হতে থাকে। এন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন : আনন্দ, মহাকশ্যপ, মহাকচ্ছায়ন, মহাকোট্টিত, সারিপুত্র এবং মোঞ্চলায়ন। বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁরা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যসহ সঙ্গ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সমস্যার সমাধান দিতেন। নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ বুদ্ধের দেশনাসমূহ ভিক্ষুদের অর্থসহকারে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধ অনেককে তাঁর ধর্মোপদেশ তথা ধর্মদর্শন যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম মনে করতেন। এক্ষেত্রে মহাকচ্ছায়ন, সারিপুত্র এবং মহাকোট্টিত থের ছিলেন অংশগণ। মহাকচ্ছায়ন বুদ্ধের সর্বক্ষণ্ট দেশনাসমূহ প্রাঞ্জল এবং সহজ-সরলভাবে শ্রোতাদের নিকট উপস্থাপন করতে পারদর্শী ছিলেন। ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় তিনি প্রভৃত খ্যাতি অর্জন করেন এবং বুদ্ধ মহাকচ্ছায়নকে ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় সর্বাঙ্গে স্থান দেন। তা ছাড়া, কেন্দ্রসমূহে ভিক্ষুদের মধ্যে ধর্ম-দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতো। নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ এসব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব নির্দেশনা ও ব্যাখ্যাদান করতেন তা বুদ্ধকে যথাসময়ে পরিজ্ঞাত করা হতো। বুদ্ধ নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের যেসব ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা সঠিক মনে করতেন তা অনুমোদন দান করতেন এবং ভিক্ষুদের গ্রহণ, ধারণ ও পালন করতে নির্দেশ দিতেন। প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী সংকলনের সময় এসব ব্যাখ্যাও অনুমোদন লাভ করে সংকলিত হয়েছিল, যা ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে পাওয়া যায়। বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যদের এসব ব্যাখ্যাকে অট্টকথার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যা পরবর্তীকালে সমৃদ্ধি লাভপূর্বক অট্টকথা রচনার পটভূমি তৈরি করে।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিন মাস পর অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধের ধর্মোপদেশসমূহ সংকলিত করা হয়। সংকলিত বুদ্ধবাণীসমূহ খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত ভিক্ষুগণ মুখস্ত করে মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। মুখের কথা নড়চড় হলে যে কোনো কথারই অর্থান্তর ঘটে। মুখে-মুখে প্রচারিত হওয়ায় সম্ভবত বুদ্ধবাণীরও অর্থান্তর ঘটেছিল। তা ছাড়া, কালের বিবর্তনে ও ব্যাখ্যার ভিন্নতার কারণে বুদ্ধবাণীর অনেক বিষয় দুর্বোধ্য ও বিতর্কিত হয়ে উঠেছিল। এসব কারণে বুদ্ধবাণী

যুগোপযোগীভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বোঝার সুবিধার্থে বুদ্ধবাণীর দুর্বোধ্য, দ্ব্যর্থক, উহ্য এবং জটিল বিষয়সমূহ পণ্ডিত ভিক্ষুগণ অর্থসহকারে ব্যাখ্যা করতেন। সম্ভবত, সেই অর্থ ও ব্যাখ্যাসমূহ সংকলিত হয়ে অট্ঠকথার রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এভাবে বুদ্ধবাণীর যুগোপযোগী এবং সহজ-সরল অর্থযুক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে যে-সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল তাই অট্ঠকথা নামে পরিচিতি লাভ করে। সাধারণত অট্ঠকথা বা ভাষ্য বলতে বোঝায় একজনের প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রাচীন পাঠের নতুন এবং যুগোপযোগী বোধগম্য অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা, যা মূল পাঠের যথোপযুক্ত অর্থ ও তাব যথাযথভাবে ধারণ করে রাখে। অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধবাণীর যথোপযুক্ত অর্থসহ ব্যাখ্যা প্রদান যায়। বিভিন্ন দার্শনিক নিকায়ের পণ্ডিত ভিক্ষুগণ স্থায় নিকায়ের আদর্শ ও দর্শনের ভিত্তিতে বুদ্ধবাণীর এসব অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করতেন। সেজন্য বিভিন্ন নামধারী অট্ঠকথার উল্লেখ পাওয়া যায়। এর থেকে বোঝা যায়, অট্ঠকথাসমূহ কোনো একক ব্যক্তি বা নিকায়ের রচনা নয়, বিভিন্ন নিকায় ও অঞ্চলের বিভিন্ন পণ্ডিতের ক্রমিক রচনার ফসল। এভাবে সংকলিত অট্ঠকথা তৃতীয় সঙ্গীতির পর মহিন্দ থের সিংহলে নিয়ে যান এবং সিংহলী ভাষায় রূপান্তর করে প্রচার করেন। সেখানে অট্ঠকথা সাহিত্য সিংহলি পণ্ডিতদের দ্বারা আরও সম্প্রদাই লাভ করে। শ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলরাজ রাজ বটগামণীর পৃষ্ঠপোষকতায় অট্ঠকথাসমূহ সিংহলি ভাষায় তালপত্রে লিখে সংরক্ষণ করা হয়। একারণে বলা যায়, শ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের আগেই অট্ঠকথা সাহিত্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। সিংহলের অনুরাধপুরার মহাবিহারে তালপত্রে লিখিত অট্ঠকথাসমূহ সংরক্ষিত ছিল। কালক্রমে তা সীহলটৃষ্ণকথা (সিংহলি অট্ঠকথা) নামে পরিচিতি লাভ করে। সীলটৃষ্ণকথাসমূহ মহা-অট্ঠকথা, মহাপচরি অট্ঠকথা, কুরুন্দি অট্ঠকথা, অন্ধক অট্ঠকথা, সংখেপ অট্ঠকথা ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। অট্ঠকথা রচনার সূচনা ভারতবর্ষে হলেও তা ভারতবর্ষে পাওয়া যেত না। ফলে ভারতীয় এবং অন্যান্য দেশের লোকেরা সহজে বুদ্ধবাণী বুঝতে পারত না। সে-কারণে শ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দিকে বুদ্ধযোগ্য, বুদ্ধদত্ত, ধর্মপাল, মহানাম এবং উপসেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিংহলে সিংহলি ভাষায় সংরক্ষিত সীহলটৃষ্ণকথা হতে পালি ভাষায় বর্তমান কালের অট্ঠকথাসমূহ রচনা করেন। এভাবে বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে অট্ঠকথাসমূহ বর্তমান কালের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

প্রথম দিকে অট্ঠকথাসমূহ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু তথা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন নিয়ে রচিত হলেও পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়েও নানা শ্রেণির অট্ঠকথা রচিত হয়। ফলে অট্ঠকথা বিশাল ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্যভাণ্ডারের রূপ লাভ করে।

বিষয়বস্তুর গতিপ্রকৃতি এবং গুরুত্ব বিচারে অট্ঠকথাকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :

ক. প্রথম শ্রেণির বা মৌলিক অট্ঠকথা : ত্রিপিটকের ধ্রুবসমূহের অট্ঠকথা এ-শ্রেণির অন্তর্গত।

খ. তৃতীয় শ্রেণির অট্ঠকথা : নেতৃত্বকরণ, মিলিন্দপঞ্চাঙ্গ, পেটকোপদেশ প্রভৃতি পিটকোত্তর

মৌলিক গ্রন্থের অট্ঠকথা এ-শ্রেণির অন্তর্গত।

গ. তৃতীয় শ্রেণির অট্ঠকথা : মহাবৎস, দীপবৎস, চূল্লবৎস, বৎসদীপনী প্রভৃতি ঐতিহাসিক বা

ঐতিহ্যমূলক গ্রন্থের অট্ঠকথা এ-শ্রেণির অন্তর্গত।

ঘ. চতুর্থ শ্রেণির অট্ঠকথা : বিনয় বিনচিষ্য, উত্তরবিনচিষ্য, রূপারূপবিভাগ প্রভৃতি টীকা এবং

অনুটীকা জাতীয় গ্রন্থের অট্ঠকথা এ-শ্রেণির অন্তর্গত।

অনুশীলনমূলক কাজ অট্ঠকথা বলতে কী বোঝা? বুদ্ধের নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের নামের একটি তালিকা তৈরি কর ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় পারদর্শী কয়েকজন বুদ্ধশিষ্যের নাম বল সীহলট্টকথাসমূহ কী কী নামে পরিচিত ছিল? বর্তমানকালের পালি অট্ঠকথাসমূহ কিসের ভিত্তিতে কারা রচনা করেছিলেন?

পাঠ : ২

সুন্ত পিটকের অট্ঠকথা পরিচিতি

সুন্ত পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা: দীর্ঘনিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদক নিকায়। প্রতিটি নিকায়ের স্বতন্ত্র অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। খুদক নিকায়ে ঘোলটি গ্রহ আছে। প্রথম চারটি নিকায়ের অট্ঠকথাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও খুদক নিকায়ের অনেকগুলো গ্রন্থের অট্ঠকথা একই নামে অভিহিত। যেমন, উদান, ইতিবুক্তক, বিমানবথু, পেতবথু, থেরগাথা, থেরিগাথা এবং চরিয়াপিটক – এই সাতটি গ্রন্থের অট্ঠকথা পরমথদীপনী নামে পরিচিত। অপরদিকে, মহানিদেস ও চুল্লানিদেস গ্রন্থের অট্ঠকথা সন্দর্ভপঞ্জোতিকা নামে অভিহিত। আচার্য উপসেন মহানিদেস ও চুল্লানিদেস গ্রন্থব্যয়ের অট্ঠকথা হিসেবে সন্দর্ভপঞ্জোতিকা রচনা করেন। তাই প্রথম চারটি নিকায়ের অট্ঠকথার নাম ও পরিচিতি আলাদাভাবে তুলে ধরা হলো।

মূল গ্রন্থ	অট্ঠকথার নাম	লেখক
দীর্ঘ নিকায়	সুমঙ্গলবিলাসিনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
মধ্যম নিকায়	পপঞ্চসূদনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
সংযুক্ত নিকায়	সারথপকাসনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
অঙ্গুত্তর নিকায়	মনোরথপূরণী	আচার্য বুদ্ধঘোষ

সুমঙ্গলবিলাসিনী : এটি দীর্ঘ নিকায়ের অট্ঠকথা। দাঠ থের'র অনুরোধে আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। গ্রন্থটি তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। যেমন : শীলক্ষণ বর্গ, মহাবর্গ এবং পথেয় বা পাটিক বর্গ। এতে বৌদ্ধধর্ম দর্শন, অর্হৎ, শ্রামণ্যধর্ম, বুদ্ধের জীবনাদর্শ এবং গৃহী বিনয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। বুদ্ধঘোষ গল্প, উপমা, প্রবচন, উদাহরণ প্রভৃতির মাধ্যমে দীর্ঘ নিকায়ের আলোচ্য বিষয় সবার নিকট সহজ-সরলভাবে হৃদয়গ্রাহী করে তোলে।

পপঞ্চসূদনী : এটি মধ্যম নিকায়ের অট্ঠকথা। বুদ্ধিমত্ত থের'র অনুরোধে আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটি তিন ভাগে বিভক্ত। ক. মূল পন্নাস, খ. মজ্জিম পন্নাস, এবং গ. উপরি পন্নাস। গ্রন্থটিতে ধর্মচক্র প্রবর্তন, নির্বাগ, পৃথিবী, তথাগত, অভিসমুদ্ধ, কুশল-অকুশল, মিথ্যাদৃষ্টি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, বিভিন্ন প্রকার পুঁজল (ব্যক্তি), জরা-ব্যাধি-মৃত্যু, অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম সম্পর্কে সুন্দর ধারণা পাওয়া যায়।

সারথপকাসনী : সংযুক্ত নিকায়ের অট্ঠকথা হলো সারথপকাসনী। আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটি জ্যোতিপাল থের-এর অনুরোধে রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা : ১. সগাথা বর্গ, ২. নিদান বর্গ, ৩. খন্দ বর্গ, ৪. ষড়ায়তন বর্গ ৫. মহাবর্গ। এটি পাঠে প্রাচীন ভারতের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে সন্ধান পাওয়া যায়।

মনোরথপূরণী : আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটি ভদ্রত থের-এর অনুরোধে রচনা করেছিলেন। এটি এগারোটি অধ্যায় বা নিপাতে বিভক্ত। এতে বুদ্ধের জীবন ও আদর্শ, বুদ্ধশিষ্যদের জীবন ও আদর্শ চিত্ত, চৈতসিক, বিমুক্তি, সম্যক দৃষ্টি, প্রজ্ঞা, সঙ্গবোধ্যঙ্গ, বুদ্ধেও বত্রিশ প্রকার লক্ষণ পঠিসম্মিদ্বা মার্গ, সন্দেহ, ইত্যাদি সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

খুন্দক নিকায়ের ঘোলটি গ্রন্থের অট্ঠকথার নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নিচে প্রদান করা হলো :

মূলগ্রন্থ	অট্ঠকথার নাম	লেখক
খুন্দকপাঠ	পরমথজোতিকা (১)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
ধর্মপদ	ধর্মপদট্ঠকথা	আচার্য বুদ্ধঘোষ
উদান	পরমথদীপনী (১)	আচার্য ধর্মপাল
ইতিবুত্তক	পরমথদীপনী (২)	আচার্য ধর্মপাল
সুন্তনিপাত	পরমথজোতিকা (২)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
বিমানবথু	পরমথদীপনী (৩)	আচার্য ধর্মপাল
পেতবথু	পরমথদীপনী (৪)	আচার্য ধর্মপাল
থেরগাথা	পরমথদীপনী (৫)	আচার্য ধর্মপাল
থেরীগাথা	পরমথদীপনী (৬)	আচার্য ধর্মপাল
জাতক	জাতকট্ঠকথা	আচার্য বুদ্ধঘোষ
মহানিদেস ও চূল্ণনিদেস	সন্দৰ্ভপঞ্জোতিকা	আচার্য উপসেন
পঠিসম্মিদামার্গ বা পঠিসম্মিদামগ্রন্থ	সন্দৰ্ভপঞ্জকসিনী	আচার্য মহানাম
অপাদান	বিসুন্ধজনবিলাসিনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
বুদ্ধবৎস	মধুরথবিলাসিনী	আচার্য বুদ্ধদত্ত
চরিয়া পিটক	পরমথদীপনী (৭)	আচার্য ধর্মপাল

পরমথজোতিকা (১) : খুন্দকপাঠ গ্রন্থের অট্ঠকথা পরমথজোতিকা (১) নামে পরিচিত। গ্রন্থটি খুন্দকপাঠট্ঠকথা নামেও অভিহিত। এ অট্ঠকথাটি আচার্য বুদ্ধঘোষ রচনা করেন। গ্রন্থটি ভিক্ষু শ্রমণদের আবশ্যিক পাঠ্য। এখানে ত্রিশরণ, পঞ্চশীল, দশশীল, কুমার প্রশংসন বত্রিশ প্রকার অঙ্গচি পদার্থ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

ধর্মপদট্ঠকথা : ইহা ধর্মপদ গ্রন্থের অট্ঠকথা। আচার্য বুদ্ধঘোষ এটি রচনা করেন। এতে ধর্মপদেও ৪২৩টি গাথারই অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। ধস্পপদট্ঠকথার প্রত্যেক গল্পকে গঠনপদ্ধতি অনুসারে আট ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এখানে শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, নির্বাণ, চিত্ত, পাপ-পুণ্য, কুশল-অকুশল, পঞ্চিত অর্হৎ জরা, আত্ম ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তা ছাড়াও প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, গল্প, রূপকথা প্রভৃতির কাহিনীতে গ্রন্থটি পরিপূর্ণ।

পরমথদীপনী (১) : এটি উদান গ্রন্থের অট্ঠকথা। গ্রন্থটি উদানট্ঠকথা নামেও পরিচিত। এ অট্ঠকথাটি আচার্য ধর্মপাল রচনা করেন। এ গ্রন্থে বুদ্ধের বোধিজ্ঞান লাভের পরের ঘটনা, মেঘিয় নামক স্থাবিরের কাহিনী, অষ্টবিধ অত্যাশ্চর্য ধর্ম, বুদ্ধের পরিনির্বাণের ঘটনা, চারি প্রকার স্মৃতি প্রস্থান, চারি প্রকার সম্যক প্রচেষ্টা, চারি প্রকার ঋক্ষিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, নির্বাণ ইত্যাদি বর্ণনা পাওয়া যায়।

পরমার্থদীপনী (২) : এটি ইতিবুক্তক নামক গ্রন্থের অট্ঠকথা। গ্রন্থটি ইতিবুক্তকট্টকথা নামেও অভিহিত। এ অট্ঠকথাটি আচার্য ধর্মপাল রচনা করেন। প্রত্যেকটির গল্প সহজ-সরল ভাষায় উপস্থাপিত। এখানে সৎ কর্ম, অসৎ কর্ম, কায়-বাক্য-মন সম্পর্কে ধারণা রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, দুর্মিতিপরায়ণ ও পাপী ব্যক্তি কখনো মুনি-ঝঃঘিদের সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। জ্ঞানী ব্যক্তি সবসময় জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্যে ধন্য হন। কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিরা সবসময় সৎ কাজে নিযুক্ত থাকে।

পরমার্থজোতিকা (২) : এটি সুন্ত পিটকের অন্তর্গত সুন্ত নিপাত গ্রন্থের অট্ঠকথা। সুন্তনিপাতট্টকথা নামেও গ্রন্থটি পরিচিত। এ অট্ঠকথাটি আচার্য বুদ্ধঘোষ রচনা করেন। রাগ-দেষ-মোহ, কুশল-অকুশল, স্মৃতি, ব্রহ্মলোক, উপোসথ, সকল্প, ধ্যান, প্রজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। শ্রাবণ্তী, কোশল, কপিলাবস্তু, বারাণসী এবং বিভিন্ন নদ-নদীর উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়াও বুদ্ধের সমসাময়িক প্রাচীন ভারতে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ আরও বহু আলোচনা এখানে দৃষ্ট হয়।

পরমার্থদীপনী (৩) : এটি বিমানবঞ্চ গ্রন্থের অট্ঠকথা। এটিকে বিমানবঞ্চ-অট্ঠকথাও বলা হয়। এ অট্ঠকথাটি আচার্য ধর্মপাল রচনা করেন। গ্রন্থটিতে স্বর্গ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। তাবতিংশ স্বর্গের অধিবাসী দেবতা, দেববিমান, স্বর্গের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নরক দুঃখ-যন্ত্রণা, পাপ-পুণ্য, পাপের পরিণাম প্রভৃতি চমৎকারভাবে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক গল্পের পাপ-পুণ্যের ধারণা রয়েছে।

পরমার্থদীপনী (৪) : এটি পেতবঞ্চ গ্রন্থের অট্ঠকথা। গ্রন্থটি পেতবঞ্চ-অট্ঠকথা নামেও পরিচিত। আচার্য ধর্মপাল গ্রন্থটি রচনা করেন। এতে প্রেতাত্মার কাহিনী অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। প্রেত লোকে কৃষি, বাণিজ্য, গো-রক্ষক, ক্রয়-বিক্রয় কিছুই নেই। ক্রন্দন শোক, পরিবেদন কোনোটির দ্বারা প্রেতাত্মাদের কোনো উপকারে আসে না। ক্রন্দন শোক পরিত্যক করে তাদের উদ্দেশ্য বুদ্ধ প্রদর্শিত পথে পুণ্যানোমোদন অনুষ্ঠান করার ধারণা এখানে দেওয়া হয়েছে।

পরমার্থদীপনী (৫) : এটি থেরগাথা গ্রন্থের অট্ঠকথা। গ্রন্থটিকে থেরগাথা-অট্ঠকথাও বলা হয়। আচার্য ধর্মপাল গ্রন্থটি রচনা করেন। এ-গ্রন্থে বুদ্ধের সমসাময়িক কালের বিখ্যাত স্তুবিরদের জীবনী রয়েছে। এ গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে কোনো প্রকার জাতিভেদ ছিল না। সকল শ্রেণির লোকের সঙ্গে প্রবেশাধিকার ছিল।

পরমার্থদীপনী (৬) : এটি থেরী গাথা গ্রন্থের অট্ঠকথা। গ্রন্থটিকে থেরীগাথা-অট্ঠকথাও বলা হয়। আচার্য ধর্মপাল গ্রন্থটি রচনা করেন। এ-গ্রন্থে থেরীদের ভাষিত রচিত গাথাসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের পরমার্থিক উন্নতিতে ভিক্ষুদের পাশাপাশি ভিক্ষুগীরাও সমানভাবে অবদান রাখতেন। সাধনার মাধ্যমে তাঁরা অর্হত্বে উপনীত হয়ে যে-গাথা ভাষণ করেছিলেন তাতে নৈতিক ও মানবিক জীবনগঠনের নির্দেশনা রয়েছে।

জাতকট্টকথা : জাতকের অট্ঠকথাকে ‘জাতকট্টকথা’ বলা হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটি রচনা করেন। জাতকট্টকথা মতে, জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি। জাতকে বুদ্ধের বিভিন্ন পূর্বজন্মের কাহিনী সুন্দরভাবে রচনা করা হয়েছে। এটি পাঠের মাধ্যমে যে-কেউ সংচরিত গঠনে সক্ষম হতে পারে।

সন্ধমপঞ্জোতিকা : এটি মহানিদেস এবং চুল্লনিদেস গ্রন্থের অট্ঠকথা। একে নিদেসট্টকথাও বলা হয়। আচার্য উপসেন দুটি গ্রন্থকে একত্রিত করে একটি অট্ঠকথা রচনা করেন। এখানে ক্ষম্ব, আয়তন, প্রতীত্যসমুৎপাদ, সম্যক প্রধান, ঝঃঝিপাদ, ইল্লিয়, মাগ ও মার্গফল, কাম, প্রকৃত মুনি, শিক্ষা, জ্ঞান, লোভ-দেষ-মোহ-ত্রঃঃ, মার, চারি প্রকার বস্তু বিভিন্ন প্রকার রোগ ধর্মে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে।

সন্দেশকাসিনী : এটি পটিসঞ্চিদা মার্গে অট্ঠকথা। গ্রহ্তি পটিসঞ্চিদামগৃগট্টকথা নামেও পরিচিত। আচার্য মহানাম গ্রহ্তি রচনা করেন। গ্রহ্তি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, চারি আর্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, কুশল কর্ম-অকুশল কর্ম, চারি সম্যক প্রচেষ্টা, আয়তন, সমাধি, শ্রামণ্যধর্মের প্রত্যেক ফল ও নির্বাণ-সম্পর্কিত আলোচনায় ভরপুর।

বিসুদ্ধজ্ঞবিলাসিনী : এটি অপদান গ্রন্থের অট্ঠকথা। একে অপদানট্টকথাও বলা হয়। গ্রহ্তি আচার্য বুদ্ধঘোষ রচনা করেন। এখানে বুদ্ধ সমকালীন শ্রা঵ক-শ্রা঵িকার জীবন চরিত গল্পের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এখানে চারি আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রতীত্যসমূৎপাদ মীতি, পঞ্চক্ষণ্ড প্রভৃতি ধর্মীয় ক্ষঙ্খের তুলনায় পূজা-অর্চনা, দান, বন্দনা সূত্র আবৃত্তি, উৎসব ও পার্বণের ব্যাখ্য সুন্দর করে বর্ণনা করা হয়েছে।

মধুরথবিলাসিনী : এটি বুদ্ধবৎশ নামক গ্রন্থের অট্ঠকথা। গ্রহ্তি বুদ্ধবৎশট্টকথা নামেও খ্যাত। আচার্য বুদ্ধদন্ত গ্রহ্তি রচনা করেন। এ-গ্রন্থে গৌতম বুদ্ধের পূর্ববর্তী বুদ্ধের ইতিকথা বর্ণিত হয়েছে। তা ছাড়া, গ্রহ্তিতে অতীত বুদ্ধগণের পৃথক পৃথক পরিচয় সহজ ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

পরমথদীপনী (৭) : এটি সুত পিটকের অন্তর্গত চরিয়া পিটক নামক গ্রন্থের অট্ঠকথা। গ্রহ্তিকে চরিয়া পিটকট্টকথাও বলা হয়। আচার্য ধর্মপাল গ্রহ্তি রচনা করেন। চরিয়া পিটকের গল্পগুলো জাতকে বর্ণিত গল্পের অনুরূপ। গৌতম বুদ্ধ কীভাবে তাঁর পূর্বজন্মে দশ পারমী পূর্ণ করে বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হন তার বিশদ বর্ণনা এখানে রয়েছে। এ সমস্ত গল্পে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের দান, শীল, অভিন্নক্রমণ, বীর্য, জ্ঞান, ক্ষাণ্তি, সত্যবাদিতা, অধিষ্ঠান মৈত্রী এবং উপেক্ষা বিষয়ে একটি পরিপূর্ণ ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

পরমথদীপনী কোন কোন গ্রন্থের অট্ঠকথা?

বুদ্ধঘোষ রচিত সুত পিটকের অট্ঠকথার একটি তালিকা প্রস্তুত কর

পাঠ : ৩

বিনয় পিটকের অট্ঠকথা পরিচিতি

বিনয় পিটক প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা : সুতবিভঙ্গ, খন্দক এবং পরিবার বা পরিবার পাঠ। বিনয়পিটকের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে দুটি অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। যথা : সমন্তপাসাদিকা এবং কজ্ঞাবিতরণী। সমন্তপাসাদিকা সমগ্র বিনয়পিটকের অট্ঠকথা হিসেবে পরিচিত। সুতবিভঙ্গ গ্রন্থে বর্ণিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় বিধানসমূহ “পাতিমোক্ষ” নামে পরিচিত। পাতিমোক্ষের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে কজ্ঞাবিতরণী বলে।

সমন্তপাসাদিকা : এটি বিনয় পিটকের অন্তর্গত মহাবর্গ এবং চূল্বৰ্গ নামক গ্রন্থের অট্ঠকথা। আচার্য বুদ্ধঘোষ এটি রচনা করেন। বিশেষত বৌদ্ধ ভিক্ষুদেও দৈনন্দিন জীবনচর্যা থেকে শুরু করে নৈতিক চরিত্র গঠনের বিধিবিধানসমূহ এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এখানে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সঙ্গীতি বিষয়ক আলোচনা, বৌদ্ধধর্মে প্রচার প্রসার, সন্ত্রাট অশোকের ভূমিকা, প্রীতি-সুখ ধ্যানের আলোচনাসহ সমাধি, প্রজ্ঞা, পটিসঞ্চিদা, চিত্ত, বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয় সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। তা ছাড়া প্রাচীন ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে গ্রহ্তি আলোচনায় ভরপুর।

কঞ্চাবিতরণী : আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি বিনয় পিটকের পাচিস্তিয়া এবং পারাজিকা কিংবা ভিক্ষু বিভঙ্গ এবং ভিক্ষুণী বিভঙ্গ নামক গ্রন্থের অট্ঠকথা। এটাকে পাতিমোক্খ-এর অট্ঠকথাও বলা হয়। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ২২৭টি শীলের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। এ ছাড়া এতে বৌদ্ধ বিনয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ
কঞ্চাবিতরণী গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় কী? বল।

পাঠ : ৪

অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথা পরিচিতি

অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। যথা : ধমসঙ্গণি, বিভঙ্গ, ধাতুকথা, পুঁগলপঞ্চঞ্চত্তি, কথাবথু, যমক এবং পট্ঠান। অভিধর্ম পিটকের প্রতিটি গ্রন্থের অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। ধমসঙ্গণি এবং বিভঙ্গের অট্ঠকথা ছাড়া অভিধর্মপিটকের অন্যান্য পাঁচটি গ্রন্থের অট্ঠকথা পঞ্চপকরণট্ঠকথা নামে পরিচিত। অভিধর্ম বৌদ্ধদর্শন হিসেবে খ্যাত। অভিধর্ম পিটকের বিষয়বস্তু জটিল।

অভিধর্মপিটকের অট্ঠকথায় বৌদ্ধধর্মের গভীর দার্শনিক বিষয়সমূহ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নে অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথাসমূহের নাম ও পরিচিতি তুলে ধরা হলো :

মূলবই	অট্ঠকথার নাম	অট্ঠকথার লেখক
ধমসঙ্গণি	অথসালিনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
বিভঙ্গ	সম্মোহিনোদনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
ধাতুকথা	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (১)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
পুঁগলপঞ্চঞ্চত্তি	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (২)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
কথাবথু	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৩)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
যমক	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৪)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
পট্ঠান	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৫)	আচার্য বুদ্ধঘোষ

অথসালিনী : এটি অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত ধমসঙ্গণি'র অট্ঠকথা। ধমসঙ্গণির দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ গল্প ও উপমার মাধ্যমে এ-গ্রন্থে সরলভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে। গ্রন্থটি চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বৌদ্ধদর্শনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন— চিত্ত-চৈতন্যিক, নাম-রূপ, আজ্ঞা-অনাজ্ঞা, শাশ্঵ত-অশাশ্বত, আমিত্ববোধ, পঞ্চক্ষক্ষ, ষড়ভিজ্ঞা, পাতিসম্মিদ্বা প্রভৃতি এ-গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে।

সম্মোহিনোদনী : এটি বিভঙ্গের অট্ঠকথা। গ্রন্থটি আঠারো অধ্যায়ে রচিত। আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে ক্ষম্ব, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, স্মৃতিপ্রস্থান, সম্যক প্রধান, ঝদ্বিপাদ, সংগৃহোজ্ঞ, সংজ্ঞা, ধ্যান, শিক্ষাপদ, ব্রহ্মবিহার, পাতিসম্মিদ্বা, জ্ঞান, চারি আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি, নাম-রূপ, অবিদ্যা, জাতি-জন্ম-মরণ-ব্যাধি প্রভৃতি সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চপকরণট্টকথা (১) : এটি অভিধর্ম পিটকের অন্তর্গত ‘ধাতুকথা’ নামক গ্রন্থের আট্টকথা। একে ধাতুকথা-আট্টকথাও বলা হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থটিতে পঞ্চক্ষণ, বার প্রকার আয়তন এবং ষোল প্রকার ধাতু সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা দ্রষ্ট হয়।

পঞ্চপকরণট্টকথা (২) : এটি পুঁজলপঞ্জ্ঞানি গ্রন্থের আট্টকথা। গ্রন্থটি পুঁজলপঞ্জ্ঞানি-আট্টকথা নামেও পরিচিত। গ্রন্থটিতে উদাহরণ এবং উপমার সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার পুঁজল বা ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

পঞ্চপকরণট্টকথা (৩) : এটি কথাবথু নামক গ্রন্থের আট্টকথা। একে কথাবথু-আট্টকথাও বলা হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটি রচনা করেন। এখানে পার্থিব ও পারমার্থিক সত্য, দশ প্রকার ইন্দ্রিয়, আট প্রকার সমাস্পত্তি, বিমুক্তি, ত্রিবিদ্যা, ষড়াভিজ্ঞা প্রভৃতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা হয়।

পঞ্চপকরণট্টকথা (৪) : এটি অভিধর্ম পিটকের যমক গ্রন্থের আট্টকথা। গ্রন্থটিকে যমকট্টকথাও বলা হয়। আচার্য বুদ্ধঘোষ গ্রন্থটি রচনা করেন। এ-গ্রন্থে মূল যমক, ক্ষম্ব যমক, আয়তন যমক, ধাতু যমক, সত্য যমক, সংক্ষার যমক, অনুস্সয় যমক, চিত্ত যমক, ধর্ম যমক এবং ইন্দ্রিয় যমক প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়।

পঞ্চপকরণট্টকথা (৫) : এটি অভিধর্ম পিটকের ‘পট্টান’ গ্রন্থের আট্টকথা। গ্রন্থটি পট্টানট্টকথা নামেও পরিচিত। গ্রন্থটি আচার্য বুদ্ধঘোষ রচনা করেন। গ্রন্থটিতে চবিশ প্রকার হেতু প্রত্যয় সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কোন কোন গ্রন্থের আট্টকথা পঞ্চপকরণট্টকথা নামে পরিচিত?

পাঠ : ৫

আট্টকথাচার্য বুদ্ধদত্ত

আট্টকথা রচনাকারীদের মধ্যে বুদ্ধঘোষের সমকালীন অপর কালজয়ী আট্টকথা রচয়িতা হচ্ছেন বুদ্ধদত্ত। কিন্তু এই কালজয়ী লেখক তাঁর অমর সাহিত্যকর্মে নিজেকে প্রকাশ করেননি। তা ছাড়া, বুদ্ধঘোষের জীবনী পাওয়া গেলেও বুদ্ধদত্তের জীবনী পাওয়া যায় না। ফলে এই মহান লেখকের জন্ম, বাল্যকাল, দীক্ষা, শিক্ষা ও জীবনচর্যা প্রভৃতি কুয়াশাচ্ছন্ন। এই অনুচ্ছেদে প্রথ্যাত আট্টকথা রচয়িতা বুদ্ধদত্ত সম্পর্কে পাঠ করব।

জন্মস্থান ও সময়কাল :

গন্ধবৎস গ্রহে বুদ্ধদত্তকে ভারতের আচার্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বিনয় বিনিচ্ছয় ও উত্তর বিনিচ্ছয় গ্রন্থে তাঁকে উরগপুর নিবাসী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিনয় বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি তিনি চোল রাজ্যের ভূতমঙ্গল থামে বিষ্ণুদাসের আরামে রাজা আচ্যুত বিক্রমের সময়কালে রচনা করেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। অভিধমাবতার গ্রন্থ মতে, উরগপুর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পঞ্চিংগ একমত যে, উরগপুর ছিল বর্তমান কালের দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপোলির নিকটবর্তী উরায়ুর স্থানটির প্রাচীন নাম। তিনি শ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ হতে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

বুদ্ধঘোষপ্রক্ষিতি এবং বিনয় বিনিচ্ছয় টীকা গ্রন্থ মতে, বুদ্ধঘোষ এবং বুদ্ধদত্ত সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধঘোষপ্রক্ষিতি গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, বুদ্ধদত্ত যেদিন সিংহল থেকে জন্মগ্রীপে ফিরে আসার জন্য রওনা দিয়েছিলেন সেদিন বুদ্ধঘোষও অট্ঠকথা রচনা করার জন্য সিংহলে যাত্রা করেন। উভয়ের জাহাজ মাঝপথে ধাক্কা লেগে থেমে যায়। তখন বুদ্ধদত্ত বুদ্ধঘোষকে ‘আবুসো’ সম্মেধন করে কোথায় এবং কী উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন তা জিজ্ঞাসা করেন। উভরে বুদ্ধঘোষ বলেন, আমি বুদ্ধবচন সিংহলি হতে মাগধী ভাষায় অনুবাদ করার জন্য যাচ্ছি। বুদ্ধদত্ত বলেন, আমিও বুদ্ধবাণী মাগধী ভাষায় লেখার জন্য সিংহলে গিয়েছিলাম। আমি কেবল জিমালংকার, দণ্ডবৎস, ধাতুবৎস এবং বোধিবৎস রচনা সম্পন্ন করেছি। অট্ঠকথা ও টীকা রচনা করতে পারিনি। যদি বুদ্ধবচন সিংহলি হতে মাগধী ভাষায় অনুবাদ করতে ইচ্ছুক হন তাহলে প্রথমে অট্ঠকথা ও টীকা রচনা করবেন। এরপ বলে তিনি বুদ্ধঘোষকে উৎসাহিত করেন। বুদ্ধঘোষকে ‘আবুসো’ বলে সম্মেধন করায় কোনো কোনো পগ্নিত বুদ্ধদত্তকে বয়েজঢ়ি মনে করেন। বুদ্ধঘোষপ্রক্ষিতি এবং বিনয় বিনিচ্ছয় বুদ্ধদত্তের অনেক পরে রচিত। তা ছাড়া, বুদ্ধঘোষ ও বুদ্ধদত্তের প্রত্ত্বের মধ্যে সাক্ষাতের বিষয়টি পোওয়া যায় না ফলে পগ্নিতগণ উভয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন। তবে সময়কাল বিচারে বুদ্ধদত্ত এবং বুদ্ধঘোষ সমসাময়িক ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা বা প্রবৃজ্যা লাভ :

বুদ্ধদত্তের দীক্ষা সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু জানা যায় না। অভিধম্মাবতার এবং রূপারূপবিভাগ গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি সিংহলের মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী ভিক্ষুর নিকট প্রবৃজিত হন। মহাবিহার নিকায়ের নিয়ম অনুযায়ী তিনি ভিক্ষুদের নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষা লাভ করে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি আজীবন নিকায়ের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন গুরুর নিকট এবং কোন বিহারে দীক্ষিত হয়েছিলেন সে-সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

কবি ও অন্যান্য কীর্তি :

বুদ্ধদত্তের মূল পরিচয় তিনি একজন বৌদ্ধভিক্ষু এবং অট্ঠকথা রচয়িতা বা ভাষ্যকার। আচার্য হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। সমকালীন পগ্নিতদের নিকট তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পগ্নিতগণ তাঁর রচিত গ্রন্থ প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। তিনি সমথ এবং বিদর্শন ভাবনায়ও পরদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনচর্চায় পারদর্শী এ মহাপুরুষ কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

বুদ্ধদত্তের অধিকাংশ গ্রন্থ পদ্যে রচিত। যেমন, বিনয় বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৩১৮৩টি গাথায়, উভর বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৯৬৯টি গাথায় এবং অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি ১৪১৫টি গাথায় রচিত। অসীম কবিত্বশক্তির অধিকারী না হলে সহজ-সরলভাবে পদ্য বা গাথায় বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতেন না। তিনি মহাভাষ্যকার নামেও অভিহিত হতেন।

সাহিত্যকর্ম :

প্রাচীনকালের লেখকগণ প্রত্ত্বের মধ্যে নাম ও নিজের সম্পর্কে কিছুই লিখতেন না। বুদ্ধদত্তও তাই করেছেন। তাই বুদ্ধদত্তের সাহিত্যকর্ম নিয়ে পগ্নিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহ্য অনুসারে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বুদ্ধদত্ত রচনা করেন :

১. মধুরথ বিলসিনী (বুদ্ধবৎস্টীকথা)

২. বিনয়বিনিচ্ছয়

৩. উভরবিনিচ্ছয়

৪. অভিধম্মাবতার

৫. রূপারূপবিভাগ

৬. জিনলংকার

৭. দন্তবৎস বা দাঠাবৎস

৮. ধাতবৎস

৯. বোধিবৎস

উপরের বর্ণিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিনয় বিনিচ্ছয়, উত্তর বিনিচ্ছয়, অভিধম্মাবতার, রূপারূপবিভাগ এবং মধুরথবিলাসিনী-এই পাঁচটি গ্রন্থ বুদ্ধদত্তের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করেন। বাকি গ্রন্থগুলো নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। তিনি বিনয় বিনিচ্ছয়, মধুরথবিলাসিনী এবং অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যে রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

মৃত্যু :

বুদ্ধঘোষের মৃত্যু সম্পর্কে তেমন কিছুই জানা যায় না। বুদ্ধঘোসুপ্তি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই মৃত্যু বরণ করেন। কিন্তু মৃত্যুর কারণ ও স্থান সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি যেহেতু দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতেই তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন, সেহেতু ধারণা করা হয় দক্ষিণ ভারতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধদত্তের জন্মস্থান কোথায়?

কবি হিসেবে বুদ্ধদত্তের মূল্যায়ন কর

ঐতিহ্য অনুসারে বুদ্ধদত্ত রচিত গ্রন্থের তালিকা তৈরি করে তাঁর প্রকৃত রচনাসমূহ চিহ্নিত কর

পাঠ : ৬

অট্টকথাচার্য ধর্মপাল

ধর্মপাল সুপ্রসিদ্ধ অট্টকথাচার্য ছিলেন। বুদ্ধঘোষের পরেই ছিল তাঁর স্থান। অট্টকথা, টীকা এবং অনুটীকা লিখে তিনি পালিসাহিত্য ভাষারকে নানা আঙিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অমর সাহিত্যকর্ম রচনা করার জন্য বৌদ্ধগণ এখনও তাঁকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করে। কিন্তু অসীম প্রতিভার অধিকারী এই মহান লেখকের জীবন সম্পর্কে খুব সামান্যই জানা যায়।

জন্মস্থান ও সময়কাল :

গন্ধবৎস গ্রন্থে ধর্মপালকে জন্মদীপ তথা ভারতের আচার্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে তাঁর জন্মস্থানের উল্লেখ নেই। সামনবৎস গ্রন্থ মতে, তিনি সিংহলের নিকটবর্তী দমিল রাজ্যের পদরত্নিথের অধিবাসী ছিলেন।

নেতৃত্বকরণ ঘট্টের অট্ঠকথা মতে, তিনি বদরিথ বিহারের নিবাসী ছিলেন। পঞ্চিতগণ ‘পদরতিথ’ এবং ‘বদরিথ’ অভিন্ন স্থান বলে মনে করেন। হিউয়েন সাং-এর মতে, ধর্মপাল কাঞ্চিপুরায় জন্মগ্রহণ করেন। এ-স্থানটি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ শহর হতে ৪৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বর্তমানকালের কঞ্জেবরণ শহর হিসেবে চিহ্নিত করেন। অপরদিকে পঞ্চিতগণ, ‘পদরতিথ’ বা ‘বদরিথ’ স্থানটি দক্ষিণ ভারতের নাগপট্টনে অবস্থিত বলে অভিমত পোষণ করেন। নাগপট্টন দক্ষিণ ভারতের তেনজোর জেলায় অবস্থিত এবং জন্মসূত্রে তিনি তামিল ছিলেন। বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া গেলেও তিনি ‘পদরতিথ’ বা ‘বদরিথ’ স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কারণ তাঁর রচিত গ্রন্থ এ-বিষয়টি সমর্থন করে। তাঁর জন্মস্থান হিসেবে যেসব স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া সেসব স্থান দক্ষিণ ভারতেই অবস্থিত ছিল। সম্ভবত, স্থানটি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তাই তাঁর জন্মস্থান হিসেবে বিভিন্ন স্থানের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। পঞ্চিতগণ একমত যে, দক্ষিণ ভারততই ছিল ধর্মপালের জন্মস্থান। তিনি খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

বাল্যকাল ও দীক্ষা :

ধর্মপালের বাল্যকাল ও দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :

‘ধর্মপাল কাঞ্চিপুরায় জন্মগ্রহণ করেন। বালক বয়সেই তিনি সুন্দর ও সৎ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন, যা তাঁর সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। বয়োঝোঞ্চ হলে সে-রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা পাকা হয়। বিবাহের পূর্বরাত্রে তাঁর মনে দুঃখময় ভাবাবেগ উদয় হয়। তিনি বুদ্ধমূর্তির সামনে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। এক দেবতা এসে তাঁকে সেখান থেকে অনেক দূরের এক পর্বতের বিহারে নিয়ে যান। সেই বিহারের ভিক্ষুগণ তাঁকে দীক্ষা দান করেন। ধর্মপালের ঘট্টে বা অন্য কোনো ঘট্টে এ-বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে বিষয়টি কতটুকু সত্য তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। তাঁর রচিত নেতৃত্বকরণ গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতের ‘পদরতিথ’ বা ‘বদরিথ’ বিহারে বসবাস করতেন। ফলে ধারণা করা হয় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতে দীক্ষা বা প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলেন। তবে তাঁর দীক্ষাগুরুর নাম জানা যায় না। তিনি মহাবিহার নিকায়ের তথ্যের আলোকে তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। ফলে তিনি মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী বা থেরবাদী ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

আচার্য বুদ্ধঘোষ এবং আচার্য ধর্মপাল

বুদ্ধঘোষ এবং ধর্মপাল দুজনেই রচনারীতি অভিন্ন। শব্দ ও উপযাপ্তিযোগ, বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা এবং ভাষাশৈলীতে উভয়ে একই রীতি অনুসরণ করেছেন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে উভয়ের ব্যাখ্যা প্রায় একই। ফলে ধারণা করা হয় যে, তাঁরা একই বিদ্যানিকেতনে অধ্যয়ন করেছেন। বুদ্ধঘোষ সুস্ত পিটকের প্রথম চারটি নিকায়ের উপর অট্ঠকথা রচনা করেছেন। অপরদিকে ধর্মপাল পঞ্চম নিকায় বা খুদক নিকায়ের উপর অট্ঠকথা রচনা করেন। সুস্তপিটকের প্রথম চারি নিকায়ের অট্ঠকথাসমূহ তাঁর আগে রচিত হওয়ায় তিনি শেষ নিকায়ের অট্ঠকথা রচনা করেন। এ-কারণে ধারণা করা হয় যে, বুদ্ধঘোষ ধর্মপালের পূর্ববর্তী ছিলেন।

ধর্মপালের সাহিত্যকর্ম :

‘গন্ধবৎস’ নামক ঘট্টে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো ধর্মপালের রচনা বলে উল্লেখ রয়েছে।

ক) অট্ঠকথা গ্রন্থসমূহ

১. নেতিপকরণট্ঠকথা - নেতিপকরণ গ্রন্থের অট্ঠকথা
২. ইতিবুন্তকট্ঠকথা - ইতিবুন্তক গ্রন্থের অট্ঠকথা
৩. উদানট্ঠকথা - উদান গ্রন্থের অট্ঠকথা
৪. চরিয়পিটকট্ঠকথা - চরিয়পিটক গ্রন্থের অট্ঠকথা
৫. খেরগাথাট্ঠকথা - খেরগাথা গ্রন্থের অট্ঠকথা
৬. খেরীগাথাট্ঠকথা - খেরীগাথা গ্রন্থের অট্ঠকথা
৭. বিমলবিলাসিনী - বিমানবথু গ্রন্থে অট্ঠকথা
৮. বিমলবিলাসিনী - পেতবথু নামক গ্রন্থের অট্ঠকথা

নেতিপকরণট্ঠকথা ব্যতীত বাকী ৭টি গ্রন্থ পরমথদীপনী নামে পরিচিত।

খ) টীকাগ্রন্থসমূহ

১. পরমথমঙ্গুসা - বিসুদ্ধিমঞ্জ গ্রন্থের টীকা
২. লীনথপকাসিনী - দীঘনিকায়ট্ঠকথাদীনং চতুর্বং অট্ঠকথা টীকা
৩. লীনথপকাসিনী - জাতকট্ঠকথার টীকা
৪. নেতিখকথা টীকা - নেতিট্ঠকথার টীকা
৫. পরমথদীপনী - বুদ্ধবৎস্ত্রকথার টীকা
৬. লীনথবগ্না - অভিমট্ঠকথার টীকা-অনুটীকা

উপরে বর্ণিত ১৪টি গ্রন্থ ধর্মপালের রচনা হিসেবে উল্লেখ পাওয়া গেলেও পঙ্গিতগণ এ-বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। অট্ঠকথাসমূহের মধ্যে ইতিবুন্তকট্ঠকথা, উদানট্ঠকথা, চরিয়পিটকট্ঠকথা, খেরগাথাট্ঠকথা, খেরীগাথাট্ঠকথা, বিমলবিলাসিনী (বিমান বথুর অট্ঠকথা) এবং বিমলবিলাসিনী পেতবথুর অট্ঠকথা — অর্থাৎ পরমথদীপনী নামে পরিচিত এ-সাতটি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ আছে যে, গ্রন্থসমূহ ধর্মপাল রচনা করেন। ফলে এ-সাতটি গ্রন্থ পঙ্গিতগণ ধর্মপালের রচনা হিসেবে স্বীকার করেন। কিন্তু সাসনবৎসে অট্ঠকথাসমূহ ধর্মপালের রচনা হিসেবে স্বীকার করা হলেও টীকাগ্রন্থগুলো ধর্মপালের রচনা হিসেবে স্বীকার করা হয়নি।

ধর্মপালের মৃত্যু

ধর্মপালের মৃত্যু সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি যেহেতু দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন সেহেতু দক্ষিণ ভারতেই তাঁর মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক। তাই তিনি দক্ষিণ ভারতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল কথন কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল রচিত গ্রন্থের একটি তালিকা তৈরি কর।

পাঠ : ৭

অট্ঠকথার গুরুত্ব

ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু অট্ঠকথা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও এতে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই অট্ঠকথাকে প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। অট্ঠকথাসমূহে সাধারণত ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে অট্ঠকথার সাহায্যে সহজে এবং যথাযথভাবে বুদ্ধবাণী বোঝা যায়। তা ছাড়া, কালের বিবর্তনে বা অন্য কোনো কারণবশত ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুতে সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে কি না তা সহজে নির্ণয় করা যায়। ত্রিপিটক অনুবাদের ক্ষেত্রেও অট্ঠকথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপিটকে বহু দুর্বোধ্য এবং জটিল বিষয় রয়েছে, যা অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপিটকের অনেক শব্দ দুর্বোধ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু অট্ঠকথায় সেসব জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ-কারণে অট্ঠকথার সাহায্যে যথাযথভাবে ত্রিপিটক এবং পালি সাহিত্য অনুবাদ করা যায়।

অট্ঠকথায় ত্রিপিটকের পরে রচিত অনেক গ্রন্থের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। ফলে পালি সাহিত্যভাণ্ডারে গ্রন্থসমূহের রচনাকাল সম্পর্কে যে বিতর্ক লক্ষ করা যায়, তা অট্ঠকথার সাহায্যে সমাধান করা যায়। অট্ঠকথা পাঠ করে বুদ্ধের সময়কাল থেকে প্রিষ্ঠীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এর সাহায্যে প্রাচীন রাজন্যবর্গের রাজত্বকাল এবং জীবন-দর্শন নিয়ে প্রচলিত বিতর্ক বা সমস্যা সমাধান করা যায়। অট্ঠকথার পরবর্তীকালে বুদ্ধের জীবন-চরিত, ধর্ম-দর্শন, বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার এবং বৌদ্ধ সঙ্গের ইতিহাস নিয়ে পালি ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অট্ঠকথার সাহায্যে সেসব গ্রন্থে বর্ণিত তথ্যের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয় করা যায়। বাক্যাংশের উদ্ধৃতি দেওয়া আধুনিক অভিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অট্ঠকথায় উদ্ধৃতিসহ প্রচুর শব্দার্থ পাওয়া যায়। অট্ঠকথার শব্দার্থের সাহায্যে আধুনিক অভিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। অট্ঠকথা সাহিত্য পালি ভাষায় রচিত। পালি এক ধরনের প্রাকৃত, যা মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা হতে উদ্ভৃত। ত্রিপিটক রচনার মধ্য দিয়ে পালি ভাষা সাহিত্যিক ভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। পালি ভাষা দুহাজারেরও অধিক বছরের ইতিহাস ধারণ করে আছে। অট্ঠকথায় সম্মুখ ভাষাশৈলী ব্যবহৃত হয়েছে। অট্ঠকথা সাহিত্যের ভাষাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ভাষাতাত্ত্বিক বিশেষণের মাধ্যমে অন্যান্য পালি সাহিত্যের ভাষা ও রচনাশৈলীর প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়। তা ছাড়া পালি ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসও জানা সম্ভব। এ-কারণে বলা যায়, ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় অট্ঠকথার সাহিত্যের গুরুত্ব সমধিক।

অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধের সময়কালে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় সংঘ ও ধর্মমত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যা বুদ্ধের সময়কালে প্রচলিত ধর্মমতের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। অট্ঠকথা সাহিত্যে প্রাচীন ভারতের নৃতাত্ত্বিক বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। বিশেষত লোককাহিনীর সাহায্যে শাক্য, কোলীয়, মল্ল, লিচ্ছবি প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তা খুবই চিন্তাকর্ষক। অট্ঠকথা সাহিত্যে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়, যা প্রাচীনকালের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় খুবই প্রয়োজনীয়। অট্ঠকথায় শাক্য, লিচ্ছবি, কোলীয়, বজ্জি, মল্ল প্রভৃতি জাতি এবং কাশি, কোসল, মল্ল, পাবা, অঙ্গ, মগধ, গাঙ্কার, কঘোজ প্রভৃতি রাজ্য সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এসব জাতি এবং রাজ্যসমূহ প্রাচীন ভারতবর্গের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। অট্ঠকথা সাহিত্যে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কেও প্রচুর তথ্য পাওয়া যায়। অট্ঠকথা পাঠে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কায় সমাজ ব্যবস্থায় জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং জনগণ জাতি ও কর্মানুসারে জেটবন্ধভাবে বসবাস করতেন। যে-জাতি বা কর্মের মানুষ যে ধারে বসবাস করতেন সে-ধারে এবং রাস্তাঘাট সে জাতির নামানুসারে পরিচিতি লাভ করত। যেমন, ব্রাহ্মণগ্রাম, চণ্ডালগ্রাম, কর্মকারগ্রাম, কৈবর্তগ্রাম রজকবীঘি, পেসকারবীঘি ইত্যাদি। উপরের বর্ণনা হতে ধারণা করা যায় যে, পালি অট্ঠকথা সাহিত্য শুধু বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনই নয়,

অধিকন্তু প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার সাধারণ ইতিহাসও ধারণ করে আছে। তাই বলা যায়, প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল, প্রভৃতির ইতিহাস জানার জন্য পালি অট্ঠকথা সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

অট্ঠকথাকে কেন প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়?

অট্ঠকথায় কোন কোন দেশের তথ্য পাওয়া যায়?

প্রাচীনকালে গ্রাম ও রাষ্ট্রাঘাটের নামকরণ কীভাবে করা হতো?

অনুশীলনী

শূল্যস্থান পূরণ কর :

১. বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যা মূলক পালি ভাষার যে সাহিত্য কর্ম রচিত হয় তাকে বলে।
২. সংযুক্ত নিকায়ের অট্টকথা হলো।
৩. সমকালীন তিনি শুন্দার পাত্র ছিলেন।
৪. গন্ধবৎস গ্রন্থে বুদ্ধ দণ্ডকে ভারতের হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।
৫. ধর্মপাল জন্য গ্রহণ করেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. অট্টকথা শব্দের অর্থ বল।
২. অট্টকথা কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?
৩. পঞ্চনিকায়ের অট্টকথা ও অট্টকথা রচয়িতার নাম লেখ।
৪. অভিধর্ম পিটকের অট্টকথাগুলোর নাম লেখ।
৫. ধর্মপাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

রচনমূলক প্রশ্ন :

১. অট্টকথা রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা কর।
২. সুন্ত ও অভিধম্ম পিটকের অট্টকথা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দাও।
৩. অট্টকথাচার্য বুদ্ধদণ্ডের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে তুমি যা জান লেখ।
৪. অট্টকথাচার্য ধর্মপালের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- ১। ‘অট্ট’ শব্দের বাংলা কী ?

ক. অতীত

খ. অর্থ

গ. অষ্ট

ঘ. অংশ

২। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা পরিলক্ষিত হয় না, কারণ—

- i ধর্মপালন সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল
- ii তাঁদের সঙ্গে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল
- iii সকল সুযোগ-সুবিধা একই ছিল

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রমেশ তালুকদার ত্রিপিটকের একটি গ্রন্থ পড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় শীলের ব্যাখ্যা জানতে পারেন। যাতে ভিক্ষুরা দৈনন্দিন জীবনচর্চা থেকে শুরু করে নৈতিক চরিত্র গঠনের নিয়মসমূহ নিহিত ছিল।

৩। রমেশ তালুকদারের পঠিত বিষয়গুলো কোন গ্রন্থে নিহিত ?

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ক. পরিবার পাঠ্য | খ. খন্দক |
| গ. সুও বিভঙ্গ | ঘ. ভিক্ষুণী বিভঙ্গ |

৪। উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে জানা যায় —

- i ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিধিবিধান
- ii বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা
- iii ত্রিপিটকের পরিচিতি

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১।



- ক. গুরুর বিচারে অট্ঠকথাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয় ?
- খ. অট্ঠকথা বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর ।
- গ. ‘?’ চিহ্নিত স্থানে পাঠ্য বইয়ের অট্ঠকথাচার্য কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. “উক্ত আচার্য বৌদ্ধ ধর্মের সাহিত্যকর্মে অশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন” – তুমি কি এ বঙ্গবেয়ের সাথে একমত ? যুক্তিসহকারে বিশ্লেষণ কর ।

২।

অমল চাকমা একজন গ্রন্থপ্রণেতা । গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেন । তাঁর সাহিত্যকর্মের অবদান অনন্ধীকার্য । কিন্তু সংসারধর্ম পালনে উদাসীন হওয়ায় তিনি গভীর সাধনা করে প্রবৃজ্জা জীবন গ্রহণ করেন ।

- ক. কঞ্চাবিতরণী গ্রন্থটি কে রচনা করেন ।
- খ. বৌদ্ধধর্মে অট্ঠকথার গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর ।
- গ. অমল চাকমার সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের কার কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত পাওয়া যায় – ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. উক্ত আচার্যের প্রবৃজ্জা লাভের কাহিনীটি ধর্মীয় আলোকে মূল্যায়ন কর ।

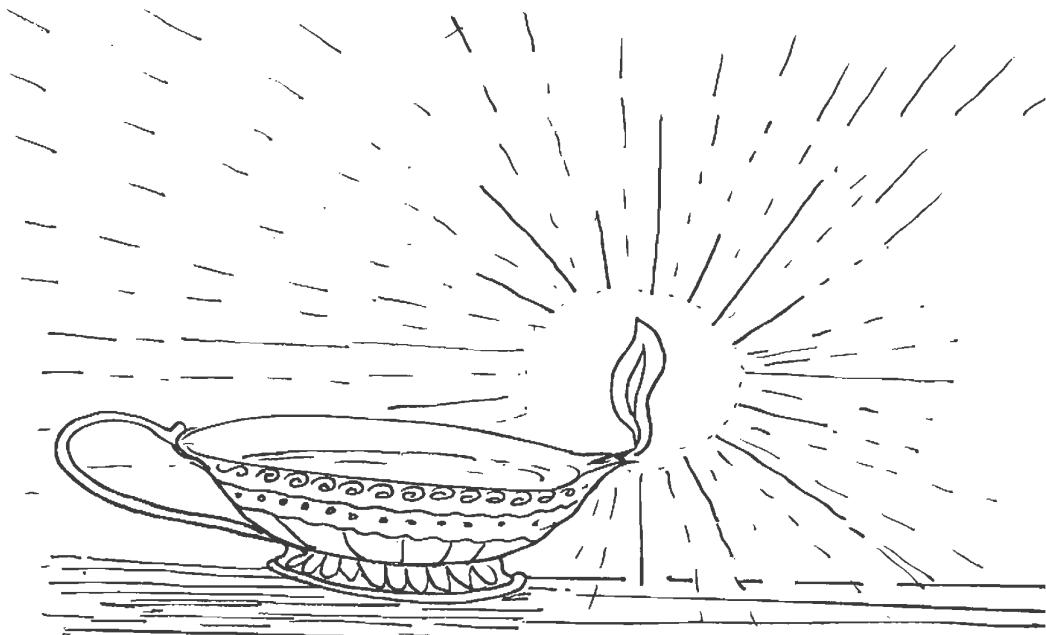
সপ্তম অধ্যায়

নির্বাণ

জীবের জীবন জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং কার্যকারণ সম্বন্ধসংজ্ঞাত। যেখানে জন্ম-মৃত্যু বা কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে সেখানে দুঃখ বার বার আঘাত হানে। নির্বাণ হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত, কার্যকারণ প্রবাহ রূপ্ত্ব এবং দুঃখমুক্ত এক সুখকর অবস্থা। নির্বাণ এক অলৌকিক অবস্থা, যা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। নির্বাণ কারণসম্মত নয় বিধায় অবিনশ্বর। নির্বাণ লাভের পর আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না। ফলে দুঃখও ভোগ করতে হয় না। তাই বৌদ্ধদের পরম লক্ষ্য হচ্ছে নির্বাণ। নির্বাণ তথাগত বুদ্ধ আবিষ্টত অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। পণ্ডিত ও দার্শনিক সমাজে বুদ্ধের এই তত্ত্ব ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। প্রদীপ যেমন অন্ধকার বিদূরিত করে সর্বদিক আলোকিত করে তেমনি তথাগত বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্ব যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের মনের কালিমা দূর করে জ্ঞানোলোকে উত্তোলিত করে আসছে। অসংখ্য মানুষের তৎক্ষণা নির্বাপিত করে দুঃখনির্বৃত্তি করে আসছে। অতএব বলা যায়, নির্বাণের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধ্যায়ে আমরা নির্বাণ সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * নির্বাণের ধারণা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- * নির্বাণসাধনার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।



প্রজ্ঞালিত প্রদীপ অন্ধকার বিদূরিত করছে

পাঠ : ১

নির্বাগের ধারণা

নির্বাণ শব্দের অর্থ ‘নির্বাপিত হওয়া’। ‘নি’ উপসর্গের সঙে ‘বাণ’ শব্দটি যুক্ত হয়ে ‘নির্বাণ’ শব্দটি বৃংগল হয়েছে। ‘নি’ উপসর্গটি অভাব, নাই, ক্ষয়, শেষ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ‘বাণ’ শব্দটির আভিধানিক অর্থ ধনুকের তীর। বৌদ্ধ শাস্ত্রে তৃষ্ণা বোঝাতে ‘বাণ’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অতএব, ‘নির্বাণ’ বলতে তৃষ্ণার ক্ষয় বোঝায়। আমাদের মনে রাগ, ঈর্ষা, মোহ, লোভ, ইত্যাদি ক্ষতিকর প্রবৃত্তির উৎপত্তির কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা বা কামনা। তৃষ্ণার কারণেই মানুষ বার বার জনন্যহৃত করে দুঃখভোগ করে। যিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেন তিনি তৃষ্ণাযুক্ত হন। তাঁর তৃষ্ণাজাত রাগ-দেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়। তাঁর জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ নিরূপ্ত হয়। ফলে তিনি সর্বপ্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হন। অতএব, যে-ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে তৃষ্ণার ক্ষয় হয়, রাগ-দেষ-মোহাগ্নি নির্বাপিত হয়, জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ বা কার্যকারণ নিরূপ্ত হয় এবং সর্ব প্রকার দুঃখের নিরোধ হয় তারই নাম নির্বাণ। সংক্ষেপে, যাবতীয় দুঃখের নিরোধ বা নিরুত্তি হওয়াকে ‘নির্বাণ’ বলে। তাই বলা হয়, ‘নির্বাণং পরমং সুখং’ অর্থাৎ ‘নির্বাণ পরম সুখ’।

নির্বাণ এক লোকত্ব অভিজ্ঞতা। সাধারণ উপলক্ষি বা ভাষা দিয়ে নির্বাগের প্রাপ্তি ‘পরম সুখ’ বুঝতে পারা সম্ভব নয়। ধরা যাক কোনো ব্যক্তি জীবনে কখনো ‘মিষ্টি’ খায়নি। তাকে ‘মিষ্টি’ স্বাদ কি শুধু বর্ণনা দিয়ে বোঝানো সম্ভব? অনুরূপভাবে নির্বাণ-এর প্রকৃত অবস্থা সাধারণের পক্ষে বোঝা কঠিন। যেমন— কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজ চেষ্টায় হিমালয় পর্বতে আরোহণ করা সম্ভব কিন্তু হিমালয় পর্বত নিয়ে এসে অন্যদের দেখানো অসম্ভব। একইভাবে সাধনার দ্বারা বুদ্ধ নির্দেশিত মার্গ অনুসরণ করে পরম প্রাপ্তি নির্বাণ সাক্ষাৎ সম্ভব কিন্তু এর অনিবাচনীয় স্বাদ সাধারণকে বোঝানো সম্ভব নয়। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে ন্যূনপক্ষে স্নোতাপন্তি ফল অর্জন না করলে নির্বাগের স্মরণ অবগত হওয়া যায়না।

নির্বাণ সহজবোধ্য না হলেও বুদ্ধ নির্বাণ লাভের উপায় প্রদর্শন করেছেন। বিভিন্ন সময়ে শিষ্যদের ধর্ম দেশনার মাধ্যমে তিনি নির্বাগের তাত্পর্য ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন,

বিশ্বাসনস্স নিরোধের তণহাক্খয় বিমুক্তিনো,

পজ্জাতস্সেব নির্বাণং বিমোক্খ হোতি চেতসো ।

অর্থাৎ জুলত্ব আগুন নিতে যাওয়ার মতো তৃষ্ণা ক্ষয় পায়। বিমুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান নিরোধের সাথে সাথে তাঁর চিত্ত মোক্ষবোধ (বা মুক্তি) লাভ করে। এতে সেই বিমুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয়। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বুদ্ধ আরও বলেছেন,

যো, ইয়ম্নিঃ ধম্ম বিনয়ে অঞ্চলস্তো বিহেস্মস্তি;

পহায় জাতি সংসারং দুক্খস্স্তৎ করিস্মস্তী তি ।

অর্থাৎ যিনি এই (বুদ্ধ-প্রদর্শিত) ধর্ম ও বিনয়ে অপ্রমত্ত হয়ে বিচরণ করবেন, তিনিই জন্ম এবং সংসারের চক্র অতিক্রম করে দুঃখের অন্ত সাধন করতে পারবেন।

নির্বাণ অনুধাবনের জন্যে এখানে একটি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া হলো : প্রদীপ জুলতে তেল, মোম, সলতে ইত্যাদি উপাদান প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ উপাদানসমূহের সরবরাহ অব্যাহত থাকে ততক্ষণ প্রদীপ জুলতে থাকবে। একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ এভাবে অসংখ্য প্রদীপ জুলানো যায়। কিন্তু প্রদীপ প্রজ্জলনের উপাদানসমূহ ক্ষয় বা নিঃশেষ হলে প্রদীপ নির্বাপিত হবে। অনুরূপভাবে মানবজীবনকে প্রদীপের সাথে তুলনা করা যায়। লোভ, দেষ, মোহ,

কামনা-বাসনা, রাগ-অনুরাগ, মায়া এসব ত্রুটিজাত প্রত্যঙ্গির কারণে মানুষ বার বার জন্মগ্রহণ করে। এসমস্ত উপাদান ক্ষয় করা হলে দুঃখের কারণ জন্মনিরোধ বা নির্বাণ লাভ সম্ভব।

অনুশীলনমূলক কাজ
 ‘নির্বাণ’ শব্দের অর্থ কী?
 কে নির্বাণ লাভ করতে পারেন?

পাঠ : ২

নির্বাণের প্রকারভেদ ও বর্ণনা

নির্বাণের প্রকারভেদ :

নির্বাণ দুই প্রকার। যথা :

১. সোপাদিসেস নির্বাণ।
২. অনুপাদিসেস নির্বাণ।

১. সোপাদিসেস নির্বাণ :

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংক্ষার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি উপাদানকে বৌদ্ধ পরিভাষায় পঞ্চক্ষন্দ বলা হয়। পঞ্চক্ষন্দ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখসমূহের বিনাশ করে কোনো সাধকপূরুষ নির্বাণের জ্ঞান উপলব্ধি করলে তাকে বলে সোপাদিসেস নির্বাণ। জীবিত অর্থে সোপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেন। তিনি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেন, ত্রুটামুক্ত হন, কিন্তু জীবিত থাকেন বিধায় জরা, ব্যাধি, আনন্দ-বেদনা রাহিত নন। তবে বর্তমান জন্মই তাঁর শেষ জন্ম। তিনি চতুর্বার্য সত্য সম্যকরণে প্রত্যক্ষ করেছেন, আর্য-আঠাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করে ধ্যান-সমাধি দ্বারা সাধনার মাধ্যমে মার্গফল লাভ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, ছয় বছর কঠোর সাধনার দ্বারা গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে দুঃখ ও ত্রুটার ক্ষয় করে গৌতম বুদ্ধ যে-নির্বাণ জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার নাম সোপাদিসেস নির্বাণ।

২. অনুপাদিসেস নির্বাণ :

নির্বাণদশী মুক্ত পুরুষ পঞ্চক্ষন্দের বিনাশ করে যখন পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন তখন তাকে বলে অনুপাদিসেস নির্বাণ। এ নির্বাণ হলো সম্পূর্ণভাবে নির্বাপিত হওয়া। এ নির্বাণপ্রাপ্তি ব্যক্তি পুনরায় প্রজ্ঞালিত হবেন না। অর্থাৎ তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না। তিনি সম্পূর্ণরূপে জন্ম-মৃত্যুর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়েছেন। এ-প্রকার নির্বাণের কোনো পরিণাম নেই, এ-অবস্থা বর্ণনাতীত। এতে সুখ-দুঃখের উপশম হয়। সুখ-দুঃখের উপশমই পরম সুখ। অনন্ত সংসারপ্রবাহের এখানেই অবসান হয়। এজন্যেই বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, ‘নির্বানং পরমং সুখং’ অর্থাৎ নির্বাণই পরম সুখ।

আচার্য নাগার্জুন নির্বাণের নিয়ন্ত্রণ ব্যাখ্যা করেছেন :

অপ্রতীতম্ অসম্প্রাক্তম্ অনুচ্ছিন্ম্ অশাশ্঵তম্,
 অনিরংক্ষম্ অনুৎপন্নম্ এব নির্বানং উচ্যতে।

অর্থাৎ চরম বিজ্ঞান নিরোধের পর চিন্তসন্ততির যে-অবস্থা হয়, তা প্রতীতির অতীত। কোনোপ্রকারে লভ্য নহে। কেননা শাশ্঵ত পদার্থের উচ্ছেদও নহে। অথবা ভঙ্গুর অবস্থায় শাশ্বতত্ত্ব প্রাপ্তি নহে। এর বিনাশ নেই, যেহেতু উৎপত্তি হয় নাই। এসকল লক্ষণযুক্ত অবস্থাকে অনুপাদিসেস নির্বাণ বলে।

উদাহরণস্বরূপ, বুদ্ধত্বলাভের পর গৌতম বুদ্ধ সুনীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে ধর্মপ্রচার করেন। তারপর আশি বছর বয়সে কুশীনগরের যমক শাল বৃক্ষের নিচে এই অনুপাদিসেস নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

নির্বাণের বর্ণনা :

নির্বাণের স্বরূপ বুঝতে হলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সব রকম জীব ও জড় বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার। কেননা প্রত্যেক জীব ও জড়বস্তুতে আছে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সমাবেশ। আবার এই গুণাবলি স্থির বা শাশ্বত নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীলতা কখনো সুখকর নয়, বরং দুঃখময়। মানুষের দেহ ও মন কোনোকিছুই চিরস্থায়ী নয়। সেজন্য আআর চিরস্থায়ী অস্তিত্ব স্থিরকার করা যায় না। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, সংসার অনিত্য, দুঃখময় এবং অনাত্ম। তাই তিনি এই দুঃখময় সংসারচক্র থেকে বিপর্যাসামী চক্ষে চিন্তকে সংযত করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। কীভাবে তা সম্ভব? বুদ্ধের নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সাধনা, ব্রহ্মচর্য পালন এবং ধ্যান-সমাধির অনুশীলনই হলো চিন্ত সংযমের প্রধান উপায়।

নির্বাণের স্বরূপ সম্পর্কে ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, নির্বাণ অনিবর্চনীয়, তুলনাবিহীন। স্থান-কাল-পাত্র, যুক্তি, প্রমাণ, কিংবা উপমা দ্বারা নির্বাণ প্রকাশযোগ্য নয়। নির্বাণ শান্ত সুখদায়ক। ধর্মপদ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে এরূপ উল্লেখ আছে –

আরোগ্য পরমা লাভা, সম্মুক্তি পরমৎ ধনং,
বিস্মাস পরমাগ্রাতি, নিবানং পরমৎ সুখং।

অর্থাৎ আরোগ্য পরম লাভ, সম্মুক্তি পরম ধন, বিস্মাস পরম জ্ঞাতি এবং নির্বাণ পরম সুখ।

গাথায় বর্ণিত এই পরম সুখই সকল মানুষের কাম্য। কিন্তু সুখ পেতে হলে দুঃখকে নির্মূল করা প্রয়োজন। দুঃখ নির্মূল করার উপায় কী? নির্বাণ লাভ করাই এর একমাত্র উপায়। কারণ নির্বাণে দুঃখ সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়, আসে মুক্তি। এই মুক্তির জন্যই সিদ্ধার্থ গৌতম কঠোর সাধনা করেছিলেন। সাধনার শেষে সিদ্ধিলাভ করে তিনি নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছিলেন।

এখন আমরা গৌতম বুদ্ধ বর্ণিত ‘নির্বাণ পরম সুখ’ কথাটির অর্থ বোবার চেষ্টা করব। মজুবিম নিকায়ের ‘অরিয়পরিয়েসন’ সূত্রে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ করে বলেছেন, ‘আমি স্বয়ং জন্ম, জরা, ব্যাধি, শোক ইত্যাদির পরিণতি উপলক্ষ্মি করেছি। এগুলো থেকে অজন্ম, অব্যাধি, অমৃত্যু, অশোক (শোকহীনতা), অক্রেশ ইত্যাদি জেনে নির্বাণ সাক্ষাৎ করেছি।’ অর্থাৎ নির্বাণলাভের মাধ্যমে তিনি সব দুঃখের অবসান ঘটিয়েছেন। সুতরাং নির্বাণ হচ্ছে সকল দুঃখের অস্তসাধন অবস্থা। নির্বাণ পরম শুভ।

বিশ্বের সকল বস্তু সংক্ষিত ও অসংক্ষিত ভেদে দুরকম। যেসব বস্তুর কার্যকারণ আছে ও পরিবর্তনশীল তা সংক্ষিত। যেসব বস্তুর হেতু বা কার্যকারণ নেই তা হলো অসংক্ষিত, নির্বাণও অসংক্ষিত, অর্থাৎ কার্যকারণরহিত। এর পরিবর্তন নেই। নির্বাণ শান্ত এবং শাশ্বত। সকল পার্থিব বস্তুর অস্থায়িত্ব বা পরিবর্তনশীলতা দুঃখময়। কিন্তু নির্বাণের আনন্দের স্থায়িত্ব অবিনশ্বর। এজন্য বুদ্ধ বলেছেন, ‘নির্বাণ পরম সুখ’। নির্বাণ কারণহীন। এর উৎপত্তি বা বিলয় কোনোটিই নেই। নির্বাণ ধ্রুব, নির্বাণ পরম সুখকর। এজন্য যা কিছু দৃষ্টিগোচর বা অদৃশ্য অথবা কল্পনা-বহির্ভূত তাদের মধ্যে নির্বাণ সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের সাধনার মধ্যে এর চেয়ে উন্নত কাম্য আর কিছুই নেই। এজন্যই ধ্যানী ও বিজ্ঞ পুরুষ নির্বাণলাভের জন্য নিরলস সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

বৌদ্ধ ধর্ম যুক্তির ধর্ম, জ্ঞানের ধর্ম এবং জ্ঞানীর ধর্ম। জ্ঞানীর দ্বারাই নির্বাণলাভ সম্ভব হয়। এজন্যে সম্যক জ্ঞানের দ্বারা বস্তুর গুণাগুণ সম্পূর্ণরূপে জানতে হয়। বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে সংক্ষারসমূহ বিনাশ করতে হয়। বস্তুগুণাগুণ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করলে তবেই নির্বাণ লাভ করা সম্ভব। প্রজ্ঞা ও ধ্যান ছাড়া নির্বাণ সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয়। ‘ধর্মপদ’ এছে উল্লেখ আছে যে,

‘নথি বানৎ অপঞ্চাঙ্গস্ম পঞ্চঞ্চ নথি অবায়তো,
যম্হি বানঞ্চ পঞ্চঞ্চ চ স বে নির্বানসাত্তিকে।’

অর্থাৎ যার প্রজ্ঞা নেই তার ধ্যান হয় না। যার ধ্যান নেই তার প্রজ্ঞা লাভ হয় না। যার প্রজ্ঞা এবং ধ্যান দুই-ই আছে তিনি নির্বাণের নিকটে অবস্থান করেন।

সুতরাং শীলবান ও প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু কিংবা বিজ্ঞ লোককে প্রথমে সাধনার দ্বারা দ্বেষ-মোহহীন হতে হয়। তারপর তিনি সাধনা করে নিষ্পত্তি, নিরূপদ্রব, নির্ভয় কল্যাণকামী হবেন। ফলে তাঁর পক্ষে নির্বাণ উপলক্ষ্মি করা সম্ভব।

অনুশীলনমূলক কাজ

নির্বাণের প্রকারভেদ আলোচনা কর (দলীয় কাজ)

পাঠ : ৩

নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা

লোভ, দ্বেষ, কামনা, বাসনার কারণে সৃষ্টি অকুশল কর্ম থেকে বিরত হয়ে কুশল কর্মের মাধ্যমে শান্তিময় জগৎ নির্মাণ এবং জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধির শৃঙ্খলে আবদ্ধ দুঃখময় জীবনপ্রবাহ থেকে মুক্তিলাভের জন্যে নির্বাণ সাধনার প্রয়োজনীয়তা অনস্থীকার্য। জগৎ দুঃখময়। তৃষ্ণা থেকে দুঃখের উৎপত্তি। তৃষ্ণার কারণ অবিদ্যা। অবিদ্যার কারণে মানুষ অকুশল চেতনার বশবত্তী হয়ে বিভিন্ন প্রকার অপকর্মে লিপ্ত হয়। এতে অজ্ঞানী মানুষ নিজের ক্ষতি যেমন করে অন্যদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করে। ফলে সংসার ও জগতে শান্তি বিষ্ণিত হয়। নির্বাণসাধনায় রাত ব্যক্তিকে সবসময় কুশল কর্ম করতে হয়। চারি আর্যসত্য সম্যকভাবে উপলক্ষ্মি করে দুঃখের কারণ তৃষ্ণা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয়। অক্লান্ত সাধনায় লোভ-দ্বেষ-মোহহীন হয়ে অবিদ্যা দূর করতে হয়। অবিচ্ছিন্ন নির্বাণসাধনায় তিনি নির্ভয় ও কল্যাণকামী হন। ফলে তিনি নিজের ও সকলের কল্যাণ সাধন করেন এবং জগৎ-সংসারের সর্ব প্রকার মঙ্গলের কারণ হন। অপরের ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা, অহংকার ইত্যাদি ত্যাগ করেন। আত্মসংযম অনুশীলন করেন। সকলের প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হন। নির্বাণসাধনা এভাবেই নেতৃত্বিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাই সকলের নির্বাণসাধনা করা উচিত। স্বল্প সময় বা স্বল্প চেষ্টায় নির্বাণলাভ সম্ভব নয়। এজন্য কঠোর অনুশীলন করতে হয়।

‘নির্বাণ’ বুঝতে এবং বোঝাতে কষ্টকর হলেও মানুষের পক্ষেই নির্বাণলাভ সম্ভব। বুদ্ধ বলেছেন মানবজন্ম দুর্লভ। কারণ মানুষের বিবেক আছে। মানুষ ভাল মন্দ বিচার করতে পারে। কুশলকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মানবজন্ম লাভ করতে হয়। দেবতারা শুধু সুখ ভোগ করে। প্রেতরা শুধু দুঃখ ভোগ করেন। পশ্চ-পাখিরা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। একমাত্র মানুষই এ-জগতে দুঃখ এবং সুখ উভয় প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জন করে। জগতে মানুষের পক্ষে কুশল কর্ম করলে ইতর প্রাণীকে জন্ম নিতে হবে। নির্বাণ লাভের ইচ্ছা ও চেতনা মনে জাগ্রত করে কুশলকর্ম সম্পাদন করলে ইতর কুলে জন্মের সম্ভাবনা ব্যহত হয়। এজন্য ‘নির্বাণ’ সাধনা করা উচিত।

নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঞ্চিত। পরম সুখ নির্বাণ লাভের জন্য জন্ম-জন্মান্তর ব্যপী কুশল কর্ম করে পুণ্যফল অর্জন করতে হয়। চারি আর্যসত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানপ্রাপ্ত হতে হয়। অনুসরণ করতে হয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে নির্বাণের পথে প্রবেশ সম্ভব। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে সৎ পথে চলতে নির্দেশনা দেয়। বলা হয়েছে বৌদ্ধ ধর্ম জ্ঞানের ধর্ম, জ্ঞানীর ধর্ম, কাজেই জ্ঞানী ব্যক্তিই প্রকৃতভাবে উপলব্ধি করেন যে জগৎ দুঃখময়। ত্রুটাই দুঃখের কারণ। ত্রুটার ফলেই বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়। জন্ম নিলেই জরা, ব্যাধি, প্রিয়বিচ্ছেদ, অপ্রিয় সংযোগ, মৃত্যু ইত্যাদি বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করতে হয়। ত্রুটা থেকে মুক্তি লাভ করা সকলের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্যই জ্ঞানী ব্যক্তির নির্বাণ সাধনা করা প্রয়োজন।

অনুশীলনমূলক কাজ

নির্বাণ সাধনার জন্য কী কী অনুশীলন করতে হয়?

নির্বাণ সাধনার মাধ্যমে কীভাবে সুন্দর জীবন গঠন করা যায়? মুক্তিসহকারে তোমার

মতামত বিশ্লেষণ কর (অর্পিত কাজ)

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. নির্বাণ এক অবস্থা।
২. নির্বাণ তথাগত বুদ্ধ অন্যতম শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব।
৩. নির্বাণ এক অভিজ্ঞতা।
৪. একটি প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ এভাবে অসংখ্য জ্বালানো যায়।
৫. যার ধ্যান নেই তার লাভ হয় না।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. নির্বাণ শব্দটির অর্থ কী ?
২. অনুপাদিসেস নির্বাণ বলতে কী বোঝা ?
৩. সোপাদিসেস নির্বাণ-এর বৈশিষ্ট্য কী ?
৪. ‘মিলিন্দ প্রশ্ন’ এতে নির্বাণ সম্পর্কে কী বলা হয়েছে ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. নির্বাণ সম্পর্কে তোমার ধারণা আলোচনা কর।
২. ‘নির্বাণ বৌদ্ধদের জন্য পরম আকাঞ্চিত’ — ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। নির্বাগ কী ?

- | | |
|-----------------|--------------------|
| ক. জাগতিক জ্ঞান | খ. আকাঙ্ক্ষা রোধ |
| গ. চিত্তের সুখ | ঘ. ত্বক্ষণার ক্ষয় |

২। বিশুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম সম্পূর্ণরূপে নিরোধের কারণ —

- i. ত্বক্ষণার ক্ষয় করা
- ii. চিত্তমুক্তি লাভ করা
- iii. লোভ, দেষ, মোহ ধ্বংস করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ঢ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ধর্মপুর আর্যবিহারের বিহারাধ্যক্ষ কল্যাণশ্রী মহাস্থাবির সুপরিকল্পিতভাবে বিহার পরিচালনা করেন বিধায় তাঁর সুনাম চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়ে। তিনি সাধনার দ্বারা সম্যক সমৃদ্ধের প্রদর্শিত ধর্ম ও বিনয়ে অগ্রমত্ত হয়ে বিচরণ করেন এবং এক পর্যায়ে তিনি পথঙ্কন্দ বিদ্যমান অবস্থায় দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের উপায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

৩। কল্যাণশ্রী মহাস্থাবির গৌতম বুদ্ধের কোন নির্বাগ জ্ঞান উপলব্ধি করেন ?

- ক. প্রাপ্তি নির্বাগ সাক্ষাৎ
- খ. সোপাদিসেস নির্বাগ জ্ঞান
- গ. অনুপাদিসেস নির্বাগ জ্ঞান
- ঘ. সোপাদিসেস ও অনুপাদিসেস নির্বাগ

৪। উক্ত নির্বাণ জ্ঞান লাভের দ্বারা সম্ভব-

- জন্ম-মৃত্যু প্রবাহ নিরোধ করা
- পঞ্চ ইন্দ্রিয়সমূহের দমন করা
- দুঃখ ও ত্রুষ্ণা বিনাশ করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন :

১। অনিল বিকাশচাকমা একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। গৃহীজীবনে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক পড়ে বুদ্ধের সুন্দ, বিনয় ও ধর্মনীতি বিষয়ে বিশদভাবে বুঝতে পারলেন। তাই তিনি সংসারের মায়া ত্যাগ করে বিহারে ভেঙ্গে নিকট প্রব্যজিত হলেন। প্রথমে তিনি ধর্ম প্রত্যক্ষ করে ত্রুষ্ণার ক্ষয়, রাগ-দেষ-মোহ নির্বাপিত করা; জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ রোধ ইত্যাদি বিষয়ে জাগতিক জ্ঞান অর্জন করেন। শ্রমণ থেকে ভিক্ষুত্বে উপনীত হয়ে তিনি ত্রিপিটক গ্রন্থের জ্ঞান সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধের ‘নিবানাং পরমং সুখং’-এই বাণিটি বুঝতে সক্ষম হলেন।

ক. ত্রুষ্ণা থেকে কী উৎপত্তি হয় ?

- খ. আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করতে হয় কেন ? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
 গ. অনিল চাকমা শ্রমণ অবস্থায় বুদ্ধের কোন তত্ত্ব বুঝতে পারলেন ? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ভিক্ষুত্ব লাভের পর অনিল চাকমার অর্জিত শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

২। ভিক্ষু সম্মেলনের এক দেশনায় শ্রদ্ধেয় ধর্মকীর্তি স্থবির বললেন, “প্রথমত ধর্মপদ গ্রন্থে নির্বাণ সম্পর্কে একপ উল্লেখ” আছে — ‘আরোগ্য পরমা লাভা, সন্তুষ্টি পরমং ধনং ধনং বিস্মাস পরমাগ্রাতি, নিবানাং পরমং সুখং।’

বুদ্ধ বলেছেন—‘মানবজন্ম দুর্লভ। মানুষের বিবেক আছে। ভালোমন্দ বিচার করে কুশলকর্ম সম্পাদন করে মানব জন্ম হয়।’

ক. গৌতম বুদ্ধ কত বছর যাবৎ ধর্ম প্রচার করেন ?

- খ. নির্বাণ লাভের পর আর জন্মহৃদয় করতে হয় না কেন ?
 গ. ধর্মকীর্তি স্থবির তাঁর দেশনায় কোন ধরণের নির্বাণের ইঙ্গিত করেছেন — ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত বুদ্ধের দেশনায় নির্বাণের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত? পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

অষ্টম অধ্যায়

সঙ্গীতি

বৌদ্ধ সঙ্গীতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গভীরভাবে সম্পৃক্ত। সঙ্গীতি সম্পর্কে জ্ঞান ব্যতীত বৌদ্ধধর্মের প্রকৃত ইতিহাস জানা সন্তুষ্টির নয়। বুদ্ধ লিখিত আকারে কোনো ধর্মোপদেশ দেননি। তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ধর্মোপদেশ করতেন তা তাঁর শিষ্যগণ স্মৃতিতে নিখুঁতভাবে ধারণ করে রাখতেন এবং মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর শিষ্যগণ সেসব ধর্মোপদেশ সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে প্রথমে সংকলন করেন। তৎপর স্বধর্মের অনুসারী মহাকারণিক ভিক্ষুগণ বিভিন্ন সময় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংকলিত বুদ্ধবাণীর বিশুদ্ধতা রক্ষা, গ্রন্থাকারে ও নানা উপায়ে সংরক্ষণ এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির ভূমিকা অনন্যসাধারণ। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ সঙ্গীতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * সঙ্গীতির ধারণা ও পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
- * সঙ্গীতির মাধ্যমে বুদ্ধবাণী কীভাবে সংকলিত হয়েছিল তাঁর ধারণা দিতে পারব;
- * প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব;
- * বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সঙ্গীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব;
- * সঙ্গীতির গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।

পাঠ : ১

সঙ্গীতির ধারণা

অভিধানে ‘সঙ্গীতি’ শব্দের বিভিন্নরকম অর্থ পাওয়া যায়। যেমন : সঙ্গীত, গান, পাখির কৃজন, প্রচার, ঘোষণা, পূর্বাভিনয় বা মহড়া, সভা বা সম্মেলন এবং সমবেতভাবে উচ্চারণ, আবৃত্তি, গীত, পুনরায় শ্রবণ বা বিবেচনা করা ইত্যাদি। বিভিন্ন রকম অর্থ পাওয়া গেলেও বৌদ্ধসাহিত্যে সঙ্গীতি শব্দটি সভা বা সম্মেলন বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। বুদ্ধের জীবিতকালে তাঁর ধর্ম-দর্শন এবং সঙ্গের বিধিবিধানসহ যে-কোনো বিষয়ে বিতর্ক বা সমস্যা দেখা দিলে তা বুদ্ধ নিজে বা তাঁর নির্দেশনায় নেতৃত্বানীয় শিষ্যগণ সমাধান করতেন। কিন্তু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর এরপ সকল সমস্যা পঞ্চিত ভিক্ষুসংঘ সমবেত হয়ে সভা বা সম্মেলন আহ্বানের মাধ্যমে সমাধান করতেন। জানা যায় যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধ ধর্ম-সমন্বয় প্রশ়ং মীমাংসা, প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ, সংকলন, সংরক্ষণ, বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রচার-প্রসারের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতি নামে পরিচিত। অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, সঙ্গীতি হলো ভিক্ষুসঙ্গের সর্বোচ্চ নৈতি-নির্ধারণী সভা বা সম্মেলন। এসব সভায় শত শত প্রবীন, জ্ঞানী এবং অর্থ ভিক্ষু উপস্থিত থাকতেন। আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে এসব সম্মেলন কয়েকমাস ব্যাপী চলতা।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাগের তিনমাস পর বিক্ষিণ্ডভাবে ছড়িয়ে থাকা বুদ্ধবাণী পণ্ডিত বুদ্ধশিষ্যগণ এক সঙ্গীতি আহ্বান করে একত্রে সংকলন করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তা প্রথম সঙ্গীতি নামে পরিচিত। প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত বুদ্ধবাণী ভিক্ষুগণ স্মৃতিতে ধারণ করে মৌখিকভাবে প্রচার করতেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক পর্যন্ত বুদ্ধবাণী এভাবে প্রচার করা হতো। মুখে-মুখে প্রচারিত হওয়ায় বা গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ বা লিপিবদ্ধ না হওয়ায় বুদ্ধবাণী নিয়ে মাঝে মাঝে বিতর্ক দেখা দিত। এ ছাড়া, নানা কারণে বুদ্ধবাণী বিকৃতি ও পরিহানির সম্মুখীন হতো এবং সঙ্গের মধ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হতো। ভিক্ষুসঙ্গ সঙ্গীতি আহ্বানের মাধ্যমে এসব সমস্যা সমাধান করে বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে রক্ষা করতেন। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম। কিংবদন্তি অনুসারে নয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। তবে সঙ্গীতির সংখ্যা, অনুষ্ঠানের সময়কাল ও স্থান সম্পর্কে বিতর্ক লক্ষ করা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন যে, সর্বমোট ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তন্মধ্যে প্রথম তিনটি সঙ্গীতি ভারতবর্ষে, চতুর্থটি সিংহলে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠটি মিয়ানমারে (বার্মায়) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কোনো কোনো সিংহলি (শ্রীলঙ্কার) তথ্য মতে, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিংহলে। তা ছাড়া, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গীতি নিয়েও বিতর্ক আছে। যেমন, দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর মহাসাঙ্গিকদের তত্ত্ববধানে এক সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা জানা যায়। কিন্তু তা থেরবাদী গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় না। আবার সম্মাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় যে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা মহাযান সূত্রে উল্লেখ নেই। মহাযান মতে, তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় সম্মাট কণিকের পৃষ্ঠপোষকতায় কাশ্মীরের জলন্ধরে। থাইল্যান্ডের কিংবদন্তি মতে, প্রথম তিনটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তমটি সিংহলে এবং অষ্টম ও নবম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল থাইল্যান্ডে। মহাবৎস মতে, প্রথম তিনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে, চতুর্থ ও পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিংহলে। নানা বিতর্ক থাকলেও থেরবাদী বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করেন, প্রথম তিনটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভারতে, চতুর্থটি সিংহলে, পঞ্চম এবং ষষ্ঠটি মিয়ানমারে (বার্মায়)। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এই ছয়টি সঙ্গীতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বুদ্ধবাণী সংকলন এবং অদ্যাবধি বিশুদ্ধভাবে তা সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে এ ছয়টি সঙ্গীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এগুলোকে মহাসঙ্গীতিও বলা হয়।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

সঙ্গীতি বলতে কী বোঝা?

কিংবদন্তি অনুসারে মোট কয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

পাঠ : ২

সঙ্গীতির উদ্দেশ্য ও পটভূমি

ছয়টি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন স্থানে। বুদ্ধবাণী সংকলন এবং বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণ করাই সঙ্গীতিসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এক এক সঙ্গীতির পটভূমি এক এক রকম। প্রথম সঙ্গীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাগের পর ভিক্ষুগণ শোকে ক্রন্দন করতে থাকলে সুভদ্র নামক এক দুর্বিনীত ভিক্ষু তাঁদের উদ্দেশ্য করে একে বলেন, “হে ভিক্ষুগণ ! শোক করবেন না, পরিদেবন করবেন না। মহাশ্রমণের মৃত্যুতে আমরা ‘ইহা করো, ইহা করো না’ প্রভৃতি উপদ্রব হতে মুক্ত হয়েছি। এখন থেকে আমাদের যা ইচ্ছা তা করতে পারব।” উল্লেখ্য যে, সুভদ্র ছিলেন বুদ্ধের শেষ শিষ্য, তিনি বৃক্ষ বয়সে প্রব্রজিত হয়েছিলেন। হিউয়েন-সাং -এর ভ্রমণ-বিবরণী এবং তিব্বতি গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, অধিকাংশ দুর্বিনীত ভিক্ষুর অভিধায় ছিল সুভদ্রের মতো। ফলে মহাকশ্যপ স্থবির এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় বিনয়ী ভিক্ষুরা বুদ্ধশাসনের পরিহানির কথা চিন্তা করে শক্তি হয়ে ওঠেন। তাঁদের ধারণা, বুদ্ধের মৃতদেহ

বর্তমান থাকতেই যদি একপ চিন্তা-চেতনার সূত্রপাত হয় তাহলে অচিরেই ভিক্ষুসভ্য বিনয়চূড়ত হয়ে বিশ্বজ্ঞল হয়ে পড়বে। বুদ্ধবাণী কল্পিত হবে। বিশ্বৃত হয়ে হারিয়ে যাবে। ফলে বুদ্ধশাসন পরিহানির সম্মুখীন হবে। একপ চিন্তা করে ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বিভিন্ন বুদ্ধশিষ্য কৃতক স্মৃতিতে ধারণকৃত বুদ্ধবাণীসমূহ একত্রে সংকলন করে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। অতপর, বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাজগৃহের সঙ্গপুরী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বৌদ্ধের মহাপরিনির্বাগের একশত বছর পর বজ্জপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্গে বিনয় বর্হিভূত দশটি বিধিবিধান চালু করেন। এ দশটি বিধি-বিধানকে ‘দসবথুনী’ বলা হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতি অধ্যায়ে আমরা দশবথুনী সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ব। বজ্জপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত দসবথুনী বিনয় সম্মত কি না তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

তৃতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস সমীক্ষায় দেখা যায়, সন্ত্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সংকার বেড়ে যায় এবং তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। ফলে অন্যান্য ধর্মের বহু তৌরিক বা সন্ন্যাসী লাভ-সংকারের আশায় মস্তক মুণ্ডন এবং পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা অসন্দুপায় অবলম্বনপূর্বক বিহার ও মন্দির দখল করে বসবাস করতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। এতে সঙ্গে যেমন অরাজকতা দেখা দেয় তেমনি প্রকৃত বুদ্ধবাণী নিয়েও সংশয় সৃষ্টি হয়। প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ এবং সঙ্গে বিরাজমান অরাজকতা বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে পাটলীপুত্রের অশোকারাম বিহারে তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

চতুর্থ সঙ্গীতির ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, সন্ত্রাট অশোক-পুত্র মহেন্দ্র থের ও কন্যা সজ্জামিত্রার মাধ্যমে শ্রীলক্ষ্ম বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতীয় তামিলরা শ্রীলক্ষ্ম দখল করে শাসন করতে থাকে। তারা বৌদ্ধ বিহার ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে থাকে। তাদের সঙ্গে সিংহলিদের সবসময় যুদ্ধবিঘ্ন লেগে থাকত। অবশ্যে সিংহলিদের সহায়তায় রাজা বটগামণী তামিলদের বিতাড়িত করে শ্রীলক্ষ্ম রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজা বটগামণীর সুশাসনে শাস্তি ফিরে আসতে থাকে এবং বৌদ্ধধর্ম নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধবিঘ্ন লেগে থাকার কারণে সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যুদ্ধবিঘ্ন ও দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষের মধ্যে ভোগবাদী মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে এবং মানুষ নীতিজ্ঞান হারাতে থাকে। বারবার বিদেশী আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম পরিহানির সম্মুখীন হতে থাকে। তাছাড়া, মহাবিহার ও অভয়গিরি নিকায়ের দ্বন্দ্বের কারণে সঙ্গে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। সঙ্গে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অধার্মিক ভিক্ষুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বহু অর্হৎ ভিক্ষু থাকলেও স্মৃতিতে ত্রিপিটক ধারণ করে রাখা ভিক্ষু সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে। এসব কারণে মৌখিকভাবে প্রচলিত বুদ্ধবাণীর বিকৃতি ও পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। অতপর রাজা বটগামণীর পৃষ্ঠপোষকতায় অট্ঠকথাসহ সমস্ত বুদ্ধবাণী তথা ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করে চিরস্থায়িত্ব দানের উদ্দেশ্যে সিংহলের আলু বিহারে (যতান্তরে আলোক বিহার) চতুর্থ সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। আলু বিহারে এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে এ সঙ্গীতিকে আলুবিহার সঙ্গীতিও বলে। ত্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে অনুষ্ঠিত এ সঙ্গীতিতে অট্ঠকথা সহ সমগ্র তালপত্র বা ভূজ্ঞপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

ত্রিষ্টপূর্ব ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে মিয়ানমারের রাজা মিগুনমিনের রাজত্বকালে মান্দালয়ে পঞ্চম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপিটক তথা বুদ্ধবাণী মার্বেল পাথরে খোদাই করে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনের অনতিদূরে ‘কাবা আয়ে বিশ্বশান্তি প্যাগোড়ায়’ পঞ্চম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। উক্ত সঙ্গীতিতে মান্দালয় পর্বতে ত্রিপিটক ৭২৯ খানা মার্বেল পাথরে খোদিত করা হয়।

ত্রিপিটক বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের দ্বারা লিখিত ও খোদিত হতে থাকে। এতে লেখক ও খোদাইকারীর প্রমাদবশত বুদ্ধবাণী ভুলভাবে উপস্থাপিত হতে থাকে। তাছাড়া বিদেশী শাসনের কারণে সমাজে দলাদলি ও ধর্মীয় ব্যাপারে শৈথিল্য দেখা দেয়। বুদ্ধবাণী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার জন্য বুদ্ধশাসনের উন্নতি এবং দেশবিদেশে প্রচারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪-১৯৫৬ সালে মিয়ানমারে ষষ্ঠ সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। উক্ত সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটক আবৃত্তি ও টেপ রেকর্ড করা হয়। এই সঙ্গীতিতে বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহ তুলনামূলক আলোচনা করে পুনর্মুদ্রণের জন্য খসড়া তৈরি করা হয়।

উপরে বর্ণিত ছয়টি মহাসঙ্গীতির প্রেক্ষাপট বা পটভূমি ভিন্ন ভিন্ন হলেও উদ্দেশ্য প্রায়ই অভিন্ন। পরিশুল্কভাবে বুদ্ধবাণী সংকলন, সংরক্ষণ ও প্রচার করাই সঙ্গীতিসমূহের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সুভদ্র কী বলেছিলেন?

সঙ্গীতির প্রধান উদ্দেশ্য কী?

চতুর্থ সঙ্গীতির পটভূমি বর্ণনা কর

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতি কোথায় এবং কী কারণে আহ্বান করা হয়েছিল?

পাঠ : ৩ প্রথম সঙ্গীতি

প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ : প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ সম্পর্কে কোনো মতানৈক্য নেই। কথিত আছে, বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় মহাকশ্যপ স্তুবির কুশীনগরে ছিলেন না। তিনি পাবা থেকে কুশীনগর যাওয়ার পথে বুদ্ধের পরিনির্বাণের কথা জানতে পারেন। তিনি আরও শুনলেন যে, সুভদ্র নামক এক অবিনীত বৌদ্ধ ভিক্ষুর উক্তিতে পঞ্চিত ও বিনয়ী ভিক্ষুরা বুদ্ধশাসনের পরিহানি আশঙ্কা করে উদ্বিধু হয়ে ওঠেন। সুভদ্রের উক্তিটি আমরা পাঠ দুই-এ পড়েছি। অনেক দুর্বিনীত ভিক্ষু বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে খুশি হন। কারণ বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁরা যথোচ্ছভাবে জীবনযাপন করতে পারবেন। মহাকশ্যপ স্তুবির কুশীনগরে পৌঁছে দুর্বিনীত ভিক্ষুদের অভিপ্রায় শুনে বিস্মিত এবং শক্তিত হন। কারণ বুদ্ধ লিখিতভাবে কোনো ধর্মোপদেশ দান করেননি। তাঁর ধর্মোপদেশসমূহ শিষ্যগণ কর্তৃত করে প্রচার করতেন। মহাকশ্যপ স্তুবির এবং অন্যান্য নেতৃত্বানীয় বিনয়ী ভিক্ষুগণ চিন্তা করলেন, বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকলে বা বিভিন্ন জন কৃতক কর্তৃত থাকলে বুদ্ধবাণী কল্পিত ও বিকৃত হতে পারে। বিস্মিত হয়ে হারিয়ে যেতে পারে। অন্যজনের বাণীও বুদ্ধবাণী হিসেবে প্রচারিত হতে পারে। এরূপ হলে বুদ্ধশাসনের পরিহানি ঘটবে। এসব চিন্তা করে মহাকশ্যপ স্তুবির এবং ধর্ম-বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বুদ্ধবাণী সংকলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল।

প্রথম সঙ্গীতির সময়কাল, স্থান ও পৃষ্ঠপোষকতা : প্রথম সঙ্গীতির সময় ও স্থান নিয়ে কিছুটা মতভেদ লক্ষ করা যায়। তবে অধিকাংশ বৌদ্ধ ঐতিহ্য মতে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর রাজগৃহের সঞ্চপণী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা অজাতশত্রু এ-সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় গুহার সামনে বিশাল মণ্ডপ তৈরি করা হয়। এতে দক্ষিণমুখী ও উত্তরমুখী করে পাঁচশো স্তুবিরের আসন সজ্জিত করা হয়। মণ্ডপের মধ্যভাগে পূর্বমুখী করে ধর্মাসন নির্মাণ করা হয়।

সঙ্গীতিকারক নির্বাচন : মহাকশ্যপ স্থবির সর্বসমতিক্রমে প্রথম সঙ্গীতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এতে স্থির হয় যে সঙ্গায়নে অংশগ্রহণকারী সকল ভিক্ষু অর্হৎ হবেন। অতঃপর, বৌদ্ধধর্মে পঞ্চত পাঁচশো জন অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আনন্দ স্থবিরকে প্রথমে নির্বাচন করা হয় নি। কারণ তিনি তখনও অর্হত্বে উন্নীত হন নি। ফলে তাঁকে বাদ দিয়ে চারশো নিরানবই জন ভিক্ষু নির্বাচন করা হয়। কিন্তু তার জন্য একটি আসন খালি রাখা হয়। কারণ তিনি বুদ্ধের সেবক এবং শ্রতিধর ছিলেন। বুদ্ধের সকল ধর্মোপদেশ তিনি ধারণ করে রাখতেন। তাঁর গুণাবলি সম্পর্কে বুদ্ধশিয়গণ অবহিত ছিলেন এবং সকলে তাঁর উপস্থিতি কামনা করছিলেন। সঙ্গীতি আরম্ভের ঠিক আগে আনন্দ স্থবির অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। অতপর, তিনি ঋদ্ধিবলে সঙ্গীতি মণ্ডপে প্রবেশ করে নিজ আসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁকে নিয়ে পাঁচশো জন পূর্ণ হলে সঙ্গীতির কার্যক্রম আরম্ভ করা হয়।

প্রথম সঙ্গীতির কার্যক্রম : মহাকশ্যপ নিজেই প্রশংকর্তা নিযুক্ত হন। প্রথমে বিনয় সঙ্গায়ন করা হবে বলে স্থির করা হলো। উপালি ধর্মাসন অলঙ্কৃত করেন। মহাকশ্যপ স্থবির সঙ্গের সম্মতি অনুসারে উপালি স্থবিরকে বিনয় সম্পর্কে প্রশংক করেন। প্রথমে, চারি পারাজিকা কখন প্রজ্ঞাপ্ত হয়, কাকে উপলক্ষ করে প্রজ্ঞাপ্ত হয়, কোথায় প্রজ্ঞাপ্ত হয়, মূল প্রজ্ঞাপ্তি ও অনুপ্রজ্ঞাপ্তি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশংক করেন। উপালি স্থবির সব প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। এভাবে তেরোটি সঙ্গাদিসেস, দু'টি অনিয়ত, চারি পটিদেসনীয়া ধর্ম, ত্রিশটি নিস্সগুণিয়, বিরানবইটি পাচত্ত্বিয় প্রভৃতি একে একে আবৃত্তি করে স্থির করা হয়। তৎপর উভয় বিভঙ্গ, মহাবগ্নং, চূল্ববগ্নং ও পরিবার পাঠো আবৃত্তি করা হয়। উপস্থিত সঙ্গীতিকারক ভিক্ষুগণ উপালি স্থবিরের বিনয় আবৃত্তি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনলেন। তাঁরা সর্বসমতি ক্রমে উপালি কর্তৃক দেশিত বিনয় অনুমোদন করেন। এছাড়া ‘ক্ষুদ্রাগুক্ষুদ্র’ শিক্ষাপদ নিয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কারণ বুদ্ধ জীবিত থাকতে এসব বিষয়ে ভিক্ষুরা ইচ্ছা করলে পরিবর্তন করতে পারবেন বলেছিলেন। পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর অনুমোদন লাভের পর বিনয় সঙ্গায়ন শেষ হয়। বিনয় বুদ্ধশাসনের আয়ুস্রন্তি। তাই ধর্ম ও বিনয়ের মধ্যে বিনয় আগে সংগৃহীত হয়।

তারপর বিনয়ের মতো ধর্ম (বা সুন্ত) আবৃত্তির জন্য আনন্দ স্থবিরকে আহ্বান করা হয়। আনন্দ স্থবির ধর্মাসনে বসেন। মহাকশ্যপ স্থবির প্রশংকর্তার আসনে বসে শ্রতিধর আনন্দ স্থবিরকে ধর্ম সম্পর্কে প্রশংক জিজ্ঞাসা করেন। প্রথমে ‘ব্রহ্মজাল সূত্র’ কোথায় দেশিত হয়েছিল, কাকে উপলক্ষ করে দেশিত হয়েছিল প্রশংক করা হয়। তারপর, ব্রহ্মজাল সূত্রের নিদান, পুদ্ধাল প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশংক করা হয়। তারপর শ্রামনফল সূত্র সম্পর্কে প্রশংক করা হয়। আনন্দ স্থবির প্রতিটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করেন। এভাবে দীর্ঘনিকায়, মঞ্জিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদকনিকায় আবৃত্তি করা হয়। পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর অনুমোদন লাভের পর সূত্র বা ধর্ম সঙ্গায়ন শেষ হয়। প্রথম মহাসঙ্গীতি সম্পন্ন হতে চার মাস সময় লেগেছিল। পাঁচশো অর্হৎ দ্বারা প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হয়েছিল বলে একে পঞ্চশতিকা সঙ্গীতিও বলা হয়।

প্রথম সঙ্গীতির ফলাফল : পাঁচশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে মহাকশ্যপ স্থবিরে সভাপতিত্বে এবং উপালি ও আনন্দ স্থবিরের দেশনায় বুদ্ধবাণী ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংকলিত বা সংগৃহীত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রথম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ কী?

আনন্দ স্থবিরকে প্রথমে কেন সঙ্গীতিকারক হিসেবে নির্বাচন করা হয়নি?

প্রথম সঙ্গীতিতে উপালি থের কী আবৃত্তি করেন?

পাঠ : ৪

দ্বিতীয় সঙ্গীতি

দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ : বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশে বছর পর বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্গে বিনয়-বহির্ভূত দশটি বিধিবিধান বা দশবধূনী প্রচলন করেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা উপোসথ দিবসে ভিক্ষুসঙ্গের মধ্যখানে পানিভর্তি তাম্রপাত্র রেখে উপাসক-উপাসিকাদের কহাপণ (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) প্রদানের জন্য অনুরোধ করতেন। তাঁরা অন্যান্য বিনয়ধর ভিক্ষুদের এ দশটি বিনয় বহির্ভূত বিধানকে সমর্থন জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। তাঁরা যশ স্থবিরকে উপটোকল দিয়ে বশে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু যশ স্থবির বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত ও সঙ্গ পরিপন্থী গর্হিত আচরণ থেকে বিরত থাকার অনুরোধ জানান। বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তিনি বজ্জি ভিক্ষুদের বিনয় বহির্ভূত কর্ম হতে নিবৃত্ত করার জন্য বিনয়ী ভিক্ষু ও ধার্মিক লোকদের অনুরোধ করেন। এতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ ক্ষুঢ়া হয়ে যশ স্থবিরকে ‘পটিসারণীয় কম্ব’ প্রদান করেন। অর্থাৎ পুনরায় মিলনের বা বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। যশ স্থবির দুর্বিনয়ী ভিক্ষুদের কথায় কর্ণপাত না করে ধর্মকে রক্ষা করার জন্য বৈশালীবাসীদের অনুরোধ জানান। এতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ বিক্ষুক্র হয়ে ‘উক্খেপনী দণ্ড’ প্রদানপূর্বক তাঁকে সঙ্গ হতে বহিক্ষার করেন। যশ স্থবির এ সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রমান্বয়ে বিনয়ী ভিক্ষুদের আহ্বান করেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিনয়ী ভিক্ষুগণ বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রচলিত দশবধূনী বা দশটি বিধিবিধান বিনয়সংগত কি না এ-সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন। দশটি বিধিবিধান বা দশবধূনী হলো নিম্নরূপ :

১. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে সিং-এর মধ্যে লবণ জমা রেখে প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ নং পাচিত্তিয়া অনুসারে ভিক্ষুগণ তা করতে পারেন না।
২. মধ্যাহ্নের পর সূর্যের ছায়া দুই আঙুল হেলে পড়লেও ভিক্ষুগণ খাদ্য গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের নিয়ম অনুসারে ভিক্ষুগণ মধ্যাহ্নের পর ভোজন করতে পারেন না।
৩. ভিক্ষুগণ একবার ভোজন করে পুনরায় অন্য আমে গিয়ে ভোজন করতে পারবেন। কিন্তু পাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ নং পাচিত্তিয়া অনুসারে ভিক্ষুগণ তা করতে পারেন না।
৪. এক সীমান্তক্ষেত্রে ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুগণ পৃথক পৃথকভাবে উপোসথ পালন করতে পারবেন। কিন্তু এটি সীমা ও আবাস-সম্পর্কীয় বিধির পরিপন্থী।
৫. অনুপস্থিত ভিক্ষুর অনুমতি পরে নেওয়া হবে এরপ চিন্তা করে ভিক্ষুগণ বিনয়কর্ম সম্পাদন করতে পারবেন। কিন্তু এটি সঙ্গবিধির পরিপন্থী।
৬. বিধিবিধানের আলোকে বিচার না করে পরম্পরা-প্রচলিত আচার বা প্রথাকে ভিক্ষুগণ মান্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু বৌদ্ধমতে, কোনো বিষয় সঠিক এবং বিনয়সম্মত না হলে পরম্পরা প্রচলিত হয়ে আসলেও গ্রহণ করা যায় না।
৭. ভিক্ষুগণ বিকালে দুধ ও দধির মধ্যবর্তী অবস্থার পানীয় বা ঘোল জাতীয় তরল পদার্থ পান করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের পঁয়ত্রিশ নং পাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।
৮. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে তাড়ি জাতীয় পানীয় পান করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের একান্ন নং পাচিত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।

৯. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে ঝালরযুক্ত কম্বল ব্যবহার করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের উননবই নং পাচত্তিয়া বিধির পরিপন্থী।
১০. ভিক্ষুগণ ইচ্ছা করলে সোনা, রূপা বা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত দ্রব্য গ্রহণ করতে পারবেন। কিন্তু এটি পাতিমোক্ষের আঠার নং নিসগ্রীয় বিধির পরিপন্থী।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির সময়কাল, স্থান ও পৃষ্ঠপোষকতা :

বুদ্ধের পরিনির্বাগের একশো বছর পরে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। তখন ছিল রাজা কালাশোকের রাজত্বকাল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সঙ্গীতিকারক নির্বাচন ও কার্যক্রম : বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণ যশ স্থবিরকে দণ্ডনান করে সজ্জ হতে বহিকার করলে তিনি তাঁর জন্মভূমি কোশাস্তীতে অবস্থান নেন। সেখান থেকে তিনি বিনয়ী ভিক্ষুদের খবর প্রদান করে একত্রিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। তিনি পশ্চিম ভারতের অবস্থি ও পাঠ্য অঞ্চল এবং দক্ষিণাধ্যলের ভিক্ষুদের নিকট খবর প্রেরণ করেন এবং নিজে অহোগ্রস পর্বতে অবস্থানকারী মহামান্য সম্মুত সানবাসী ভিক্ষুর নিকট গমন করেন। স্থবির সম্মুত সানবাসী মহাতর্কিক এবং পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দসবথুনী সম্পর্কে যশ স্থবিরের অভিমত সমর্থন করেন। এ-সময় খবর পেয়ে পশ্চিম ভারত হতে ষাটজন এবং দক্ষিণ ভারত হতে আটাশি (৮৮) জন অর্হৎ ভিক্ষু অহোগ্রস পর্বতে পৌছে সম্মুত সানবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা সকলে উদ্বিধু হয়ে বলেন, দসবথুনী সম্পর্কে মীমাংসা না হলে ভবিষ্যতে বুদ্ধশাসনের ক্ষতি হতে পারে। তাঁরা সম্মুত সানবাসীর পরামর্শে রেবত স্থবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁকে দসবথুনী সম্পর্কে অবহিত করেন। রেবত স্থবির সমস্ত দসবথুনী বিচার বিশ্লেষণ করে বিনয় বহির্ভূত বলে রায় দেন এবং বলেন বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের তা পরিত্যাগ করা উচিত।

এ সময় বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুগণও নিজেদের পক্ষে লোক সংগ্রহের চেষ্টা চালাতে থাকেন। তাঁরাও রেবত স্থবিরকে স্বপক্ষে আনবার জন্য মহামূল্যবান উপচৌকন প্রেরণ করেন। রেবত স্থবির তা প্রত্যাখ্যান করে তাঁদের দসবথুনী তথা বিনয়ের পরিপন্থী আচরণ ত্যাগ করতে উপদেশ প্রদান করেন। তখন তাঁরা রেবত স্থবিরের শিষ্য উত্তরের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু তাতেও তাঁরা ব্যর্থ হন। অতঃপর উপস্থিত ভিক্ষুগণ রেবত স্থবিরের পরামর্শে বৈশালীতে গিয়ে বিবাদ মীমাংসা করার জন্য সঙ্গায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সঙ্গায়ন করার উদ্দেশ্যে ত্রিপিটকধর প্রতিসন্দিদ্ধাপ্রাঙ্গ সাতশো অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করে বৈশালীর বালুকারামে সমবেত হন। সেখানে দুই পক্ষের ভিক্ষুদের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে আটজন ভিক্ষুর সমবয়ে একটি কার্যকারক সভা গঠন করা হয়। এ সভায় পূর্ব ভারত হতে চারজন এবং পশ্চিম ভারত হতে চারজন ভিক্ষু অংশগ্রহণ করেন। কার্যকারক সভার আটজন ভিক্ষু হলেন : সবকামী, খুজশোভিত, সাল্হ, বস্তু, রেবত, সম্মুত সানবাসী, যশ এবং সুমন স্থবির। এই আটজন মহাপণ্ডিত ভিক্ষুর দ্বারা গঠিত কারক সভায় ‘দসবথুনী’ পুজানুপুজ্জ্বলাপে আলোচনা করা হয় এবং দসবথুনী বিনয় সম্মত নয় বলে ঘোষণা করা হয়। চূল্পবগ্গ গ্রহে উল্লেখ আছে যে, উক্ত সভায় রেবত থের সভাপতিত্ব করেন এবং সবকামী থের ধর্মাসন অলংকৃত করেন। প্রথম সঙ্গীতির অনুকরণে সমস্ত কার্যক্রম সুচারূপাপে সম্পন্ন হয়। এই সঙ্গীতি আট মাস চলেছিল। প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবাণী পুনরায় আবৃত্তি করে এ সঙ্গীতিতে ধর্ম-বিনয় হিসেবে সংগৃহীত হয়। সাতশো অর্হৎ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে এ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে এর নাম সপ্তশতিকা মহাসঙ্গীতি। ভিক্ষুদের প্রতিপালনীয় বিনয় প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়ায় এ সঙ্গীতিকে বিনয় সঙ্গীতিও বলা হয়।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির ফলাফল : এই সঙ্গীতিতে বজ্জিপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত দসবথুনী বিনয়সম্মত নয় বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম সঙ্গীতিতে সংগৃহীত বুদ্ধবাণী প্রকৃত বুদ্ধবাণী হিসেবে অনুমোদিত হয় এবং তা পুনরায় আবৃত্তি করে ধর্ম-বিনয়

হিসেবে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতির এই সিদ্ধান্ত এক দল মেনে নিতে পারেননি। তাঁদেরকে সম্ভব হতে বহিকার করা হয়। তাঁদের সংখ্যাও অনেক। তাঁরা নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতে থাকেন। ফলস্বরূপ তাঁরা আর একটি সঙ্গীতির আয়োজন করেন। কথিত আছে যে, সে-সঙ্গীতিতে দশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গীতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসম্ম্বন্ধ ‘স্থিবিবরবাদী’ ও ‘মহাসাঙ্গিক’ এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

‘দশবিঘ্নী’ কী?

দ্বিতীয় সঙ্গীতির কার্যকারক সভার সদস্যদের নাম লেখ

দ্বিতীয় সঙ্গীতিকে কেন সম্পত্তিকা সঙ্গীতি বলা হয়?

পাঠ : ৫

তৃতীয় সঙ্গীতি

তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ : সন্মাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সংরক্ষণ বেড়ে যায় এবং তাঁরা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। ফলে অন্যান্য ধর্মের বহু তীর্থিক বা সন্ন্যাসীগণ লাভ-সংরক্ষণের আশায় মন্তক মুণ্ডন এবং পাত্র-চীবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা অসদুপায় অবলম্বনপূর্বক বিহার ও মন্দির দখল করে বসবাস করতে থাকেন এবং ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। যেখানে-সেখানে ছদ্মবেশী ভিক্ষুরা গিয়ে উৎপাত করতে থাকেন। তাঁদের সংখ্যা দিন দিন বাঢ়তে থাকে। তাঁদের বিনয় বহির্ভূত আচরণে বিনয়ী ভিক্ষুরা কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ফলে সঙ্গে অরাজকতা দেখা দেয়। এ ছাড়াও সে সময় বৌদ্ধসম্ম্বন্ধ থায় আঠারো নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা প্রত্যেকে নিজেদের বুদ্ধের মতবাদের প্রকৃত অনুসারী বলে দাবি করতে থাকেন। ফলে কোনটি বুদ্ধের প্রকৃত মতবাদ তা নির্ণয় করা কঠিকর হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, এক নিকায়ের ভিক্ষু অন্য নিকায়ের ভিক্ষুর সঙ্গে বসবাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, বিনয়ী ভিক্ষুগণ ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্গে উপোসথ, প্রবারণা প্রভৃতি বিনয়কর্ম সম্পাদন করতে অস্বীকৃতি জানান। এসব অরাজক পরিস্থিতিই তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের অন্যতম কারণ।

তৃতীয় সঙ্গীতির সময়কাল, স্থান ও পৃষ্ঠপোষকতা :

সন্মাট অশোকের রাজত্বকালে মগধের রাজধানী পাটলীপুত্রের অশোকারামে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। সন্মাট অশোক এ সঙ্গীতিতে ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাছাড়া সঙ্গীতি সমাপ্ত হলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বিভিন্ন দেশে ধর্মদূত প্রেরণ করেন।

সঙ্গীতিকারক নির্বাচন ও কার্যক্রম : প্রকৃত বিনয়ী ভিক্ষুরা ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সঙ্গে উপোসথ, প্রবারণা ও পাতিমোক্ষ আবৃত্তি প্রভৃতি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পাদন করতে অস্বীকৃতি জানালে পাটলীপুত্র নগরের উপরে বর্ণিত ধর্মানুষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বৰ্জ থাকে। তখন ধার্মিক ভিক্ষুরা উপোসথ পালন করতে রাজি হলেন না। ফলে অনভিজ্ঞ মন্ত্রীর আদেশে বহু ধার্মিক ভিক্ষুকে হত্যা করা হয়। সন্মাট অশোক এ-খবর জ্ঞাত হয়ে খুবই মর্মান্ত হন। তিনি মনে মনে

ভাবলেন, তাঁর উদাসীনতার কারণে অনেক ভিক্ষুর প্রাণ সংহার হলো। এ পাপ কার্যের জন্য তিনি দায়ী কি না তা জানার জন্য মন্ত্রীকে প্রেরণ করে অহোগঙ্গ পর্বত হতে বৌদ্ধধর্মে পারঙ্গম মহাপঞ্চিত মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরকে আনয়ন করেন। মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির সমট্টি অশোককে জানালেন যে, পাপ চেতনা না থাকলে সেই কার্যে কোনো অপরাধ হয় না। অতঃপর, সন্ত্রাট অশোক তাঁর নিকট সংগ্রহব্যাপী বুদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করেন। তিনি মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের পরামর্শে এক এক জন ভিক্ষুকে পর্দার অন্তরালে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি “কোন মতবাদী।” ছদ্মবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুরা কেহই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেননি। কেবল বিনয়ী ভিক্ষুরা এক বাক্যে বললেন যে, তাঁরা “বিভাজ্যবাদী”। তখন সন্ত্রাট অশোক বুঝতে পারলেন, কারা প্রকৃত ভিক্ষু। তিনি অবিনয়ী ছদ্মবেশী ভিক্ষুদের খেতবন্ত পরিধানপূর্বক সজ্জ হতে বহিক্ষার করেন। জানা যায় যে, তাঁদের সংখ্যা ঘাট হাজারের অধিক। অতঃপর, সন্ত্রাট অশোক বিনয়ী ভিক্ষুদের বলেন, “ভঙ্গে ! এখন সজ্জ বিশুদ্ধ হয়েছে। ভিক্ষুসজ্জ উপোসথ কর্ম সম্পাদন করুন।” তৎপর বিশুদ্ধ সজ্জ একত্রিত হয়ে অশোকারাম বিহারে উপোসথ কর্ম সম্পাদন করেন।

সজ্জ বিশুদ্ধ হওয়ার পর মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলনের জন্য তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করেন। তিনি সঙ্গীতির জন্য ধর্ম-বিনয়ে পরদশী ত্রিবিদ্যাসম্পন্ন এক হাজার অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করেন। এ সঙ্গীতিতে মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবিরের সভাপতিত্বে প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির অনুকরণে ধর্ম-বিনয় সংগৃহীত হয়। এই সঙ্গীতিতে মোগ্গলীপুত্র তিষ্য স্থবির ‘কথাবথু’ নামক একটি প্রাচুর্য রচনা করেন। প্রাচুর্যিতে অন্যান্য মতবাদীদের মতামত খণ্ডন করে বিভাজ্যবাদীদের মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। বুদ্ধবাণীর সারমর্ম প্রতিফলিত হওয়ায় গ্রাহ্য অভিধর্ম পিটকের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নয় মাস ব্যাপী চলে এ সঙ্গীতি। স্মৃতিধর অর্হৎ ভিক্ষুগণ শুন্দ বুদ্ধবাণী পুনরায় স্মৃতিতে ধারণ করে নেন। এই সঙ্গীতিতে সর্বপ্রথম অভিধর্ম পিটকের উল্লেখ করা হয় এবং বুদ্ধবচনকে ‘ত্রিপিটক’ আখ্যা দেওয়া হয়।

ধর্মপ্রচারক প্রেরণ : এই সঙ্গীতির পরেই মহামতি অশোক ভিক্ষুসজ্জকে দেশবিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি ধর্মপ্রচারের জন্য ‘ধর্ম মহামাত্র’ নামে বিশেষ শ্রেণির রাজকর্মচারীও নিযুক্ত করেন। তাঁরা নগরে প্রাস্তরে সর্বত্র ধর্মনীতি প্রচার করতেন। তিনি শীয় পুত্র ও কন্যা যথাক্রমে মহেন্দ্র স্থবির ও ভিক্ষুণী সঙ্গমিত্রাকেও ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তৃতীয় সঙ্গীতির পর সন্ত্রাট অশোক যেসব দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন তা তুলে ধরা হলো :

ধর্ম প্রচারক	ধর্ম প্রচারের স্থান
মঞ্জুষ্ঠিক থের	কাশ্মীর ও গান্ধার রাজ্য
মহাদেব থের	মহিষমণ্ডল
রক্ষিত থের	বনবাসী
ধর্মরক্ষিত থের	অপরাস্তক
মহাধর্ম রক্ষিত থের	মহারাষ্ট্র
মহারক্ষিত থের	যোনলোক
মঞ্জুম থের	হিমবন্ত প্রদেশ
সোন ও উত্তর থের	সুবর্ণভূমি
মহান্দি থেরের নেতৃত্বে ইথিয়, উথিয় ভদ্দসাল, সম্বল এবং উপাসক সুমন	লক্ষ্মীপ

ত্রৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল : ত্রৃতীয় সঙ্গীতির ফলাফল নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. ছফ্ফবেশী অবিনয়ী ভিক্ষুদের সজ্জ হতে বহিকার করা হয়।
২. সঙ্গীতিকারক সব ভিক্ষু এক বাক্যে স্বীকার করে নেন যে, প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে গৃহীত ধর্ম বিনয়সমূহ তথাগত বুদ্ধের মুখনিঃস্তৃত বাণী ও উপদেশ।
৩. প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে যে ধর্ম-বিনয় আবৃত্তি ও গৃহীত হয়েছিল সেগুলো ত্রৃতীয় সঙ্গীতিতে আবার অনুমোদিত হয়।
৪. ত্রৃতীয় সঙ্গীতিতে প্রথম সঙ্গীতিতে আবৃত্তিকৃত বিনয়কে ঠিক রেখে ধর্মকে দুভাগে ভাগ করে সূত্র ও অভিধর্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়। ফলে বুদ্ধবাণী মোট তিন ভাগে বিভক্ত হয়। যথা—বিনয়, সুন্দ ও অভিধর্ম। এ তিনটি সংকলনের পর নামকরণ করা হয় ত্রিপিটক।

অনুশীলনমূলক কাজ

কতজন অর্হৎ ভিক্ষু ত্রৃতীয় সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণ করেন?

ত্রৃতীয় সঙ্গীতিতে যেসব স্থানে ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ : ৬

বুদ্ধবাণী প্রস্তাকারে সংকলনে সঙ্গীতির ভূমিকা

বুদ্ধ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব ধর্মোপদেশ দিতেন বুদ্ধশিষ্যগণ তা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন এবং মুখে-মুখে প্রচার করতেন। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের তিনমাস পর প্রথম সঙ্গীতিতে বিভিন্ন ভিক্ষু কর্তৃক স্মৃতিতে ধারণকৃত বুদ্ধের উপদেশসমূহ প্রথম সংকলন করে একত্র করা হয়। কালক্রমে এগুলোই বর্তমানকালের ত্রিপিটকের রূপ পরিষ্ঠাহ করে প্রস্তাকারে সংকলিত হয়। নানা কারণে মুখে-মুখে প্রচারিত যে-কোনো বিষয় বিকৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তন্মধ্যে অন্যতম কারণসমূহ হচ্ছে : ১. অন্যভাষার প্রভাব ২. একাধিক ভাষাভাষী লোকের সহাবস্থান ৩. উচ্চারণের দুর্বলতা ৪. বোঝার দুর্বলতা এবং ৫. ব্যাখ্যা করার দুর্বলতা। কঠস্তু বা স্মৃতিতে ধারণ করে মুখে-মুখে প্রচারিত হওয়ার কারণে বুদ্ধবাণীর ক্ষেত্রেও বিকৃতি বা অর্থাত্তর হওয়ার আশঙ্কা ছিল। দ্বিতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশো বছরের মধ্যে বিনয়ের কতিপয় বিধিবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে প্রথম সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ সজ্জ প্রথম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরায় প্রথম সঙ্গীতিতে সংকলিত বুদ্ধবাণী আবৃত্তি ও সংকলিত করে বিশুদ্ধতা রক্ষা করা হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের একশো বছরের মধ্যে বৌদ্ধসম্মজ্ঞ আঠারো নিকায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রতিটি নিকায়ের ভিক্ষুগণ নিজেদেরকে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর ধারক-বাহক হিসেবে প্রচার করতেন। তা ছাড়া, সন্তাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সংকার বেড়ে গেলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের অনেক তীর্থিক বা সন্ন্যাসী মস্তক মুণ্ডণ ও পাত্র চীবর ধারণ করে ভিক্ষু হিসেবে পরিচয় দিতে থাকেন। তাঁরা ধর্মকে অধর্ম এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতেন। ফলে কোনটি প্রকৃত বুদ্ধবাণী তা নির্ধারণ করা দুষ্কর হয়ে পড়ে। এক্রপ পরিস্থিতিতে ত্রৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুনরায় প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলন করা হয়। এরপর সন্তাট অশোক-পুত্র মহেন্দ্র থের তা সিংহলে নিয়ে যান। সেখানেও বুদ্ধবাণী কঠস্তু করে দীর্ঘদিন মুখে-মুখে প্রচার করা হয়। সেখানে যুদ্ধবিগ্রহ, দুর্ভিক্ষ এবং ভোগবাদী মানসিকতার কারণে বুদ্ধবাণী বিকৃত ও বিস্মৃত হওয়ার

সম্ভাবনা দেখা দেয়। তখন রাজা বটগামণী সিংহলে রাজত্ব করতেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় চতুর্থ সঙ্গীতি আয়োজন করে তালপত্রে বা ভূজপত্রে প্রথম বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয়, যা বর্তমানকালের ত্রিপিটকের ভিত্তি তৈরি করে। তখন থেকে তালপত্রে লিখিত বুদ্ধবাণীর পাঞ্চলিপি নকল করে, শিলালিপিতে খোদাই করে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বুদ্ধবাণী সংরক্ষণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু খোদাইকার বা লিপিকারের প্রমাদবশত ক্ষেত্রবিশেষে বুদ্ধবাণী অগুর্দভাবে উপস্থাপন হতে থাকে। ফলে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়। তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পুনরায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতির আয়োজন করা হয়। সেসব সঙ্গীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ তুলনামূলক পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে শুন্দভাবে বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়, যা আমরা বর্তমানে সহজে লাভ করতে এবং শিক্ষা করতে পাচ্ছি। অতএব বলা যায়, বুদ্ধবাণী গ্রন্থাকারে সংকলনের ক্ষেত্রে সঙ্গীতির ভূমিকা অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

কোথায় এবং কখন প্রথম বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল?
কী কী কারণে মুখে-মুখে প্রচারিত বিষয় বিকৃত হতে পারে?

পাঠ : ৭

সঙ্গীতির গুরুত্ব

বুদ্ধবাণী সংকলন, বিশুন্দভাবে সংরক্ষণ এবং প্রচার করাই সঙ্গীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু সঙ্গীতির পটভূমি ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় সঙ্গীতির গুরুত্বও বহুমাত্রিক রূপ পরিগ্রহ করে। সঙ্গীতির ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, প্রথম সঙ্গীতি বিক্ষিণ্ডভাবে ছড়িয়ে থাকা বুদ্ধবাণীকে সংকলিত করে বিস্মৃতি ও বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং বিশুন্দভাবে সংরক্ষণের পথ তৈরি করে। দ্বিতীয় সঙ্গীতি বুদ্ধ-প্রবর্তিত বিনয়কে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা করে। তৃতীয় সঙ্গীতি সঙ্গে বিরাজমান অরাজকতা দূর করে সংজ্ঞকে কল্যাণমুক্ত এবং বুদ্ধবাণীকে বিকৃতি ও পরিহানির হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চতুর্থ সঙ্গীতি বুদ্ধবাণীকে ভূজপত্রে বা তালপত্রে লিপিবদ্ধ করে স্থায়িত্ব প্রদান করে। পঞ্চম সঙ্গীতি বুদ্ধবাণীকে মার্বেল পাথরে খোদিত করে রেখে চিরস্থায়িত্ব প্রদান করে। ষষ্ঠ সঙ্গীতি দোষ-ক্রতিসমূহ দূরীভূত করে বুদ্ধবাণীকে নির্ভুলভাবে প্রকাশে সহায়তা করে। এসব বিবেচনা করে সঙ্গীতির গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। শুধু তাই নয়, সঙ্গীতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করলে প্রাচীন ভারত শ্রীলঙ্কা এবং মিয়ানমারের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, সঙ্গের উন্নব-বিকাশ, বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে রাজন্যবর্গের অবদান প্রত্তি সম্পর্কে জানা যায়। তাছাড়া, সঙ্গীতি সম্পর্কে অধ্যয়ন করলে উপরে বর্ণিত তিনিটি দেশের আর্থ-সামাজিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা এবং সংস্কৃতি সম্পর্কেও জ্ঞান আহরণ করা যায়। অতএব বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে সঙ্গীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সঙ্গীতির অবদান বর্ণনা কর

অনুশীলনী

শৃঙ্গস্থান পূরণ কর :

১. সঙ্গীতি হলো ভিক্ষু-সঙ্গের সর্বোচ্চ ----- সভা বা সম্মেলন।
২. ধর্ম বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বুদ্ধবানী ----- প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।
৩. সঙ্গীতি আরঙ্গের ঠিক আগে আনন্দ স্থবির ----- প্রাপ্ত হন।
৪. প্রথম সঙ্গীতি সম্পন্ন হতে ----- মাস সময় লেগেছিল।
৫. তাঁরা ধর্মকে এবং অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. প্রথম সঙ্গীতি কার পঠিপোষকতায় এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ?
২. বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুরা কেন অধর্মবাদী ?
৩. কেন এবং কার কাছে সন্তাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ?
৪. সঙ্গীতির মাধ্যমে কীভাবে বুদ্ধবাণী সংকলিত হয় ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. প্রথম সঙ্গীতির ফলাফল বর্ণনা কর।
২. “দশ বথুনী ” কাকে বলে এবং কী কী ? উল্লেখ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

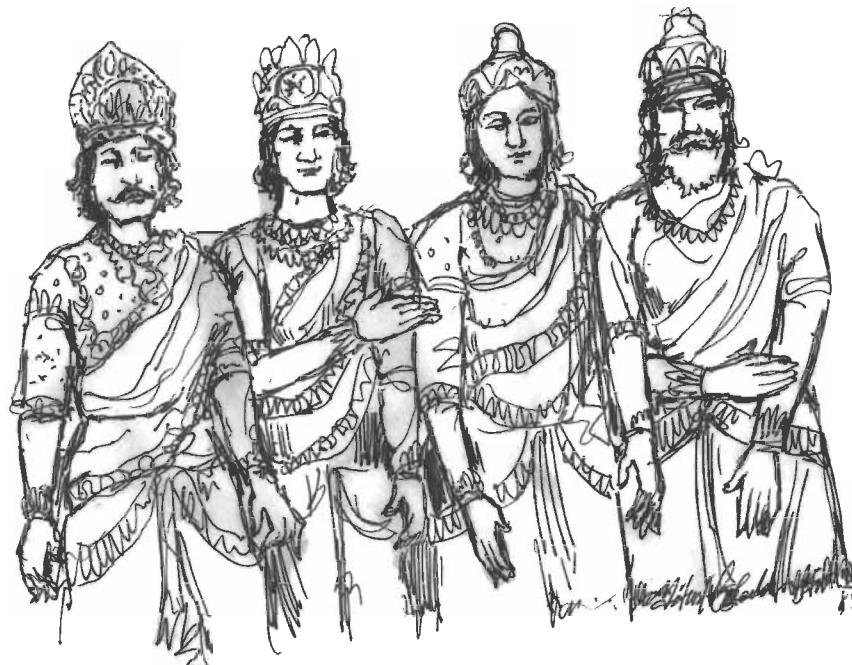
১। কে বুদ্ধের সর্বশেষ শিষ্য ছিলেন ?

- | | |
|---------------|-----------|
| ক. ধর্মরক্ষিত | খ. মহাদেব |
| গ. সুভদ্র | ঘ. আনন্দ |

২। দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বানের প্রধান কারণ কোনটি ?

- ক. যশ স্থবিরকে সংঘ থেকে বহিকার করা
- খ. দুর্বিনীত ভিক্ষুদেরকে স্থীরতি দেয়া
- গ. সভা আয়োজনের ব্যবস্থা করা
- ঘ. দসখুনীকে বিনয়-বহির্ভূত ঘোষণা করা।

নিচের ছবিটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



ছবি মডেল : (বাম থেকে) রাজা অজাতশত্রু, সম্রাট কালাশোক, সম্রাট অশোক, সম্রাট কণিষ্ঠ

৩। বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণে মডেলে উল্লিখিত শাসকগণ কী অবদান রাখেন ?

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ক. সঙ্গীত আহ্বানের | খ. সূত্র ও নীতিগাথা প্রচারে |
| গ. জাতকের উপদেশ প্রচারে | ঘ. অট্ঠকথার প্রসারে |

৪। উক্ত ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রধানত কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ?

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| ক. কর্মাঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করা | খ. সম্পদ বৃদ্ধি করা |
| গ. রাজ্যের সম্প্রসারণ করা | ঘ. ধর্মপ্রচার করা। |

সূজনশীল প্রশ্ন :

১। চার্ট - ১

ক্রমিক নং	বিষয়	সংখ্যা
১.	অংশগ্রহণকারী	৫০০ জন
২.	কার্যকাল	৪ মাস

চার্ট - ২

ক্রমিক নং	পদবি	ব্যক্তি
১.	সভাপতি	মোগগলীপুত্র তিষ্য
২.	প্রষ্ঠপোষক	সন্দ্রাট অশোক

- ক. দ্বিতীয় সঙ্গীতির পর ভিক্ষুসভ্য কয়তাগে বিভক্ত হয় ?
- খ. বৌদ্ধধর্মে সঙ্গীতি আহ্বানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
- গ. চার্ট-১ এ বর্ণিত তথ্যটি কোন সঙ্গীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সঙ্গীতি আয়োজনে চার্ট-২ -এ উল্লিখিত ব্যক্তিদের ভূমিকা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।
- ২। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় স্পীকার। জনগণের কল্যাণে ও এলাকার উন্নয়নে নির্বাচিত মাননীয় সংসদসদস্যরা সংসদ অধিবেশনে বিভিন্ন সমস্যা উত্থাপন করেন এবং তা যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে সর্বসমতিক্রমে গৃহীত, বাতিল ও সংশোধন করেন। পরিশেষে তা আইনে পরিণত হয়।
- ক. “কথাবথু” গ্রন্থটি কে রচনা করেন ?
- খ. ধর্ম মহাপাত্র বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত জাতীয় সংসদে আইন প্রণয়নের বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের কোন কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিত বহন করে ? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত কর্মকাণ্ডের ধর্মীয় গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ

ଜାତକ

‘ଜାତକ’ ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ ହଲୋ ଯେ ଜାତ ବା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେଛେ । କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧେର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବା ଜନ୍ମ-ଜନ୍ମାନ୍ତରେର ଜୀବନ-କାହିଁମୀର ଘଟନାପ୍ରବାହ ଜାତକ ନାମେ ଅଭିହିତ । ବୁଦ୍ଧ ହେଁଯାର ଆଗେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୌତମକେ ବହୁ କଳ୍ପକାଳ ନାନାକୁଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଧିଜ୍ଞାନ ବା ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ସାଧନା କରତେ ହେଁଇଲା । ବୋଧି ବା ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଲାଭେର ଜନ୍ୟ ଯେ ସତ୍ୱ ସାଧନାୟ ରତ ଥାକେନ ତାଙ୍କେ ବୋଧିସତ୍ୱ ବଲା ହୟ । ଏଜନ୍ୟ ପ୍ରତିଟି ଜନ୍ୟେ ତିନି ବୋଧିସତ୍ୱ ନାମେ ଅଭିହିତ । ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତରେର ଜୀବନପ୍ରବାହେ କର୍ମଫଲେର କାରଣେ ତିନି ରାଜା, ମହୀୟ, ଦେବତା, ବଣିକ, ଚଣ୍ଡଳ, ପଣ୍ଡ-ପାଖି ପ୍ରଭୃତି ନାନା କୁଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ ବୋଧିସତ୍ୱ ଜୀବନଚର୍ଚ କରେଛିଲେନ । ବୋଧିସତ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଦାନ, ଶୀଳ, ନୈକ୍ରମ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, କ୍ଷାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ସତ୍ୟ, ଭାବନା, ଅଧିଷ୍ଠାନ ଓ ଉପେକ୍ଷା-ଏଇ ଦଶବିଧ ପାରମିତା ଚର୍ଚା କରେ ତିନି ଚରିତ୍ରେର ଚରମୋତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରେନ । ଅତଃପର ଶେଷଜନ୍ୟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଜ୍ଞାସମ୍ପନ୍ନ ହେଁ ବୋଧିଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେନ ଏବଂ ସମ୍ୟକ ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ନାମେ ଥ୍ୟାତ ହୟ । ଜାତକେର କାହିଁନିଶ୍ଚଲୋତେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧେର ବୋଧିସତ୍ୱ ଜୀବନେର ନାନା ଘଟନାର ବର୍ଣନା ପାଓଯା ଯାଯ । ଜାତକେର ଆଖ୍ୟାନଶ୍ଚଲୋତେ ଦେଖା ଯାଯ, ତିନି କୋଥାଓ ଘଟନାର ପ୍ରଧାନ ଚରିତ୍ର, କଥିନେ ତିନି ଘଟନାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଆବାର କୋଥାଓ ତାଁର ଭୂମିକା ଗୌଣ । ଜାତକେର କାହିଁନିଶ୍ଚଲୋ ନୈତିକ ଓ ମାନବିକ ଶିକ୍ଷାଯ ସମ୍ବନ୍ଧ । ଜାତକେର ବିଶେଷତ୍ତ୍ଵ ହଲୋ ଗଲ୍ଲେର ଛଲେ ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶୁଦ୍ଧତା ଓ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ କରା । ବୁଦ୍ଧ ତାଁର ଶିଷ୍ୟ-ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଓ ଅନୁସାରୀଦେର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅତୀତ ଜୀବନେର ଘଟନାବଳି ବର୍ଣନା କରେ ନୈତିକ ଓ ମାନବିକ ଗୁଣାବଳିର ବିକାଶସାଧନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରତେନ । ଜାତକ ପାଠେ ସ୍ତର ଗୁଣାବଳିସମ୍ପନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଗଠନ କରା ଯାଯ ଏବଂ ସର୍ବଜୀବେର ପ୍ରତି ମୈତ୍ରୀ, କରନା ଜାଗ୍ରତ ହୟ । ଏହାଡା ଜାତକେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧେର ସମକାଲୀନ ଆର୍ଥ-ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ବହୁ ଶୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟେର ସନ୍ଧାନ ପାଓଯା ଯାଯ । ଜାତକେର ଭୂମିକା ଏଖାନେଓ ସୀମାବନ୍ଦ ନଯ । ଯେ ସମସ୍ତ କଥାସାହିତ୍ୟ ଲୋକପରମପାଦାରୀ ଚଲେ ଆସଛେ, ଆଦିମ ଅବସ୍ଥାଯ ଏଗୁଲୋର ସ୍ଵରପ କେମନ ଛିଲ, କୀଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତି ହଲୋ ଏବଂ ଏଗୁଲୋ ରଚନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୀ ଛିଲ ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ପର୍କେ ଜାନତେ ହଲେଓ ଜାତକେର ପଠନ-ପାଠନ ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶ୍ୱ-ସାହିତ୍ୟେର ଭାଙ୍ଗାରେ ଗଲ୍ଲ-ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ ପ୍ରଭୃତି ରଚନାର ଚିରଭିତ୍ତନ ଉତ୍ସ ହିସେବେଓ ଜାତକେର ଭୂମିକା ଅନନ୍ୟସାଧାରଣ । ଏ-କାରଣେ ଜାତକକେ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସେର ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ସ ବଲା ହୟ । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ଆମରା ଶୁକ ଜାତକ, ସେରିବାଣିଜ ଜାତକ, ଜନସଙ୍କ ଜାତକ ଏବଂ ସୁଖବିହାରୀ ଜାତକ- ଏଇ ଚାରାଟି ଜାତକ ପାଠ କରବ ।

ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷେ ଆମରା-

* ବୌଦ୍ଧ ଜାତକେର କାହିଁମୀ ବର୍ଣନା କରତେ ପାରିବ;

* ବୌଦ୍ଧ ଜାତକେର କାହିଁମୀ ଥେକେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟଶ୍ଚଲୋ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରତେ ପାରିବ ।

ପାଠ : ୧

ଶୁକ ଜାତକ

ଅନେକ ଅନେକ ଦିନ ଆଗେର କଥା । ବାରାଣସୀର ରାଜା ଛିଲେନ ବ୍ରକ୍ଷାଦତ୍ତ । ତଥନ ହିମବନ୍ତ ପ୍ରଦେଶେ ବୋଧିସତ୍ୱ ଶୁକ ପାଖିରଙ୍ଗେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେନ । ଶୁକ ପାଖିରଙ୍ଗୀ ବୋଧିସତ୍ୱ ଛିଲେନ ବଡ଼ଇ ବଲଶାଲୀ । ତିନି ହାଜାର ହାଜାର ଶୁକ ପାଖିର ଦଲପତି ଛିଲେନ । ଦଲପତି ଶୁକ ଓ ତାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଏକଟି ପୁତ୍ରସତ୍ତାନ ଛିଲ । ଉଭୟେ ସତ୍ତାନକେ ଆଦର-ସ୍ନେହେ ଲାଲନପାଲନ କରତେନ ।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে শুক ও তাঁর স্ত্রীর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে গেল। আগের মতো আর উড়তে পারেন না। মা-বাবাকে বাসায় রেখে শুকসন্তান খাবারের খোজে যেত। একদিন উড়ে যেতে যেতে দেখল, সমুদ্রবেষ্টিত একটি সরুজ দ্বীপ। দ্বীপটিতে ছিল একটি আমবন। সেখানে পাকা পাকা রসালো আম। সোনার মতো রং। সে মনের সুখে আমের রস খেল। মধুর মতো ঘিষ্ঠি সে রস। ফেরার পথে মা-বাবার জন্য পাকা আম নিয়ে এল।

বোধিসত্ত্ব আম খেয়েই বুঝতে পারলেন আমগুলো ছিল সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের।

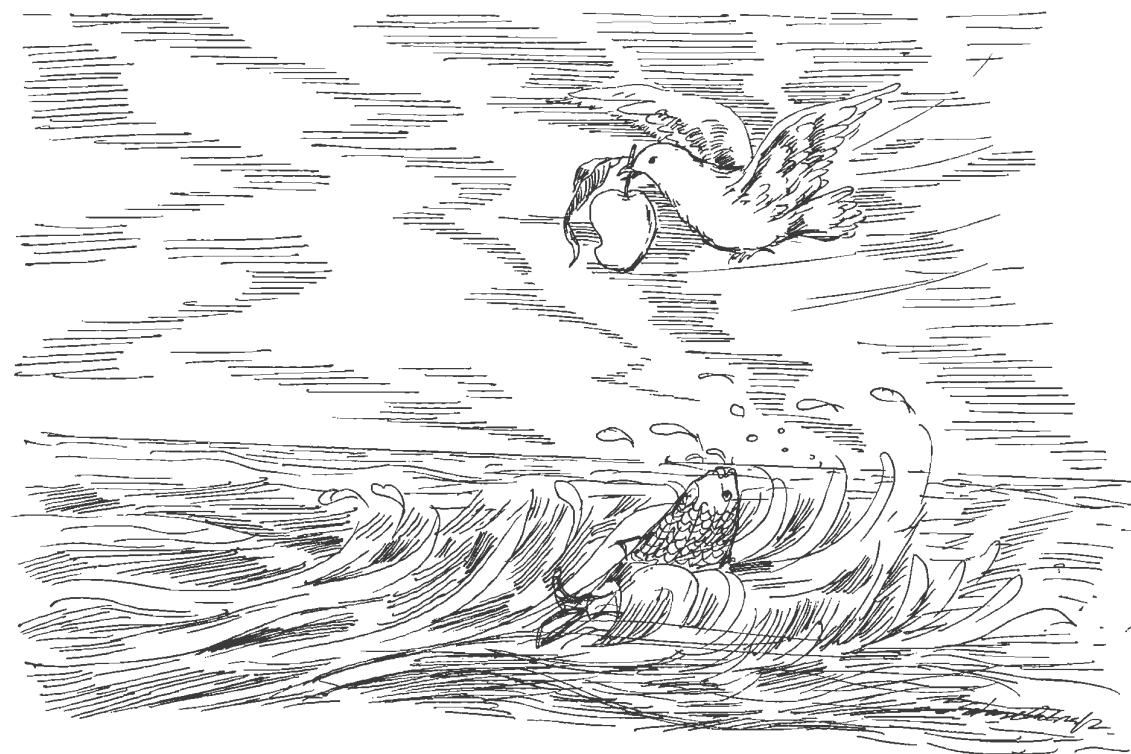
তিনি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমটি কি সেই সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের?

ছেলে বললো, হঁয় বাবা।

বোধিসত্ত্ব বললেন, দেখ বাবা, অতদূরে যাওয়া বড়ই কঠের। যেসব শুক ওই দ্বীপে যায়, তারা বেশিদিন বাঁচে না। তুমি আমাদের একমাত্র সন্তান। এই বৃক্ষ বয়সে আমাদের আর কেউ নেই। আর কোনোদিন ওই দ্বীপে যেও না।

কিন্তু শুক সন্তান মা-বাবার উপদেশ শুনলো না। লোভে পড়ে সে প্রায়ই ঐ দ্বীপে আমের রস খেতে যেত।

একদিন সে অনেক আমের রস খেল। এত বেশি খেল যে তার শরীর ভারী হয়ে গেল। তারপর বুড়ো মা-বাবাকে খাওয়ানোর জন্য সে ঠোঁটে একটি পাকা আম নিয়ে উড়তে আরম্ভ করল। দীর্ঘ পথ চলায় সে ক্লান্তি বোধ করছিল। তার দুচোখে ঘুম-ঘুম ভাব। তাই হঠাতে আমটি সমুদ্রে পড়ে গেল।



শুক পাখি মা-বাবার জন্য আম নিয়ে যাচ্ছে

ক্লান্তি ও ঘুমে সে চেনা পথ হারিয়ে ফেলল এবং নিচু হয়ে পানি স্পর্শ করে উড়তে লাগল। ক্লান্ত, শ্রান্ত শুকসন্তান এক সময়ে গভীর সমুদ্রে পড়ে গেল। তখনই সমুদ্রের একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। বোধিসত্ত্ব দেখলেন, বেলা যায়। সূর্য দুবে গেল। আন্তে আন্তে রাতও নেমে এল। তাঁদের সন্তান ফিরে এল না। তিনি বুবাতে পারলেন, সে সমুদ্রে পড়ে মারা গেছে।

মা-বাবা তার জন্য হাহাকার করতে লাগলেন।

তাঁদের দেখাশোনার আর কেউ রইল না। এক সময় বুড়ো মা-বাবা ক্ষুধা ও ত্রঃণায় মারা গেলেন।

উপদেশ : শুরুজনের কথা মেনে চলতে হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

শুকসন্তান মা-বাবার উপদেশ না শুনে কী করত?

বাবা-মাৰ উপদেশ না শোনায় শুক সন্তানের কী পরিণতি হয়েছিল লেখ।

পাঠ : ২

সেরিবাণিজ জাতক

বোধিসত্ত্ব একবার সেরিব নামক রাজ্যে ফেরিওয়ালা হয়ে জন্মেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল সেরিবান। সেই দেশে সেরিবা নামে আরও একজন ফেরিওয়ালা ছিল। সে খুবই লোভী ছিল। একবার বোধিসত্ত্ব সেরিবাকে সঙ্গে নিয়ে অঙ্গপুর নগরে বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন।

অঙ্গপুরে এক সময় এক ধনী শ্রেষ্ঠী পরিবার বাস করতেন। কিন্তু ধন-সম্পদ হারিয়ে সেই শ্রেষ্ঠী পরিবার গরিব হয়ে যায়। পরিবারের সব পুরুষ একে একে মারা যায়। সেই পরিবারে একটি ছোট মেয়ে ও বুড়ি ঠাকুরমা ছাড়া আর কেউ বেঁচে রইল না। তারা প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ করে অতি কষ্টে সংসার চালাত।

তাদের বাড়িতে একটি সোনার থালা ছিল। শ্রেষ্ঠী সেই সোনার থালায় ভাত খেতেন। শ্রেষ্ঠীর মৃত্যুর পর সেই থালার ব্যবহার আর কেউ করত না। এভাবে অনেক দিন ব্যবহার না করায় থালাটার গায়ে ময়লা জমে যায়। তারপর ভাঙা থালাবাটির সঙ্গে পড়ে থাকতে থাকতে সেটা আর সোনা বলেও মনে হতো না। বুড়ি ঠাকুরমাও থালাটির কথা ভুলে গিয়েছিলেন।

একদিন ফেরিওয়ালা লোভী সেরিবা ‘কলসি কিনবে, কলসি কিনবে’ বলতে বলতে সেই শ্রেষ্ঠীর বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ফেরিওয়ালার ডাক শুনে মেয়েটি ঠাকুরমাকে বলল, ও ঠাকুরমা, আমাকে একখানা গয়না কিনে দাও না।

ঠাকুরমা বললেন, আমরা গরিব মানুষ, পয়সা পাব কোথায়?

মেয়েটি তখন পুরানো ভাঙা থালাবাটির ভিতর থেকে সোনার থালাটি নিয়ে এসে বলল, এটা তো আমাদের কোনো কাজে লাগে না। এটি বিক্রি করে কিনে দাও না। ঠাকুরমা মেয়েটির কথায় রাজি হয়ে ফেরিওয়ালাকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, এই থালার বদলে আমার নাতনিকে একটা গয়না দেবেন?

ফেরিওয়ালা থালাটা উলটেপালটে দেখলো। দেখেই থালাটি সোনার বলে মনে হলো। তখন সে থালার পিছনে সুচ দিয়ে দাগ কেটে বুবল থালাটা সত্যিই সোনার। সঙ্গে সঙ্গে সে তাদের ঠকিয়ে জিনিসটা হাতিয়ে নেবে ঠিক করল। সে বলল, এর আবার দাম কী? সিকি পয়সায় নিলেও ঠকা হয় — এরপ বলে সে অবহেলার ভান করে থালাটা ফেলে দিয়ে চলে গেল।

একটু পরেই সেই পথ দিয়ে ফেরার পথে বোধিসত্ত্ব ‘কলসি কিনবে, কলসি কিনবে’ বলে ডাক দিলেন। ফেরিওয়ালার ডাক শুনে মেয়েটি ঠাকুরমার কাছে আবার গয়না কেনার বায়না ধরল।

বুড়ি ঠাকুরমা বললেন, নিজের কানেই তো শুনছ থালাটির কোনো দাম নেই। ঘরে বেচার মতো আর কোনো জিনিস তো নেই।

মেয়েটি বলল, সেই ফেরিওয়ালা ভালো না। ওর কথা শুনে গায়ে জ্বালা ধরে যায়। এই ফেরিওয়ালার ডাক কত মিষ্টি। এ বোধ হয় থালাটা নিতে রাজি হবে। একবার দেখি না।

বুড়ি বোধিসত্ত্বকে ডেকে বসতে বললেন। তারপর থালাটা তাঁর হাতে দিলেন। বোধিসত্ত্ব দেখামাত্রই বুবলেন থালাটা সোনার। তিনি বললেন, মা, এই থালার দাম লক্ষ টাকা। আমার কাছে এত টাকা তো নেই।

বুড়ি বললেন, একটু আগেই এক ফেরিওয়ালা এসেছিল। সে বলল, এর দাম সিকি পয়সাও নয়। বোধ হয় আপনার পুণ্য বলে থালাটা সোনার হয়ে গেছে। আমরা এটা আপনাকেই দেব। তার বদলে আপনি যা ইচ্ছে দিন। বোধিসত্ত্বের তখন নগদ পাঁচশত টাকা ও পাঁচশত টাকার জিনিসপত্র ছিল। তার থেকে তিনি মাত্র আটটি টাকা রাখলেন। তারপর সোনার থালাটা নিয়ে নদীর কূলে চলে গেলেন। ঘাটে খেয়ানৌকা ছিল। বোধিসত্ত্ব নৌকায় উঠে মাঝিকে বললেন, আমাকে নদী পার করে দাও ভাই।

এদিকে লোভী সেরিবা আবার বুড়ির বাড়িতে গেল। সে বলল, থালাটা দাও তো। ফিরে যেতে যেতে ভাবলাম থালাটার বদলে কিছু না দিলে ভালো দেখায় না। সেজন্য আবার এলাম। বুড়ি বললেন, সে কী কথা? তুমি না বললে ওটার দাম সিকি পয়সাও হবে না। এইমাত্র একজন সাধু ফেরিওয়ালা এসেছিলেন। বোধ হয় তিনি তোমার মনিব হবেন। তিনি সেটা হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে গেছেন।

বুড়ির কথা শোনা মাত্রই লোভী ফেরিওয়ালার মাথা ঘুরে গেল। সে তখন পাগলের মতো লাফালাফি শুরু করল। জিনিসপত্র, টাকাপয়সা যা ছিল ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর, হায়! আমার সর্বনাশ হয়েছে, সেরিবান ছলনা করে আমার লক্ষ টাকার সোনার থালাটা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। বলতে বলতে সে বোধিসত্ত্বকে ধরার জন্য নদীতীরের দিকে ছুটল। নৌকা তখন মাঝানদীতে চলে গেছে। সেরিবা পাগলের মতো চিংকার করে মাঝিকে বলতে লাগল, নৌকা ফেরাও, নৌকা ফেরাও। কিন্তু বোধিসত্ত্বের নিষেধ শুনে মাঝি নৌকা ফেরাল না।

মাঝি বোধিসত্ত্বকে নিয়ে নদীর অন্য কূলে চলল। লোভী সেরিবা সেই দৃশ্য ও সোনার থালার শোক সহ্য করতে পারল না। হতাশা ও রাগে তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ঘ হয়ে গেল। রক্তবর্মি করে সে মারা গেলো।



লোভী ফেরিওয়ালা মাঝিকে নৌকা ফেরাতে বলছে

বৌধিসত্ত্ব দানধর্ম ও সৎ কাজ করে সুকর্মফল ভোগ করে পরলোকে চলে গেলেন।

উপদেশ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

অনুশীলনমূলক কাজ

ফেরিওয়ালার পী বৌধিসত্ত্বের নাম কী ছিল?

সোনার থালা সম্পর্কে বৌধিসত্ত্ব বুড়িকে কী বললেন?

পাঠ : ৩

জনসঙ্গ জাতক

অনেক অনেক দিন আগের কথা। সে-সময়ে বারাণসীতে ব্রহ্মদণ্ড রাজত্ব করতেন। তখন বৌধিসত্ত্ব ব্রহ্মদণ্ড নামক রাজার পাটরানীর গর্তে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয়েছিল জনসঙ্গ। তিনি বড় হয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য তক্ষশীলা গমন করেন। সকল শিল্পশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে বারাণসীতে ফিরে আসেন। তিনি যেদিন ফিরে এসেছিলেন সেদিনই রাজা ব্রহ্মদণ্ড ছেলের সফলতায় কারাগার থেকে সমস্ত বন্দিকে মুক্তি দেন। তারপর তাঁকে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করেন। তাঁর শাসনে প্রজাগণ সুখেই কালযাপন করতে থাকেন।

অভিযানের কয়েক বছর পর তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। প্রজারা বৌদ্ধিসন্তুকে রাজা নির্বাচন করেন। তিনি নগরের চার দ্বারে, মাঝাখানে ও প্রাসাদের নিকটে ছয়টি দানশালা স্থাপন করে দৈনিক ছয় লক্ষ মুদ্রা দান দিতেন। এ মহাদান দেখে জমুনীপবাসী বিস্মিত হল। তাঁর শাসনগুণে প্রজারা সন্তুষ্ট হলো। চুরি ডাকাতি বন্ধ হলো। কোথাও বিবাদের লেশমাত্র ছিল না। কারাগার শূন্য হয়ে গেল।



জনসন্তুক রাজা প্রজাদের ধর্মোপদেশ দিচ্ছেন

বৌদ্ধিসন্তুক নিজে পঞ্চশীল রক্ষা করতেন। যথারীতি উপোসথ পালন করতেন। যথাধর্ম রাজ্যশাসনে মনোযোগী ছিলেন। সকলকে ধর্মপথে চলতে, সাধুভাবে নিজ নিজ কার্য সম্পাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে সর্বদা উপদেশ দিতেন।

একদিন রাজা জনসন্তুক পূর্ণিমার পঞ্চদশীয় উপসোথ দিনে উপোসথ ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি ভাবলেন, সমস্ত লোকের যাতে সুখ শান্তি মঙ্গল বর্ধিত হয়, যাতে তারা অপ্রমতভাবে চলে আমি তাদেরকে সেৱনপ উপদেশ দেব। তিনি ভেরি বাজিয়ে অন্তঃপুর ও নগরবাসীকে সমবেত করালেন। তিনি রাজাঙ্গনে অলংকৃত রাজপালকে উপবেশন করে নগরবাসীকে উদ্দেশ করে বললেন, নগরবাসীগণ, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর :

১. বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা কর।
২. যৌবনে ধন উপার্জন কর।
৩. কৃটিলক্রম ও কুপ্রবৃত্তি পরিহার কর।
৪. নিষ্ঠুর ও ক্রোধপরায়ণ হয়ো না।

৫. মাতাপিতার সেবায় অবহেলা কোরো না।
৬. গুরুর নিকট শিক্ষা কর।
৭. শ্রমণ-ব্রাহ্মণ ও সাধুসঙ্গকে সম্মান প্রদর্শন কর।
৮. প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাক।
৯. কৃপণতা পরিহার করে খাদ্যভোজ্য ও পানীয় দান কর।
১০. অন্য পুরুষ বা মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরদার লজ্জন কোরো না। অপ্রমত্ত হও। দশবিধি কর্তব্য সম্পাদন কর।

রাজার উপরোক্ত উপদেশ পরবর্তীকালে ‘দশরাজধর্ম’ বা ‘দশবিধি কর্তব্য’ নামে পরিচিতি লাভ করে। রাজা সৎ উপদেশ দানের পাশাপাশি নিজেও সৎ জীবনযাপন করতেন এবং ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

রাজার উপদেশ শুনে জনগণও ধর্ম ও ন্যায়ের সঙ্গে জীবনযাপন করে সুখে বসবাস করতে থাকেন।

উপদেশ ৪ রাজা ধার্মিক হলে প্রজারাও ধার্মিক হন।

অনুশীলনযুক্ত কাজ

জনসন্ধি কে ছিলেন?

দশরাজধর্ম বা দশবিধি কর্তব্যগুলো কী কী লেখ।

পাঠ : ৪

সুখবিহারী জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদণ্ডের সময় বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ঘর সংসার খুব দুঃখময়, গৃহত্যাগ বরং সুখকর - এই ভেবে তিনি হিমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। অবশেষে তিনি ধ্যান ও আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। তাঁর পাঁচশত তপস্থী শিষ্য ছিল।

একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব শিষ্যসহ হিমালয়ে গিয়ে পৌঁছেন। সেখান থেকে নগর ও জনপদে ভিক্ষা করতে করতে বারাণসীতে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে তিনি রাজার উদ্যানে অতিথি হয়ে বর্ষার চার মাস অতিবাহিত করেন। তারপর তিনি বিদায় নেওয়ার জন্য রাজার কাছে গেলেন।

রাজা বললেন, আপনি বুড়ো হয়েছেন। এই বয়সে আপনি হিমালয়ে ফিরে যাবেন কেন? শিষ্যদের হিমালয়ের আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এখানে থাকুন।

রাজার অনুরোধে তিনি রাজি হলেন। তখন তিনি জ্যেষ্ঠ শিষ্যকে বললেন, তোমার ওপর পাঁচশো শিষ্যের দেখা শোনার ভার দিলাম। তুমি তাদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যাও। আমি এখানে থাকব।

বৌদ্ধসম্বৰের এই জ্যেষ্ঠ শিষ্য আগে রাজা ছিলেন। রাজত্ব ছেড়ে এসে তিনি প্রবৃজ্যা গ্রহণ করেছেন। ধ্যানসাধনা করে তিনি আট রকম ধ্যানফলের অধিকারী হন। তিনি গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যান। সেখানে তপস্থীদের সঙ্গে থাকতে থাকতে তিনি একদিন গুরুদেবকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এখানে ভালোভাবে থেকো। আমি একবার গুরুদেবকে বন্দনা করে আসি।

এই বলে তিনি বারাণসীতে গিয়ে গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হন। গুরুদেবকে বন্দনা করে কৃশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। তারপর পাশে একথানা মাদুর পেতে শুয়ে পড়েন। ঠিক এ-সময় তপস্থীর সঙ্গে দেখা করার জন্য রাজাও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি তপস্থীকে বন্দনা করে এক পাশে উপবেশন করলেন।



তপস্থী ধ্যান-সমাধির সুখে বিভোর

নবাগত তপস্থী রাজাকে দেখেও বিছানা ছেড়ে উঠলেন না। আয়েশ করে শুয়ে থেকে তিনি বলতে লাগলেন, আহা কী সুখ, আহা কী সুখ! রাজা ভাবলেন তপস্থী বোধ হয় তাঁকে অবজ্ঞা করছেন। তা না হলে এভাবে আহা কী সুখ, আহা কী সুখ বলছেন কেন?

বৌদ্ধসম্বৰ বললেন, মহারাজ, এই তপস্থী আগে আপনার মতো রাজা ছিলেন। কিন্তু তপস্থী হয়ে এখন যে-সুখ পেয়েছেন রাজ্য-সুখ ভোগ করার সময় তা পালনি। রাজসুখ তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হচ্ছে। প্রবৃজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান-সমাধির বিমল সুখে তিনি এখন বিভোর। সেজন্যই হৃদয়ের উচ্ছ্঵াসে এরকম বলছেন— এক্রূপ বলে বৌদ্ধসম্বৰ রাজাকে ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্য এই গাথা বললেন,

রক্ষকের প্রয়োজন নাহি যার হয়,
অপরের রক্ষা হেতু বিব্রত যে নয়,
কামনা-অতীত সেই পুরুষ-প্রবর,
অপার সুখের স্বাদ পায় নিরস্তর।

অর্থাৎ যাঁর মধ্যে কামনা-বাসনা নেই তিনিই প্রকৃত সুখী। তিনি কারো ছায়ায় নিজেকে রক্ষা করার কথা ভাবেন না। নিজের জন্য কিছু করার কথা তিনি চিন্তা করেন না।

এই ধর্ম উপদেশ শুনে রাজা বোধিসত্ত্বকে প্রণাম নিবেদন করে প্রাসাদে চলে গেলেন। তপস্থীও বোধিসত্ত্বকে বন্দনা করে হিমালয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে থেকে গেলেন। তিনি পূর্ণ বয়সে পূর্ণ জ্ঞানে দেহত্যাগ করে ব্রহ্মালোকে চলে গেলেন।

উপদেশ : ভোগে নয়, ত্যাগেই সুখ।

অনুশীলনমূলক কাজ

বোধিসত্ত্ব কেন হিমালয়ে চলে যান?
রাজা কেন তপস্থীকে দেখে রেগে গেলেন?

অনুশীলনী

শুণ্যস্থান পূরণ কর :

১. তিনি হাজার হাজার শুক পাখির ----- ছিলেন।
২. শ্রেষ্ঠী সেই----- থালায় ভাত খেতেন।
৩. শ্রমণ, ব্রাক্ষণ ও -----সম্মান প্রদর্শন কর।
৪. অবশ্যে তিনি ধ্যান ও ----- ধ্যানফলের অধিকারী হন।
৫. যাঁর মধ্যে ----- নেই তিনিই প্রকৃত সুখী।।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. শুক সন্তান আমের রস খেতে কোথায় যেত ?
২. বৃড়ি ঠাকুরমার সোনার থালার দাম কত ?
৩. লোভী ফেরিওয়ালার লোভের পরিণতি কী হলো ?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. বোধিসত্ত্ব শুক সন্তানকে কী উপদেশ দিয়েছিলেন এবং কেন ?
২. ‘লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু’ কথাটি সেরিবানিজ জাতক অবলম্বনে ব্যাখ্যা কর।
৩. দশরাজধর্মের গুরুত্ব বাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। সুখবিহারী জাতকে বোধিসত্ত্ব গৃহত্যাগ করে কোথায় চলে গেলেন ?

- | | |
|--------------|----------------|
| ক. গভীর বনে | খ. হিমালয়ে |
| গ. নদীর তীরে | ঘ. বৌদ্ধবিহারে |

২। তপস্থী : আহা কী সুখ ! — এ কথাটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

- ক. রাজাকে অবজ্ঞা করার
- খ. রাজ্যসুখ ভোগ করার
- গ. ধ্যান সমাধির সুখে বিভোর হওয়ার
- ঘ. রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উভয় দাও :

সীমান্ত বড়য়া পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর পিতা দুইটি গার্মেন্টস শিল্পের মালিক। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি গার্মেন্টস দুইটির মালিক হন এবং নিয়মনীতি পালনে সক্রিয় ছিলেন। তিনি কর্মচারীদের সম্মান করতেন এবং শীল পালনে ও সৎভাবে স্ব-স্ব কাজ সম্পাদনের উপদেশ দিতেন।

৩। সীমান্ত বড়য়ার সাথে জাতকে কোন রাজার চরিত্রের মিল পাওয়া যায় ?

- | | |
|------------|---------------|
| ক. জনসন্ধি | খ. বেস্সান্তর |
| গ. শিবি | ঘ. ইন্দ্ৰ |

৪। সীমান্ত বড়য়ার উপদেশ পালনে কর্মচারীদের জীবন হতে পারে —

- i. সুখকর
- ii. শান্তিপূর্ণ
- iii. মঙ্গলময়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন :

১। সৌরভ চাকমা বৃন্দ মা-বাবার দেখাশুনা ও সেবাশুভ্রা করতেন। বন থেকে কাঠ কেটে এনে বিক্রি করে পরিবার ভরণপোষণ করতেন। একদিন বাবা বললেন, “লোভের বশবর্তী হয়ে তুমি গভীর বনে যাবে না, সেখানে গেলে কেউ জীবন নিয়ে ফিরে আসে না।” তবুও প্রচুর কাঠ সংগ্রহের আশায় সে গভীর বনে প্রবেশ করলে বিষধর সাপের কামড়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

ক. জাতক কী ?

খ. রাজা ব্রহ্মদত্ত সমন্ত বন্দিকে মুক্তি দেন কেন ?

গ. সৌরভ চাকমার সাথে জাতকে কার চারিত্রের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সৌরভের বাবার উপদেশ যুক্তিসংগত, কথাটি জাতকের উপদেশের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বৌধিসত্ত্ব বণিক হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন। হঠাৎ বণিকের মৃত্যু হওয়াতে তাঁর পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। মৃত্যুর পর বৌধিসত্ত্ব সুবর্ণ হংস হয়ে জন্ম নেন। বৌধিসত্ত্ব তাঁর পূর্ব জন্মের পরিবারের অসহায়ত্বের কথা জানতে পেরে একটি করে সোনার পালক বণিকের স্ত্রীর নিকট পৌঁছে দেন, বণিকের স্ত্রী তা বিক্রি করে সংসার চালাত। কিন্তু স্ত্রী ছিল লোভী। একসাথে সব পালক নিতে গিয়ে সুবর্ণ হংসকে মেরে ফেলল। তখন সে হায়! হায়! করতে লাগল।

ক. সুখ বিহারী জাতকের উপদেশ কী ?

খ. জাতকের পঠন-পাঠন আবশ্যক কেন ? ব্যাখ্যা কর।

গ. বণিকের স্ত্রীর সাথে জাতকে কার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায় – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “বণিকের স্ত্রীর শেষ পরিণতি জাতকের সেরিবা ফেরিওয়ালার সাথে সম্পৃক্ত” – এ কথাটির সাথে তুমি কি একমত ? উত্তরের স্বপক্ষে মতামত দাও।

দশম অধ্যায়

চরিতমালা

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অনেক রাজা, মন্ত্রী, শ্রেষ্ঠী, উপাসক-উপাসিকা, ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের কর্ম ও অবদানের স্থিরভিত্তিক বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা এখনও অমর হয়ে আছেন। বৌদ্ধসাহিত্যে এসব মহান ব্যক্তির জীবনচরিত পাওয়া যায়। তাঁদের জীবনাদর্শ অনুকরণীয়, যা অধ্যয়ন করে নৈতিক ও মানবিক জীবন গঠন করা যায়। এ অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন, বুদ্ধশিষ্য পূর্ণিকা থেরী, বিশিষ্ট উপাসিকা বিশাখা, রাজা প্রসেনজিত, এবং বাঙালির কুলগোরব ভিক্ষু শীলভদ্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * বৌদ্ধ মনীষীদের পরিচয় দিতে পারব;
- * দের-থেরী ও বিশিষ্ট মনীষীদের জীবনী পাঠ করে তাঁদের আদর্শ ও জীবন চরিত ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন

বুদ্ধ-প্রবর্তিত সঙ্গে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের অবস্থান ছিল শীর্ষে। তাঁরা ছিলেন বুদ্ধের অঞ্চলাবক। শ্রা঵ক শব্দের অর্থ হলো শিষ্য বা যিনি ধর্মীয় বিষয় শ্রবণ-ধারণ-পালন করেন। অতএব, অঞ্চলাবক হলো শিষ্যদের মধ্যে অঞ্চল্য। বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ, ধারণ ও পালনে বুদ্ধশিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন অঞ্চল্য ছিলেন। সারিপুত্র জনে এবং মৌদগল্যায়ন ঝান্দিশক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অঞ্চলাবক সারিপুত্র ধর্মসেনাপতি নামেও পরিচিত ছিলেন। ধর্ম দেশনার সময় সারিপুত্র বুদ্ধের ডানদিকে মৌদগল্যায়ন বাম দিকে বসতেন। তাই তাঁদের বুদ্ধের দক্ষিণ ও বাম হস্ত হিসেবে অভিহিত করা হতো।

সারিপুত্রের গৃহী নাম ছিল উপতিষ্য। সারি ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে তাঁকে সারিপুত্র বলা হতো। তিনি নালন্দা ও ইন্দ্ৰশিলাৰ মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত উপতিষ্য গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো কোনো তথ্যমতে, তিনি নালক নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উপতিষ্য নামেও পরিচিত ছিল। সম্ভবত এটি ছিল তাঁর প্রকৃত নাম। কিন্তু পালি সাহিত্যে তাঁকে এ-নামে অভিহিত করতে তেমন একটা দেখা যায় না। গ্রামের নামের সাথে ব্যক্তির নামের সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি সম্ভান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। কিংবা তাঁদের বংশের নামেই গ্রামটি পরিচিত ছিল। তাঁর পিতার নাম জানা যায় না। তবে তিনি একজন উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। সাপিরপুত্রের তিন ভাই ও তিন বোন ছিলেন। ভাইদের নাম ছিল চুন্দ, উপসেন এবং রেবত। বোনদের নাম ছিল চালা, উপচালা এবং শিশুপচালা। তাঁর সকল ভাই-বোন বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হন। সারিপুত্র খুবই প্রত্যঙ্গমতি ছিলেন।

অপরদিকে, মোগগলী ব্রাহ্মণীর পুত্র ছিলেন বলে মৌদগল্যায়নকে মোগগলীপুত্র বলা হতো। তিনি সারিপুত্রের জন্মদিনে রাজগৃহের কোলিত নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সে-গ্রামের প্রধান ব্যক্তিত্ব। সম্ভবত তাঁর বংশের নামে গ্রামটির নামকরণ করা হয়েছিল। গ্রামের ঐতিহ্যসম্পন্ন কুল বা বংশের পুত্র ছিল বলে তাঁকে কোলিত নামেও ডাকা হতো।

সারিপুত্রের পরিবারের সঙ্গে মৌদগল্যায়নের পরিবারের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক ছিল। ফলে তাঁরা দুজনেই ছেলেবেলা থেকে পরম বন্ধু ছিলেন। দুজনে বাস করতেন পাশাপাশি দুটি গ্রামে। তাঁরা প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী ছিলেন।

একদিন দুই বন্ধু একত্রে একটি নাটক দেখতে যান। নাটক দেখে তাঁদের মনে বৈরাগ্য ভাব জাগ্রত হয়। তাঁরা সংসার জীবনের প্রতি বীতশ্বদ হয়ে সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অতঃপর গৃহত্যাগ করে তাঁরা সঞ্চয় বেলট্টপুত্রের শিষ্যত্ব বরণ করেন। সঞ্চয় বেলট্টপুত্র ছিলেন একজন পরিব্রাজক ব্রাহ্মণ। অন্ন দিনের মধ্যে তাঁরা গুরুর কাছ থেকে সব বিদ্যা শিখে নেন। তাঁরা গুরুকে জিজ্ঞেস করেন, আচার্য, এতে তো পরম মুক্তির কোনো সন্ধান নেই। আমরা এমন কিছু লাভ করতে চাই, যা লাভ করলে বারবার জন্ম দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করতে হবে না। গুরু সঞ্চয় বেলট্টপুত্র এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকেন। তিনি ছিলেন মূলত ‘বিক্ষেপবাদী’ বা ‘সংশয়বাদী’। এ মতবাদীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না, সর্বদা ইতস্তত অবস্থায় থাকেন। অতঃপর, সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন সমগ্র জন্মুদ্ধীপ পরিভ্রমণ করে বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে থাকেন। কিন্তু কারো নিকট সন্তোষজনক উত্তর ও মুক্তিপথের সন্ধান পেলেন না। তারপর তাঁরা দুজন দুই পথে যাবার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রত্যাশিত পথপ্রদর্শক গুরুর সন্ধান পেলে একে অপরকে জানাবেন— এরপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দুজন দুই দিকে যাত্রা করেন।

যাত্রার কিছুদিন পর সারিপুত্র রাজগৃহে বিচরণ করছিলেন। সেখানে একদিন বুদ্ধের শিষ্য অশ্বজিৎ ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করছিলেন। এমন সময় অশ্বজিৎ-এর সঙ্গে সারিপুত্রের দেখা হয়। অশ্বজিৎ-এর সৌম্য চেহারা দেখে সারিপুত্র মুক্ত হন। তিনি অশ্বজিৎকে জিজ্ঞেস করেন, ভন্তে, আপনি কার শিষ্য? আপনার শাস্তা কে? তিনি কোন বাদী? অশ্বজিৎ বলেন, শাক্যবংশীয় মহাশ্রমণ গৌতম সম্যক সমুদ্ধ আমার গুরু। সারিপুত্র তখন বুদ্ধের ধর্মমত জানতে চান। তখন অশ্বজিৎ তাঁকে বুদ্ধভাষ্যত একটি গাথা বলেন। গাথাটির মর্মবাণী হলো : পৃথিবীর সকল কিছুর উৎপত্তির সাথে কারণ নিহিত থাকে। কারণ ছাড়া কোনো কিছুই উৎপন্ন হয় না। বুদ্ধ বলেছেন, সেই কারণেরও নিরোধ আছে। পরম নির্বাণ লাভের মাধ্যমেই এই শাস্তি অর্জিত হয়। এটিই বুদ্ধের মতবাদ। অতএব বুদ্ধ নির্বাণবাদী। গাথাটি শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্নোতাপন্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। অতপর সারিপুত্র গিয়ে মৌদগল্যায়নকে বিষয়টি জ্ঞাত করেন। সারিপুত্রের কাছে মৌদগল্যায়ন গাথাটি শ্রবণ করে স্নোতাপন্তি ফল লাভ করেন। অতঃপর তাঁরা বুদ্ধের কাছে যাওয়ার জন্য স্থির করেন। সারিপুত্র কৃতজ্ঞতাস্বরূপ গুরু সঞ্চয় বেলট্টপুত্রকেও বুদ্ধের কাছে নিয়ে যেতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। কিন্তু অনেক অনুয়ায় করার পরও তিনি বুদ্ধের কাছে যেতে রাজি হলেন না। তখন সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন সঞ্চয় বেলট্টপুত্রের পাঁচশত শিষ্যসহ বুদ্ধের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এতে সঞ্চয় বেলট্টপুত্র অত্যন্ত দণ্ডিত ও ক্ষুক্ষ হলেন। সে-সময় বুদ্ধ সারনাথে ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ দেশনা করে রাজগৃহের বেগুবন আরামে সশিষ্য বসবাস করছিলেন।

সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন অনুগামীদের নিয়ে রাজগৃহে বুদ্ধের সমীপে পৌছলেন। এ সময় বুদ্ধ শিষ্যদের ধর্মদেশনা করছিলেন। বুদ্ধ দূর থেকে তাঁদের আসতে দেখেন এবং দিব্য জ্ঞানে তাঁদের অভিলাষ জ্ঞাত হলেন। বুদ্ধ তাঁদের ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষিত করলেন। সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন ব্যতীত অনুগামীগণ দীক্ষাস্থলেই অর্হত ফল লাভ করলেন। দীক্ষিত হওয়ার সাত দিনে মৌদগল্যায়ন এবং পনেরো দিনে সারিপুত্র অর্হত ফলে উন্নীত হন। দীক্ষার দিন ভিক্ষু-ভিক্ষুণী সমাবেশে বুদ্ধ সারিপুত্র এবং মৌদগল্যায়নকে অগ্রাবক হিসেবে ঘোষণা করে পাতিমোক্ষ দেশনা করেন। এই পদ লাভের জন্য তাঁদেরও জন্মজন্মান্তরের সাধনা ছিল। বুদ্ধের ভিক্ষুসঞ্চের মধ্যে আশিজন মহাশ্রাবক ছিলেন। তাঁদের মধ্যে এ দুজন ছিলেন অগ্রশ্রাবক।

সারিপুত্র ছিলেন মহাপ্রজ্ঞাবান। তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ভাষণগুলো তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করতে পারতেন। সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ হলো : “মানুষ মরণশীল। যে-কোনো সময় মানুষের মৃত্যু হতে পারে। তাই শীলাদি ধর্ম পরিপূর্ণ কর। যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ কর। দুঃখে পতিত হয়ে বিনাশ প্রাপ্ত হয়ো না। শক্রর ভয়ে নগরের ভিতর-বাহির যেমন সুরক্ষিত করা হয়, তেমনি নিজেকে সুরক্ষিত করে সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত রাখো। যারা শীলাদি পালন করে না, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করে না, তারা নরকে পতিত হয়ে শোক করে থাকে।”

মৌদগল্যায়ন ছিলেন খন্দিশাঙ্কিতে অদ্বিতীয়। প্রজ্ঞায় সারিপুত্রের পরে ছিল তাঁর স্থান। এই খন্দিশাঙ্কিই ছিল তাঁর অফুরন্ত কর্মশক্তির উৎস। খন্দিশাঙ্কিতে তিনি স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই ত্রিভুবন ঘুরে ঘুরে বুদ্ধের ধর্মপ্রচার করতেন। এমনকি নরকে গিয়ে নারকীয় দুঃখ দেখে এসে অন্যদের কাছে উপদেশ দিতেন। এজন্য তার দেশনা ছিল সবসময় চিন্তিত্বাত্মক। তাঁর দেশনায় নতুন নতুন বিষয় যেমন উপস্থাপিত হতো তেমনি পরিবেশন করা হতো সরল ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যায়।

অর্থত্ত ফলে উল্লীল হয়ে মৌদগল্যায়ন তাঁর অনুগামী ভিক্ষুদের উদ্দেশে গাথায় তাঁর অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। এতে তাঁর জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতাও নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর ভাষিত কয়েকটি গাথার সারমর্ম এখানে তুলে ধরা হলো : “এ দেহ অশুচি, দুগঙ্কপূর্ণ, বিষ্ঠা ও কৃমিকুলের আধার। এ দেহের প্রতি কেন মমতা করছ। শরীরের নয় দ্বার দিয়ে দিবারাত অশুচি নির্গত হচ্ছে। বিষ্ঠা দেখে যেমন সবাই এড়িয়ে চলে, তেমনি ভিক্ষুগণ এই অশুচিপূর্ণ দেহকে বর্জন করে।”

সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন এই দুই অগ্রশাবক বুদ্ধের পূর্বে পরিনির্বাণ লাভ করেন। সারিপুত্রের পনেরো দিন পর মৌদগল্যায়ন পরিনির্বাণ লাভ করেন। অর্থত্ত ফলে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে তাঁরা তাঁদের মৃত্যু সম্পর্কে জাত ছিলেন। তাই পরিনির্বাণের পূর্বে যথাসময়ে তাঁরা বুদ্ধকে বন্দনা করে যথাপোযুক্ত স্থানে পরিনির্বাণের অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন। সারিপুত্র থের নির্বাণপ্রাপ্ত হন নিজ জন্মস্থানে মাত্রগৃহে। মৌদগল্যায়ন থের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলে কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করেন। কারণ অতীতজন্মে তিনি তাঁর স্ত্রীর প্ররোচনায় বয়োবৃদ্ধ অঙ্গ পিতামাতাকে গভীর বনে জন্ম-জানোয়রের সামনে মৃত্যুর মুখে ফেলে এসেছিলেন। পরিণতিতে তাঁকেও এভাবে মৃত্যুবরণ করতে হলো। মৌদগল্যায়নের পরিব্রহ্ম দেহধাতু বুদ্ধের নির্দেশে বেগুন বিহারের পূর্বদ্বারে রাখা হয়। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক তথাগত বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে সারিপুত্রের দেহভস্মের ওপর শ্রাবণ্তীতে এক স্তুপ নির্মাণ করেছিলেন। এই দুই অগ্রশাবক প্রাঞ্জল ভাষায় বুদ্ধবাণী ব্যাখ্যা করতে পারতেন। মহৎ কর্মের জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা অমর হয়ে আছেন।

তথাগত বুদ্ধের অগ্রশাবক সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের জীবন-চরিত পাঠে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, একাগ্রতা ও অধ্যাবসায় থাকলে অবশ্যই মানুষ অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছুতে পারে এবং মানুষের জীবনের কোনো কর্মই বৃথা যায় না। ভালো বা মন্দ কর্মের জন্য যথাপযুক্ত ফল রয়েছে। যেমন অতীত কর্মের জন্য মৌদগল্যায়নকে ঘাতকের হাতে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। তাই গোপনে বা কারো দ্বারা প্রয়োচিত হয়ে কখনোই কোনো মন্দ কাজ করা উচিত নয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়ন প্রথমে কার শিষ্য ছিলেন?

সম্ভব্য বেলট্যুটীপুত্র কোন মতবাদী ছিলেন?

সারিপুত্রের প্রধান উপদেশ কী ছিল?

মৌদগল্যায়ন ভাষিত গাথাগুলোর মর্মকথা লেখ।

পাঠ : ২

বিশাখা

বুদ্ধের সময় অগ্রবাজের ভদ্বিয় নগরে উচ্চবৎশজাত ধনবান এক উপাসক ছিলেন। তাঁর নাম ছিল মেণ্টক শ্রেষ্ঠী। ধনঝয় নামে তাঁর এক পুত্র ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সুমনাদেবী। তাঁরা অত্যন্ত ধার্মিক এবং দান ও সেবাপ্রায়ণ ছিলেন। তাঁদেরই কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিলেন বিশাখা। ছোটকাল থেকে বিশাখা অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। দান ও বিবিধ কল্যাণকর্মের জন্য তাঁর খুবই সুখ্যাতি ছিল দানকর্ম ও ভিক্ষুসভ্যকে সেবা করার জন্য বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

এক সময় সেল নামক এক ব্রাহ্মণ ও তাঁর অনুগামী প্রায় তিন শতাধিক শিষ্যকে দীক্ষা প্রদানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বুদ্ধ সশিয় ভদ্বিয় নগরে এসেছিলেন। বুদ্ধের আগমন উপলক্ষে বিশাখার পিতামহ মেণ্টক শ্রেষ্ঠী বিশাখাকে নিয়ে বুদ্ধ দর্শনে গিয়েছিলেন। তখন বিশাখার বয়স ছিল সাত বছর। বিশাখার সাথে ছিল পাঁচশত সখী, পাঁচশত পরিচারিকা এবং পাঁচশত সুসজ্জিত রথ। বিশাখার সুযোগ হয় বুদ্ধকে কাছে গিয়ে বন্দনা করার। বুদ্ধ বিশাখার জন্মান্তরে অর্জিত পুণ্যরাশি অবগত হয়ে তাঁকে ধর্ম দেশনা করেন। উপস্থিত সকলে গভীর শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করেন। বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে পাঁচশত সখীসহ বিশাখা এবং মেণ্টক শ্রেষ্ঠী স্নোতাপত্তি ফল লাভ করেন। মেণ্টক শ্রেষ্ঠী শ্রদ্ধাবণ্ড হয়ে ভিক্ষুসভ্যসহ বুদ্ধকে পরদিন তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং পরদিন যথাসময়ে তিনি সশিয় মেণ্টক শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হন। মেণ্টক শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুসভ্যসহ বুদ্ধকে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়ন করেন। বুদ্ধ তাঁদের ধর্ম দেশনা করেন। এতে বিশাখাসহ মেণ্টক শ্রেষ্ঠী পরিবারের সদস্যরা অপার আনন্দ অনুভব করেন। তাঁরা ভিক্ষুসভ্যসহ বুদ্ধকে আরও পনেরো দিনের জন্য নিমন্ত্রণ করবেন। বুদ্ধ তাঁদের শ্রদ্ধা ভক্তি দেখে সম্মতি প্রদান করেন। ফলে শেশব কালৈই বিশাখা বুদ্ধের ধর্ম দেশনা শ্রবণ এবং বুদ্ধকে সেবা করার এক অপূর্ব সুযোগ লাভ করেন।

কালক্রমে বিশাখা বিবাহযোগ্য হয়ে ওঠেন। পিতামাতা তার বিয়ের জন্য তৎপর হলেন। সে সময় শ্রাবণীতে মিগার নামে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর পুণ্যবর্ধন নামে এক পুত্র ছিল। পারিবারিক উদ্যোগে পুণ্যবর্ধনের সঙ্গে বিশাখার বিয়ে হয়। বিশাখার বাবা বিশাখাকে বহু দাসদাসী, রথ ও মহামূল্য মণিমুক্তা উপহার দিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পাঠান। শ্বশুরালয়ে পরম্পর শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাসের জন্য বিশাখার পিতা বিশাখাকে দশটি উপদেশ প্রদান করেন। এই দশটি উপদেশ সর্বজনীন উপদেশ হিসেবে স্বীকৃত হয়। এ-দশটি উপদেশ হলো :

১. ঘরের আগুন বাহিরে নিয়ো না। অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির কারো দোষ দেখলে তা বাইরের কাউকে বলবে না।
২. বাইরের আগুন ঘরে এনো না। অর্থাৎ প্রতিবেশী কেউ শ্বশুরবাড়ির কারো দোষের কথা বললে তা তোমার শ্বশুরবাড়ির কারো কাছে প্রকাশ কোরো না।
৩. যে দেয় তাকে দেবে। অর্থাৎ কেউ কিছু ধার নিয়ে ফেরত দিলে তাকে ধার দেবে।
৪. যে দেয় না তাকে দিয়ো না। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি কোনকিছু ধার নিয়ে ফেরত দেয় না তাকে ধার দিয়ো না।
৫. যে দেয় অথবা না দেয় তাকেও দেবে। অর্থাৎ কোনো আত্মীয় গরিব হলে, ধার নিয়ে ফেরত দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে তাকেও ধার দিয়ো।
৬. সুখে আহার করবে। অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ির গুরুজনদের খাওয়া শেষ হলে এবং অন্যান্যদের খাওয়া সম্পর্কে খবর নিয়ে তারপর নিজের আহার গ্রহণ করবে।

୭. ସୁଖେ ଉପବେଶନ କରବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏମନ ସ୍ଥାନେ ବସବେ ଯେ ସ୍ଥାନ ଥେକେ ଗୁରୁଜନଦେର ଦେଖେ ଉଠିବେ ନା ହୟ ।
୮. ସୁଖେ ଶୟନ କରବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯାବତୀୟ ଗୃହକର୍ମ ସମାଧା କରେ ଗୁରୁଜନଦେର ଶୟନେର ପର ଶୟନ କରବେ ।
୯. ଅଗ୍ନିର ପରିଚ୍ୟା କରବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁଜନ ଓ ଛୋଟଦେର ସଚେତନତାର ସାଥେ ପ୍ରୋଜନ୍ନୀୟ ସେବା ଶୁଣ୍ଡ୍ୟା କରବେ ।
୧୦. ଶୁଣ୍ଡ୍ୟା-ଶାଶ୍ଵତ୍ତି ଓ ଶାମୀ ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁଜନଦେର ଦେବତାଜାନେ ଭକ୍ତି କରବେ ।

ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠାନସହ ନାନା ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଆଜାଓ ଏହି ଉପଦେଶସମୂହ ପ୍ରଦାନ କରା ହୟ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପ୍ରୀତି ରକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଏ ଉପଦେଶଗୁଲୋର ଭୂମିକା ଅପରିସୀମ ।

ବିଶାଖାର ଶୁଣ୍ଡ୍ୟା ମିଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଏ ବିଯେତେ ସାତ ଦିନବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ସବ ପାଲନ କରେନ । କୋଶଲରାଜ ପ୍ରସେନଜିତସହ ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବର୍ଗ ଏ ବିଯେତେ ଯୋଗଦାନ କରେଛିଲେନ ।

ବିଶାଖା ଶୁଣ୍ଡ୍ୟାରାଙ୍କେ ମିଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ନିଜ ଦାଯିତ୍ବେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାର ଚେଷ୍ଟା କରତେନ । ଏତେ ଶୁଣ୍ଡ୍ୟା-ଶାଶ୍ଵତ୍ତିଓ ତାର ପ୍ରତି ଖୁବଇ ସମ୍ପତ୍ତ ଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ମିଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଛିଲେନ କିଛୁ ଆନ୍ତଧାରାର ଅନୁସାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଭକ୍ତ । ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରା ବିବନ୍ଧ ଥାକତେନ । ମିଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀର ଗୃହେ ତାରା ପ୍ରାୟ ଆସନ୍ତେନ । ଏକଦିନ ଗୁରୁପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ମିଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ବିଶାଖାକେ ତାଁଦେର ସାମନେ ନିଯେ ଯାନ । ବିଶାଖା ଦେଖିଲେନ ଗୁରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବନ୍ଧ । ବିଶାଖା ଏତେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରେନ । ସନ୍ନ୍ୟାସୀରା ବିଶାଖାର ଭାବ ବୁଝାତେ ପାରେନ । ତାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠୀକେ ବଲିଲେନ, ଏହି ରମଣୀ ଗୌତମେର ଶିଷ୍ୟ, ଏକେ ଘର ଥେକେ ବେର କରେ ଦାଓ । ତା ନା ହଲେ ତୋମାର ସର୍ବନାଶ ହବେ । ଏତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଖୁବଇ ଚିନ୍ତିତ ହୟେ ପଡ଼େନ ।

ଏକଦିନ ମିଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ମହାପାଳକେ ବସେ ମଧୁପାଯେସ ଖାଚିଲେନ । ଏମନ ସମୟ ଏକ ପିଣ୍ଡାଚାରୀ ବୌଦ୍ଧଭକ୍ଷ ମିଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀର ବାଢ଼ିତେ ଭିକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ଆସେନ । ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ତାଁକେ ଦେଖେଓ କୋନୋକିଛୁ ଦେଓୟାର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଲେନ ନା । ଶୁଣ୍ଡ୍ୟରେ ଅନୁମତି ଛାଡ଼ା ବିଶାଖାର ପଞ୍ଚେଓ କୋନୋକିଛୁ ଦେଓୟା ସମ୍ଭବ ନଯ । ତଥନ ବିଶାଖା ଆଗନ୍ତୁକ ଭିକ୍ଷୁକେ ବଲିଲେନ, ଭଞ୍ଚେ, ଆପଣି ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାନ । ଆମାର ଶୁଣ୍ଡ୍ୟର ବାସି ଖାବାର ଖାଚେନ । ମିଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଏକଥାଣେ ଶୁଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ହଲେନ । ବିଶାଖାକେ ବଲିଲେନ, ତୁମ ଏ ବାଢ଼ି ଥେକେ ଚଲେ ଯାଓ । ତିନି ବିଶାଖାକେ ବେର କରେ ଦିତେ ଦାସଦୀସୀଦେର ଆଦେଶ ଦିଲେନ । କିନ୍ତୁ ବାଢ଼ିର ଅନ୍ତଃପୁରେ ସକଳେଇ ଛିଲ ବିଶାଖାର ଭକ୍ତ । ଏକଥାଣେ ଶୁଣେ ବିଶାଖା ବଲିଲେନ, ଆମି କ୍ରୀତଦୀସୀ ନଇ, ଆମାକେ ଇଚ୍ଛା କରିଲେ ତାଡିଯେ ଦେଯା ଯାଯା ନା । ଆମାର ପିତା ଆଟଜନ ସମ୍ଭାନ୍ତ ନୀତିଭିତ୍ତିଲୋକକେ ସାକ୍ଷୀ କରେଇ ଆମାକେ ଶୁଣ୍ଡ୍ୟବାଢ଼ିତେ ପାଠିଯେଛେନ । ତାଁଦେର ଆହ୍ଵାନ କରନ୍ତ । ତାଁଦେର ବିଚାରେ ଦୋୟୀ ହଲେ ଆମି ଚଲେ ଯାବ । ଅପବାଦେର ବୋବା ମାଥାଯ ନିଯେ ଆମି ଶୁଣ୍ଡ୍ୟରାଲୟ ତ୍ୟାଗ କରବ ନା । କ୍ରୋଧଗନ୍ତ ମିଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ସାକ୍ଷୀଦେର ଆହ୍ଵାନ କରିଲେନ । ତାଁରା ବିଶାଖାକେ କେମ ଐରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଲେନ ତା ଜୀବନତେ ଚାନ । ଉତ୍ତରେ ବିଶାଖା ବଲିଲେନ, ଆମାର ଶୁଣ୍ଡ୍ୟର ‘ବାସି’ ଖାବାର ଖାଚେନ ବଲାର ଅର୍ଥ ଏହି ଯେ, ତିନି ପୂର୍ବଜନ୍ମେର ପୁଣ୍ୟଫଳେର ପ୍ରଭାବେ ଅର୍ଜନ କରା ଖାବାର ଖାଚେନ । ନୀତିଭିତ୍ତିଲୋକଦେର ବିଚାରେ ବିଶାଖାର ଜୟ ହୟ ।

ଆର ଏକଦିନ ରାତେ ବିଶାଖା ଘରେ ବାତି ହାତେ ନିଯେ ବାଇରେ ଗିଯେଛିଲେନ । ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ଏର କାରଣ ଜାନତେ ଚାଇଲେନ । ବିଶାଖା ବଲିଲେନ, ଘୋଡ଼ାର ବାଚା ପ୍ରସବେ ଥିବା ପେଯେ ଦାସୀଦେର ନିଯେ ଆଲୋ ହାତେ ତିନି ଅଶ୍ଵଶାଲାୟ ଗିଯେଛିଲେନ । ତଥନ ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ବଲିଲେନ, ତୋମାର ପିତା ତୋମାକେ ଘରେର ଆଗୁନ ବାଇରେ ନିତେ ନିଷେଧ କରେଛିଲେନ ନା? ତାଁ ଏହି ଉପଦେଶ ତୁମ ଆମାନ୍ୟ କରିନି । ସେଇ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେଇ ଆମି ଚଲାଇ । ଘରେର ଆଗୁନ ବାଇରେ ନା ନେବା ବଲାତେ ତିନି ବୁଝିଯେଛେନ, ଶୁଣ୍ଡ୍ୟବାଢ଼ିର କୋନୋ କଥା ବାଇରେ ଲୋକେର କାହେ ପ୍ରକାଶ ନା କରା । ଆମି ନିଜ ଗୃହେ ନିନ୍ଦା ଓ କୁଂସା ବାଇରେ ପ୍ରକାଶ କରି ନା । ଏସମୟ ବିଶାଖା ତାଁ ବାବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଦେଶଗୁଲୋକେ ଶୁଣ୍ଡ୍ୟକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେନ । ମିଗାର ଶ୍ରେଷ୍ଠୀ ତଥନ ନିଜେର ଭୁଲ ବୁଝାତେ ପାରେନ ।

এদিকে বিশাখা বারবার অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাণের সম্মুখীন হওয়ায় পিত্রালয়ে চলে যাবার জন্য মনস্থির করলেন। বিশাখা শুশ্রাবকে বললেন, এখন আমি পিতৃগৃহে চলে যেতে প্রস্তুত। তখন মিগার শ্রেষ্ঠী নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং বিশাখাকে পিত্রালয়ে চলে যাওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বারবার অনুরোধ করতে থাকেন। শুশ্রাবের এ বিনীতভাব দেখে বিশাখা বললেন, আপনি বিবস্ত্র সন্ন্যাসীদের ভক্ত। আমি ত্রিভুবনের উপাসিকা। বুদ্ধশাসনে গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন কুলের কন্যা আমি। ভিক্ষুসঙ্গের সেবা না করে আমি থাকতে পারি না। যদি আমাকে নিজের অভিভূতি অনুযায়ী দান করতে এবং ধর্মকথা শুনতে অনুমতি দেন তাহলে আমি থাকতে পারি। মিগার শ্রেষ্ঠী তাঁর কথায় রাজি হলেন।

এর অন্তর্দিন পরে বিশাখা ভিক্ষুসঙ্গসহ বুদ্ধকে তাঁর গৃহে নিমত্তণ করেন। বুদ্ধ সশিষ্য মিগার শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে যাচ্ছেন এ খবর পেয়ে বিবস্ত্র সন্ন্যাসীরাও এসে বাড়ির বাইরে অবস্থান নেন। তাঁদের শঙ্কা মিগার শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের দীক্ষা নিলে তাঁরা দান-দক্ষিণা থেকে বাধিত হবেন। এ ভয়ে তাঁরা মিগার শ্রেষ্ঠীকে ভিক্ষুদের সাথে দেখা করতে নিষেধ করেন। তাঁদের উপদেশ মতো মিগার শ্রেষ্ঠী ভিক্ষুদের দেখে নিজের কক্ষে বসে রইলেন। বিশাখা যাবাতীয় দান সাজিয়ে শুশ্রাবকে ডাকলেন। কিন্তু শ্রেষ্ঠী বিবস্ত্র সন্ন্যাসীদের কথামতো দানকাজ শেষ করতে বলেন। বিশাখা সশুদ্ধ চিন্তে বুদ্ধসহ ভিক্ষুসঙ্গকে দান করেন। দানকর্ম সম্পন্ন হলে বিশাখা ধর্মকথা শুনতে শুশ্রাবকে আহবান করেন। শ্রেষ্ঠী তখন ভাবলেন, এখন না গেলে খুব অভদ্রতা হবে। এরপে চিন্তা করে তিনি যেতে উদ্যত হলেন। এ সময় বিবস্ত্র সন্ন্যাসীরা বললেন, শ্রমণ গৌতমের ধর্ম শুনলে পর্দার আড়াল থেকে শুনবে। কারণ এই সন্ন্যাসীরা মনে করতেন বুদ্ধের মায়াবী ক্ষমতা আছে। সেই মায়ার বলে মিগার শ্রেষ্ঠীকে মুক্ত করে তাঁর শিষ্য করে নেবেন।

সন্ন্যাসীদের নির্দেশমতো মিগার শ্রেষ্ঠী পর্দার আড়ালে গিয়ে বসলেন। বুদ্ধ বললেন, শ্রেষ্ঠী আপনি পর্দার অন্তরালে, প্রাচীরের অন্তরালে, পাহাড়ের অন্তরালে অথবা দিকচক্রবালের অন্তরালে যেখানেই বসুন না কেন, আমার শব্দ সর্বত্র ঘোষিত হবে। এই বলে মহাকারণিক বুদ্ধ ধর্মদেশনা শুরু করলেন। প্রথমে শ্রেষ্ঠীর আগ্রহ না থাকলেও ক্রমে তিনি মন্ত্রমুঠো হয়ে পড়েন। বুদ্ধের দেশনা শেষ হলে শ্রেষ্ঠী স্নোতাপস্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তারপর তিনি বুদ্ধের সামনেই পুত্রবধূ বিশাখাকে জ্ঞানদায়িনী মাতা বলে সম্মোধন করে বললেন, মা তুমি এতদিনে এই সন্তানকে উদ্বার করলে। সেই থেকে বিশাখাকে ‘মিগারমাতা’নামে অভিহিত করা হয়।

এরপর হতে মিগার শ্রেষ্ঠীর গৃহে বিশাখার উদ্যোগে ভিক্ষুসঙ্গের নিত্য মধ্যাহ্ন আহারের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রেষ্ঠী নিজেও বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েন। বিশাখা আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবণ্তীতে একটি বিশাল বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুসঙ্গকে দান করেছিলেন। এটিকে পূর্বারাম বিহার বলা হয়। এ বিহার নির্মাণ কাজে তদারকি করার জন্য বিশাখা বুদ্ধের অগ্রশাবক মৌদ্গল্যায়নের সহযোগিতা প্রার্থনা করেছিলেন। মৌদ্গল্যায়ন পাঁচশত শিষ্যসহ বিহার নির্মাণে সহায়তা করেন। কথিত আছে যে, মৌদ্গল্যায়ন নিজের খান্দিশক্তির প্রভাবে যাত্র নয় মাসে বিহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করান। দ্঵িতীয়বিশিষ্ট এ বিহারের কক্ষের সংখ্যা ছিল এক হাজার। প্রত্যেকটি কক্ষ বিশাখা নিজের মনের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছিলেন। এ বিহার দান উপলক্ষে চারমাস ব্যাপী উৎসব হয়েছিল। এর জন্য বিশাখাকে আরও নয় কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যায় করতে হয়েছিল। বুদ্ধ পূর্বারাম বিহারে বিভিন্ন সময়ে ছয় বর্ষাবাসব্রত পালন করেছিলেন। সে সময় বিশাখা নিত্যকর্মের মতো প্রতিদিন তিনবার খাদ্যতোজ্য, প্রয়োজনীয় নানা দ্রব্য ও ধূপ ইত্যাদি নিয়ে বিহারে যেতেন। এক সময় বিশাখা বুদ্ধের কাছে আটটি বর প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তা অনুমোদন করেছিলেন এ বর গুলো বিশাখার ত্যাগ মহিমার নতুন দিক উন্মাচিত করেছে। বরগুলো হলো :

১. বিশাখা আজীবন বুদ্ধের কাছে আগত যে কোনো অতিথি ভিক্ষুর আহার্য দান করবেন।
২. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুসঙ্গকে স্নানবস্ত্র প্রদান করবেন।

৪. বিশাখা আজীবন অসুস্থ ভিক্ষুর যাবতীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
৫. বিশাখা আজীবন অসুস্থ ভিক্ষুদের পরিচর্যাকারীদেরও আহার্য দান করবেন।
৬. বিশাখা আজীবন বিহারের অসুস্থ ভিক্ষুদের জন্য প্রয়োজনীয় পথ্য সরবরাহ করবেন।
৭. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুদের যাঞ্চ-অন্ন দান করবেন।
৮. বিশাখা আজীবন ভিক্ষুগীদের স্নানবন্ধু প্রদান করবেন।

বিশাখার এ বরপ্রার্থনার মধ্যে তাঁর গভীর দানচেতনা ও উদারতার প্রকাশ ঘটেছে। এভাবে বিশাখা সানদে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্গের সেবায় নিয়োজিত হয়ে অপরিসীম পুণ্য সংগ্রহ করেন। বিশাখার বাড়িতে প্রত্যহ পাঁচশত ভিক্ষু আহার গ্রহণ করতেন। বিশাখার দশ পুত্র ও দশ কন্যা ছিল। তাঁদের প্রত্যেকেরও দশটি করে সন্তান ছিল। এভাবে তাঁরা সবাই বলশালী ও সম্পদশালী হয়ে সুখে বাস করতেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশাখা ‘মহা উপাসিকা’ নামে খ্যাত হন। এই মহাউপাসিকার জীবনী হতে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, ভোগ নয়, ত্যাগই মানুষকে মহৎ ও মহান করে। তাই সকলের দান ও ত্যাগের আদর্শে উজ্জীবিত হওয়া উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিশাখার পিতা বিশাখাকে কয়টি উপদেশ দিয়েছিলেন?

শুন্দরকে বিশাখা কীভাবে দীক্ষা প্রদান করেন?

বুদ্ধের নিকট বিশাখা কয়টি বর প্রার্থনা করেছিলেন? সেগুলো কী কী?

পাঠ : ৩

রাজা প্রসেনজিত

রাজা প্রসেনজিত ছিলেন কোশলের রাজা। শ্রাবণ্তীর ছিল কোশলের রাজধানী এবং খুবই সমৃদ্ধশালী নগরী। শ্রাবণ্তীতে বুদ্ধ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এখানে তাঁর জীবনের অনেক ইতিহাস স্মৃতি বিজড়িত আছে। তাই শ্রাবণ্তী বৌদ্ধদের একটি প্রধান তীর্থস্থান। এর বর্তমান নাম সাহেত-মাহেত। এটি বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত। প্রসেনজিত ছিলেন কোশলের রাজা মহাকোশলের পুত্র এবং বুদ্ধের সমসাময়িক। তিনি তক্ষশিলায় লেখাপড়া করেন। লিঙ্ঘবি মহালি এবং মল্ল রাজপুত্র ভগুল ছিলেন তাঁর সহপাঠী। তিনি বিভিন্ন রকম বিদ্যা ও শিল্পকলা শিখে তক্ষশিলা থেকে ফিরে আসেন। পিতা মহাকোশল বিদ্যা ও শিল্পকলায় তাঁর পারদর্শিতা দেখে খুবই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে কোশলের সিংহাসনে অধিকারী করান। রাজ্যভার গ্রহণ করে তিনি খুবই নিয়ম-নিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। তিনি জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তিদের খুব ভালোবাসতেন এবং তাঁদের সঙ্গ উপভোগ করতেন। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পরপরই রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের অনুসারী হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি বুদ্ধের উপাসক হয়ে জীবন অতিবাহিত করেন।

বুদ্ধের অনুসারী হলেও রাজা প্রসেনজিত অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। জানা যায় তিনি একবার মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন কিন্তু বুদ্ধের উপদেশে তিনি যজ্ঞে বলি প্রদানের জন্য সে সকল পশু যোগার করা হয়েছিল সে সকল পশুকে মৃত্যি দেন এবং পরবর্তীকালে যজ্ঞ ও পশুবলি পরিত্যাগ করেন। তিনি থায় সময় বুদ্ধের নিকট গমন করতেন এবং অনেক বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করতেন। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সংযুক্ত নিকায়ে কোশল সংযুক্ত নামে একটি অধ্যায় আছে, সেখানে কোশলরাজ প্রসেনজিতকে উদ্দেশ করে বুদ্ধের অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। এক সময় বুদ্ধ তাঁকে সীমিত আহারের উপদেশ দেন। তিনি বুদ্ধের উপদেশ পালন করে সুস্থান্ত্রের অধিকারী হন।

মল্লিকাদেবী ছিলেন কোশলরাজ প্রসেনজিতের স্ত্রী। তিনি এক উদ্যান পালকের কন্যা ছিলেন। কিন্তু তিনি খুবই বুদ্ধিমতি ছিলেন। রাজা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং বিশ্বাস করতেন। যে-কোনো বিষয়ে তাঁর উপদেশ গ্রহণ করতেন। একদিন তিনি রানিকে জিজ্ঞাসা করলেন, রানি! তুমি কাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাস? তিনি উত্তরে বললেন, পৃথিবীতে নিজের চেয়ে আগুন কেউ নেই। রানি খুবই ধার্মিক ছিলেন। তাই তিনি সত্য কথা বললেন। রাজা একথা বুঝে জাত করলে বুদ্ধ মল্লিকার কথা সত্য বলে সমর্থন করেন। বিবাহের পর মল্লিকা এক কন্যাসন্তান প্রসব করেন। কন্যাসন্তান জন্মের কারণে রাজা অসম্ভট্টি প্রকাশ করলে বুদ্ধ বলেন, শিক্ষা-দীক্ষায় উপযুক্ত করে তুলতে পারলে নারীরাও পুরুষের সমকক্ষ হতে পারে, সুন্দরভাবে রাজ্যশাসন করতে পারে।

রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধকে এতই শ্রদ্ধা করতেন যে, বুদ্ধের বংশের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করার জন্য তিনি খুবই উদ্ধৃত ছিলেন। রাজা প্রসেনজিত সশিয় বুদ্ধকে একসঙ্গাতের জন্য নিমত্তণ করে উত্তম খাদ্যদ্রব্য দ্বারা আপ্যায়িত করেন। সপ্তম দিবসে তিনি বুদ্ধকে প্রতিদিন তাঁর গৃহে ভোজন গ্রহণের জন্য আমত্তণ জানান। বুদ্ধ অপরাগতা প্রকাশ করে আনন্দকে নিমত্তণ রক্ষার জন্য বলেন। আনন্দ ভিক্ষুসংঘে প্রতিদিন রাজার গৃহে ভোজন গ্রহণ করতে যেতেন। রাজা ব্যস্ত থাকায় তাঁদের পরিচর্যা করতে পারতেন না। ভিক্ষুসংঘের সেবা ও বুদ্ধের বংশের সঙ্গে আত্মায়তা করার জন্য শাক্যজাতির কন্যা বিবাহ করার সিদ্ধান্ত নেন। অতঃপর তিনি শাক্যরাজের কাছে দৃত প্রেরণ করেন। সে সময় শাক্যরা নিজ সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক করত না। প্রসেনজিত ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা। তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে শাক্যদের বিপদ হতে পারে ভেবে তাঁরা বিকল্প ব্যবস্থা করেন। এ সময় শাক্যদের রাজা ছিলেন মহানাম। মহানামের এক কল্যা বাসবক্ষত্রিয়া নাগমুণ্ড দাসীর গর্ভে জন্মেছিল। তাঁকে তিনি রাজা প্রসেনজিতের সঙ্গে বিয়ে দেন। বাসবক্ষত্রিয়ার এক পুত্র হয়। তার নাম বিদুঢ়ভ। বিদুঢ়ভ মামাবাড়িতে এসে কখনো মর্যাদা পেতেন না। শাক্যরা একবার বিদুঢ়ভকে দাসীর পুত্র বলে অপমান করে। বিদুঢ়ভ এতে খুব ক্ষিপ্ত হন। তিনি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এক সময় কোশলের সেনাপতির সাহায্যে তিনি পিতা রাজা প্রসেনজিতকে সিংহাসনচুর্যত করে রাজা ক্ষমতা দখল করেন। প্রসেনজিত শ্রাবণ্তীতে পালিয়ে যান। অল্লদিনের মধ্যে তিনি সেখানে মতুয় বরণ করেন। তারপর বিদুঢ়ভ কপিলাবস্তু আক্রমণ করেন এবং শাক্যদের নির্মূল করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষে দেশে ফেরার সময় তিনি প্লাবনের জলে পতিত হয়ে সঁসৈন্যে নিহত হন।

রাজা প্রসেনজিতের সমকালীন প্রাচীন ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মগধরাজ বিষ্ণুসার, উজ্জয়িনীরাজ প্রদ্যোত, কোশাস্মীরাজ উদয়ন প্রমুখ। রাজা প্রসেনজিত এবং রাজা বিষ্ণুসার ছিলেন পরম্পর আত্মীয়। বিষ্ণুসার রাজা প্রসেনজিতে বোন কোশলদেবীকে বিবাহ করেন। রাজা বিষ্ণুসার উপটোকনস্বরূপ রাজা প্রসেনজিতের কাছ হতে কাশী রাজ্য লাভ করেন। কাশী মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে মগধরাজ-বিষ্ণুসারের সাথে রাজা প্রসেনজিতের গড়ে ওঠে সৌহাদ্যময় সুসম্পর্ক। বিষ্ণুসার পুত্র অজাতশত্রু এ সময় রাজকার্যে অগ্রন্তি ভূমিকা পালন করেন তিনি এক সময় অনেরে প্ররোচনায় পিতাকে কারাবন্দি করেন এবং কারাবন্দি অবস্থায় রাজা বিষ্ণুসারের মতু হয়। এ খবর শুনে রাজা প্রসেনজিত ক্ষুব্ধ হয়ে কাশী রাজ্য ফিরিয়ে নেন। এ কারণে প্রসেনজিতের সঙ্গে অজাতশত্রুর কয়েকবার যুদ্ধ হয়। চতুর্থবারে তিনি অজাতশত্রুকে পরাজিত করতে সমর্থ হন এবং সিংহাসন ত্যাগ না করা পর্যন্ত বন্দি করে রাখেন। পরে তিনি নিজকন্যা বজিরাকে তাঁর সাথে বিবাহ দেন এবং পুনরায় কাশী ধাম উপটোকন দেন। একথা শুনে বুদ্ধ উপদেশস্বরূপ বলেন, “যে লোক জয় লাভ করে তার শক্তি বাড়ে। যে পরাজিত হয় তার মর্মবেদনা বাড়ে। কিন্তু যার জয়-পরাজয় নেই সে সর্বদা শান্তি উপভোগ করতে পারে।”

রাজা প্রসেনজিতের বোন সুমনা সঙ্গে প্রবেশ করে ভিক্ষুণী হন এবং বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ ও অনুসরণ করে অর্হত্ব ফলে পট্টিত্তিষ্ঠিত হন। রাজা প্রসেনজিত এবং তাঁর স্ত্রী মল্লিকাদেবী বুদ্ধ এবং সম্মতে দান করতে খুবই ভালোবাসতেন।

প্রসেনজিত শ্রাবণ্তীর জেতবনে রাজকারাম বিহার নির্মাণ করান। তাঁর প্রধান মহিষী মল্লিকাদেবীর অনুরোধে এখানে একটি অতিথিশালা নির্মাণ করেন। এটি ‘মল্লিকারাম’ নামে খ্যাত হয়। এখানে বসে বুদ্ধ ধর্মদেশনা করেছিলেন। শ্রাবণ্তীর অদূরে একটি গভীর বন ছিল। তার নাম ছিল অঞ্জন বন। রাজা প্রসেনজিত এখানে শিকার করতেন। বুদ্ধের শিষ্য গবস্পতি এখানে বাস করতেন। থেরী সুজাতা এখানে বুদ্ধের ধর্মদেশনা শুনে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। রাজা প্রসেনজিত বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণের পর হতে প্রাণী হত্যা পরিত্যাগ করেন।

প্রসেনজিত অত্যন্ত দানপরায়ণ ছিলেন। একবার তিনি বুদ্ধকে পাঁচশত শিষ্যসহ জেতবনে নিমন্ত্রণ করেন। তখন তিনি নগরবাসীদের ডেকে বললেন, তোমরা এসে আমার দান দেখ। নগরবাসীরা রাজার দান দেখলেন। তারপর নগরবাসীরাও সশিষ্য বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে রাজাকে বললেন, মহারাজ, আপনি আমাদের দান দেখুন। রাজা তাঁদের দান দেখে ভাবলেন প্রজারা আমার চেয়ে অনেক বেশি দান করেছে। আমি আবার মহাদানের ব্যবস্থা করব। এভাবে রাজা ও প্রজাদের মধ্যে দানের প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় রাজা বারবার পরাজিত হয়ে ভাবলেন, আমি প্রজাদের মতো দান কী কখনো দিতে পারব না ?

রানি মল্লিকা এই বিষয়ে জানতে পেরে একটি মহাদানের আয়োজন করেন। সেই দানানুষ্ঠানে রাজা নিজের হাতে ভিক্ষুসঙ্গকে দান করলেন। এ মহাদানে প্রায় চোদ্দ কোটি মুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। বুদ্ধকে বন্দনা করে তিনি বললেন, ভন্তে, আমার এই দানে আপনাদের ব্যবহারের যাবতীয় উপকরণ আছে। রাজা আরও বললেন, যুদ্ধ ও রাজ্যবিস্তারে আমি এখন আনন্দ লাভ করি না। আমি সুখে শান্তিতে বাকি জীবন অতিবাহিত করতে চাই। এতে বুদ্ধ বলেছিলেন দানে দ্রব্য সাম্ভারের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ নয়। চিন্তির একাধিতা ও শ্রদ্ধা ভক্তি হলো মূল। পরিবর্তীতে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার, বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্গের সেবা, সুশাসন এবং মহত্তী দান কর্মের জন্য রাজা প্রসেনজিত এবং রানি মল্লিকাদেবী বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিদ্যুত কেন শাক্যদের নিধন করেছিলেন?

কোন কোন রাজা বুদ্ধের সমসায়িক ছিলেন?

রাজা প্রসেনজিত ও রাজা বিহিসারের মধ্যে কী সম্পর্ক ছিল?

পাঠ : ৪

পূর্ণিকা থেরী

এই নারী জন্মজন্মান্তরের পুণ্যসঞ্চয়পূর্বক বিপস্সি বুদ্ধের সময় এক সন্তানবৎশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে পুনর্জন্মের সন্তানবন্না তাঁকে উদ্ধিশ্ব করে তোলে। তিনি ভিক্ষুদের নিকট গিয়ে ধর্ম শ্রবণ করে সঙ্গে প্রবেশ করেন। তিনি সম্যকবন্ধে শীল পালনপূর্বক ভিক্ষুণী জীবন পালন করতে থাকেন। তিনি একাধিতা সহকারে ত্রিপিটক অধ্যয়নপূর্বক তাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিন্তু অভিমানজনিত কর্মফলে তিনি শৌতম বুদ্ধের সময়ে শ্রাবণ্তীতে অনাথপিণ্ডিকের গ্রহের কৃতদাসের কন্যাকূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় পূর্ণিকা। কথিত আছে যে, তাঁর জন্মের পর সেই গ্রহে সন্তানসংখ্যা একশত পূর্ণ হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হয় পূর্ণা বা পূর্ণিকা।

বুদ্ধের সিংহনাদ নামে খ্যাত উপদেশ শ্রবণ করে তিনি স্নোতাপন্তি ফল লাভ করেন। তৎপর তিনি উদ্দকশুদ্ধি এক ব্রাক্ষণকে যুক্তি দ্বারা স্বত্তে আনতে সমর্থ হন। এতে প্রভু তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেন। মুক্তি পেয়ে তিনি সঙ্গে প্রবেশ করে অর্হত্ব ফল লাভ করেন। ঘটনাটি একুপ-দাসী জীবনে ভোর বেলা নদী থেকে জল আহরণ করা ছিল পূর্ণিকার নিত্যকর্ম। প্রভুর দণ্ড ও কটুবাক্যের ভয়ে তিনি শীতের ভোরেও নদীতে নেমে জল আহরণ করতেন।

তিনি যে নদীতে জল আনতে যেতেন সে নদীতে হাড়কাঁপানো শীতের ভোরে পাপমুক্ত হওয়ার জন্য এক উদকশুদ্ধি ব্রাক্ষণ স্নান করতেন। উদকশুদ্ধির হলো জলে ভিজে জীবন শুন্দ করার ব্রত। একদিন পূর্ণিকা ব্রাক্ষণকে শীতের ভোরে নদীর জলে ভুবে থাকতে দেখে জিঙ্গাসা করলেন, ‘‘ব্রাক্ষণ আমি প্রভুর ভয়ে শীতের ভোরে নদীতে নেমে জল আহরণ করি। আপনি কিসের ভয়ে হাড় কাঁপানো শীতের ভোরে স্নান করছেন?’’ উত্তরে তিনি বললেন, “‘পূর্ণিকা ! আমি পাপকর্মের ফল ধোত করার ব্রত পালন করছি। বার্ধক্য বা যৌবনে যে পাপ কর্ম করে সে স্নানশুদ্ধি দ্বারা ঐ পাপ হতে মুক্ত হয়।’’

পূর্ণিকা বললেন, “স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপ হতে মুক্ত হয় এরূপ আপনাকে কে বলেছেন? এটি মূর্খ কর্তৃক মূর্খের উপদেশ। যদি তা হয় তাহলে নদীতে যেসব কচ্ছপ, ব্যঙ্গ, সাপ, কুমির ও জলচর প্রাণী আছে তাদের স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত। এরূপ তাহলে হত্যাকারী, চোর ও অকুশল কর্ম সম্পাদনকারীও স্নানশুদ্ধি দ্বারা পাপমুক্ত হবে। তাছাড়া নদী যদি পূর্বকৃত পাপ ধোত করতে পারে তাহলে পুণ্যও ধোত হয়ে যাবে। হে উদকশুদ্ধিক দেহ ধোত না করে আগে মনের ক্লেশসমূহ ধোত করুন। প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো পাপকর্ম করবেন না। যদি পাপকর্ম করে থাকেন, তাহলে দুঃখ হতে মুক্তির উপায় নেই। পলায়ন করেও মুক্তি পাবেন না। যদি দুঃখের ভয় থাকে, যদি দুঃখ আপনার অধিয় হয়, তাহলে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংজ্ঞের শরণ গ্রহণ করুন, ‘শীল পালন করুন’। এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে পূর্ণিকা স্নানশুদ্ধির অসারতা প্রমাণ করে ব্রাক্ষণকে স্বতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পূর্ণিকা জীবনী পাঠে ধারণা করা যায় যে, একজন সামান্য ক্রীতদাসীও যে সৎ চেতনা ও কুশলকর্মের প্রভাবে জগতে খ্যাতি লাভ করতে পারে। অধ্যাবসায় ও সাধনার বলে নারীরাও অর্হত্ব লাভ করতে পারেন।

অনুশীলনীয় কাজ

পূর্ণিকা উদকশুদ্ধিক ব্রাক্ষণকে কীভাবে স্বতে আনতে সমর্থ হয়েছিলেন লেখ
পূর্ণিকার যুক্তি কী তুমি সমর্থন কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

পাঠ : ৫

ভিক্ষু শীলভদ্র

শীলভদ্র ছিলেন বচের আদি গৌরব। কর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি বহু উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। যেমন : শাস্ত্রশুরু, ধর্মরত্ন ও জ্ঞানকর ইত্যাদি। শীলভদ্রের জন্য ৫২৯ খ্রিষ্টাব্দ। তিনি বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চান্দিনা অঞ্চলের তদানীন্তন ভদ্ররাজ বৎশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জানা যায় যে, তাঁর গৃহী নাম ছিল দত্তভদ্র। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেই তিনি শীলভদ্র নামে খ্যাত হন।

জ্ঞানার্জনে শীলভদ্র ছিলেন আপোসহান। তিনি অঞ্জ বয়সেই বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, সাঞ্চ্য দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শৈশবকাল থেকেই জ্ঞানার্জনের জন্য তিনি উৎসুক ছিলেন। রাজকীয় সম্মান ঐশ্বর্য ত্যাগ করে সত্যানুসন্ধানী হয়ে ভারতবর্ষ পরিক্রমায় বের হন। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। এসময় তিনি বিভিন্ন বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেন। এভাবে এক সময় তিনি পৌছান নালন্দায়। নালন্দা ছিল সে সময়ের খুব উচ্চ মানের বিশ্ববিদ্যালয়। বৌদ্ধবিহারকে কেন্দ্র করেই এই বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধবিহারকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হলেও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রবেশাধিকার ছিল। শীলভদ্রের সময় নালন্দায় দশ হাজার শিক্ষার্থী ছিল এবং দেড় হাজার শিক্ষক ছিলেন। তখন নালন্দা মহাবিহারের

অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য ধর্মপাল। তাঁর কাছেই শীলভদ্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এখানেই বৌদ্ধধর্মীয় বীতিতে তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হন। তারপর গভীর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি বৌদ্ধধর্মের সারমর্ম অধিগত করেন এবং শাস্ত্রের দুর্বল তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। শীলভদ্র আচার্যের কাছ থেকে ধর্ম-দর্শনের নিগৃঢ়তত্ত্বের নির্যাসটুকু নিয়েই ক্ষান্ত হতেন না, তত্ত্বের গভীরে গিয়ে ধ্রুব সত্যে না পৌছা পর্যন্ত তিনি প্রশ্ন করে যেতেন। এভাবে তিনি জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত ও স্বচ্ছ করেন এবং বহু বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

শীলভদ্র এক খ্যাতিমান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে খুব প্রশংসনো অর্জন করেন। তখন ভারতবর্ষে একাপ তর্কযুদ্ধের প্রচলন ছিল। রাজা মহারাজারাও নানাভাবে এর সাথে সম্পৃক্ত হতেন। কার রাজ্যে কত বড় পণ্ডিত বসবাস করেন এটি তাঁদের গৌরবের বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতো। তাই রাজা মহারাজারাও একাপ তর্কযুদ্ধ আয়োজনে আগ্রহী হতেন। শীলভদ্র নালন্দায় অবস্থানকালে একাপ এক ঘটনা ঘটে। দক্ষিণ ভারতের এক পণ্ডিত মগধরাজ্যে উপস্থিত হয়ে তাঁর সমকক্ষ তাত্ত্বিক পণ্ডিত নেই বলে দাবি করতে থাকেন এবং নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করতে থাকেন। তিনি ধর্ম বিষয়ক তর্কযুদ্ধে মগধের পণ্ডিতদের আহ্বান করেন। একথা শুনে মগধরাজ আচার্য ধর্মপালের কাছে দৃত পাঠিয়ে জানতে চাইলেন তিনি এই তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে রাজি আছেন কি না? আচার্য ধর্মপাল তাঁর সম্মতি জানিয়ে সাথে সাথেই মগধে যেতে প্রস্তুতি নিলেন। তাঁর শিষ্য শীলভদ্র তখন নালন্দাতেই ছিলেন। তিনি আচার্যকে বিনীত অনুরোধ করে বলেন, “এই তর্কযুদ্ধে আমাকে যাবার অনুমতি দিন”। শীলভদ্রের বয়স তখন মাত্র ত্রিশ বছর। আচার্য ধর্মপাল অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি ইতোমধ্যে শীলভদ্রের তত্ত্ব বিশেষণ ও ব্যাখ্যা বিষয়ে শুনেছেন। তাই শীলভদ্রের উপর তাঁর যথেষ্ট আস্থা ছিল। তিনি শীলভদ্রকে অনুমতি দিলেন। এসময় অনেক নবীন শিষ্য আচার্যের এই সিদ্ধান্তে বিচলিত হন। তখন তিনি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করে বলেন, “আমি নিশ্চিত যে শীলভদ্র এই তাত্ত্বিক পণ্ডিতকে পরাজিত করতে সক্ষম হবে।” এই ধর্মসভায় বহু লোকের সমাগম হলো। প্রজ্ঞাপ্রসূত সূক্ষ্ম যুক্তির্কের মাধ্যমে শীলভদ্র তাত্ত্বিক পণ্ডিতকে পরাজিত করলেন। শীলভদ্রের পাণ্ডিত্যের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। মগধরাজ সন্তুষ্ট হয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ একটি নগরের রাজস্ব স্থায়ী বৃত্তিরূপে তাঁকে প্রদান করেন। কিন্তু শীলভদ্র এটি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। তিনি বলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুর পরিধেয় ত্রিচীবরই যথেষ্ট। পরে রাজার বিশেষ অনুরোধে তিনি সেই নগর গ্রহণ করে সেখানে একটি সংঘারাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহারের নামকরণ করা হয় ‘শীলভদ্র সংঘারাম বিহার’। সংঘারামের সকল ভিক্ষু-শ্রমণ মহাস্থাবির শীলভদ্রের প্রতি বিনীত শ্রদ্ধায় তাঁকে ‘স্বদ্বৰ্ম ভাগুর’ বলে সম্ভাষণ করতেন।

প্রকৃতপক্ষে মহাস্থাবির শীলভদ্রের সমসাময়িককালে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ আচার্য। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও পণ্ডিত হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। শীলভদ্রই প্রথম বাঙালি যিনি নালন্দা মহাবিহারে এই খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন। সে গৌরবে আজও বাঙালিরা গর্ববোধ করে।

শিক্ষাসমাপ্তির পর তিনি নালন্দায় মহাবিহারে অধ্যাপনায় যোগদান করেন। আচার্য ধর্মপালের নির্বাণ লাভের পর সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে নালন্দার আচার্যপদে অধিষ্ঠিত করা হয়। ৬৫৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ১২৫ বছর বয়সে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

শীলভদ্র কার নিকট এবং কোথায় বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লাভ করেন?

শীলভদ্রকে কেন একটি নগর রাজস্ব স্থায়ীবৃত্তি রূপে দেয়া হয়েছিল?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. অশ্বজি'র সৌম্য চেহারা দেখে ----- মুক্তি হন।
২. মৌদগল্যায়ন ছিলেন ঋকি শক্তিতে -----।
৩. দেহ ধৌত না করে আগে মনের ----- ধৌত করছন।
৪. বিশাখার পিতা বিশাখাকে ----- উপদেশ প্রদান করেন।
৫. ----- প্রথম বাঙালি যিনি নালন্দা মহাবিহারে খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. সঞ্জয় বেলটাঠীপুত্র কেন বাদী ছিলেন?
২. বিশাখা কার কাছে বর প্রার্থনা করেছিলেন এবং কয়টি?
৩. পূর্ণিকাকে কেন দাসী কর্ম থেকে মুক্তি দেয়া হলো?
৪. শীলভদ্রকে নিয়ে কেন আমরা গবর্নর করি?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. সারিপত্র ও মৌদগল্যায়ন কীভাবে বুদ্ধের অগ্রগামকের পদ লাভ করেছিলেন বর্ণনা কর।
২. পারিবারিক শান্তি সংরক্ষণে বিশাখার পিতার প্রদত্ত দশটি উপদেশের গুরুত্ব মূল্যায়ন কর।
৩. বৌদ্ধধর্মের প্রসারে রাজা প্রসেনজিতের অবদান লিপিবদ্ধ কর।
৪. পূর্ণিকা কীভাবে দাসী থেকে ভিক্ষুণী হলেন বিস্তারিত লেখ।
৫. শীলভদ্রের জীবন ও কর্ম বর্ণনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

- ১। মৌদগল্যায়ন কিসে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন ?

- | | |
|------------------|-------------------|
| ক. জাগতিক জ্ঞানে | খ. পরমার্থ জ্ঞানে |
| গ. ঋকি শক্তিতে | ঘ. দৈহিক শক্তিতে |

- ২। রাজা প্রসেনজিত শাক্যকন্যাকে বিবাহের উদ্দেশ্য -

- i. ভিক্ষুসংঘ ভোজনালয়ে আহার গ্রহণে বিরত থাকেন বলে
- ii. কাশী রাজ্য লাভের আশায়
- iii. বুদ্ধের বৎশের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক করা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

পাপিয়া তথ্যজ্ঞ একজন ধার্মিক মহিলা। আর্থিক অনটনের কারণে তিনি পরের বাসায় গৃহকর্ম করেন। একদিন তিনি একজন কুসংস্কারচন্দ্র ব্যক্তিকে যুক্তি দিয়ে তার কাজের অসারতা প্রমাণ করে, স্বর্ধর্মে দীক্ষিত করতে উদ্ধৃত করেন।

৩। উল্লিখিত ঘটনাটির চারিতমালার কোন ধ্যেরীর সাথে সম্পৃক্ত ?

- | | |
|-------------|--------------|
| ক. পূর্ণিকা | খ. উৎপলবর্ণা |
| গ. পটাচারা | ঘ. ক্ষেমা |

৪। পাপিয়া উক্ত কর্ম সম্পাদন করার ফলে—

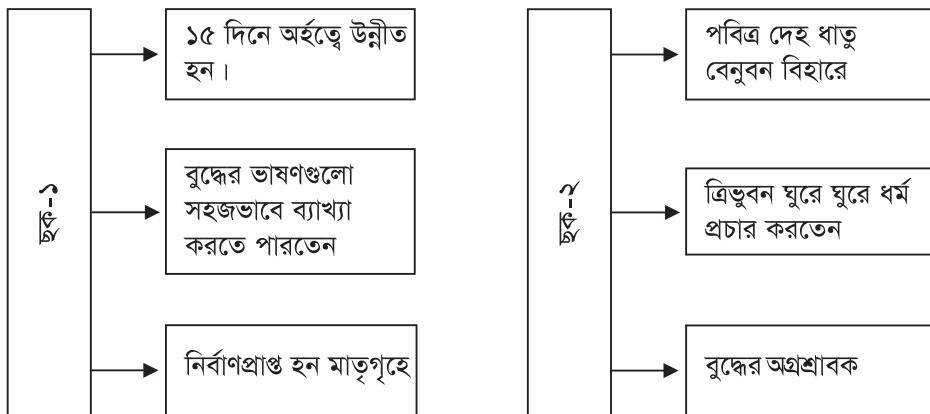
- i. প্রশংসা লাভ করবেন
- ii. সুগতি লাভ করবেন
- iii. অর্হত্ব ফলে অধিষ্ঠিত হবেন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সংজনশীল প্রশ্ন :

১।



- ক. শীলভদ্রের জন্ম কত খ্রিষ্টাব্দে ?
 খ. পূর্ণিকাকে কেন দাসীকর্ম থেকে মুক্তি দেওয়া হলো ?
 গ. ছক-১ এ বর্ণিত বিষয়াবলির সাথে বুদ্ধের কোন শিষ্যের মিল রয়েছে ? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. বুদ্ধের অগ্রশাবক হিসেবে ছক-২-এ বর্ণিত ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে যে অবদান রাখেন তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। ঘটনা-১

রংপুন বড়ুয়া শৈশব থেকেই জ্ঞানার্জনের জন্য আগ্রহী ছিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে তাঁর নাম রাখা হয় ধর্মিত্ব। তিনি গভীর সাধনা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে ধর্মীয় জ্ঞানের বহু বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। এছাড়াও শাস্ত্রের দুর্লভ তত্ত্বের সরল ব্যাখ্যা প্রদানের পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে সকলে তাকে সন্দর্ভের ভাগ্নার বলে সন্তুষ্ট করেন।

ঘটনা-২

বৃন্তা বড়ুয়া প্রতিদিন বিহারে গিয়ে ত্রিভুবনের সেবা ও পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। পরিণত বয়সে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর তাঁর পিতার দেয়া উপদেশ সাংসারিক জীবনে প্রতিফলিত করেন।

- ক. শ্রাবণীর বর্তমান নাম কী ?
 খ. মৌদগল্যায়নকে কেন কালশৈল পর্বতে ঘাতক কর্তৃক আক্রান্ত হতে হয়েছিল ? ব্যাখ্যা কর।
 গ. ঘটনা-১- এ বর্ণিত কাহিনীটি চরিতমালার কোন চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ? ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. ঘটনা-২- এ বর্ণিত বৃন্তা বড়ুয়ার কর্মকাণ্ডের প্রভাবে জন্মজন্মান্তরে সুগতি লাভ হবে- একথার সাথে তুমি কি একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর।

একাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয় ভারতবর্ষে। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব কালে বেশিরভাগ মানুষই ছিল অঙ্গ বিশ্বাস আর ভাস্ত ধারণার অধীন। তারা বিশ্বাস করতো যে কোনো ধরণের দুর্যোগ-দুর্ঘটনা অদ্য দৈবশক্তির প্রভাবে সংঘটিত হতো। ফলে অদ্য শক্তির প্রতি নিজেকে সমর্পন করেই মানুষ শান্তি ও নিরূপদ্রব থাকার চেষ্টা করতো এবং অদ্য শক্তির সন্তুষ্টির জন্য আহোজন করতো নানা রকম পূজা-অর্চনা ও আচার-অনুষ্ঠান। যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলি ছিল এসব পূজাচারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সকল সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য এগুলোই ছিল ধর্মাচার। বুদ্ধ সেই অদ্য শক্তির আরাধনার চেয়ে নিজের করণীয় সম্পর্কে সচেতন হওয়ার উপদেশ প্রদান করেন। তিনি সেসব আচার-অনুষ্ঠান দুঃখ মুক্তির সঠিক পথ নয় বলে পরিত্যাগ করতে বলেন এবং দুঃখ হতে মুক্তির জন্য পথ নির্দেশ করেন। তাঁর এই অমিয়বাণীর আহ্বানে সাধারণ মানুষ থেকে রাজা মহারাজা সকলেই আকৃষ্ট হলেন। তাঁরা বুঝলেন দুঃখ যেমন আছে, দুঃখ নিরোধের উপায়ও আছে। এ সত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষ নব চেতনায় উদ্ভাসিত হলো। এভাবে বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের যাত্রা শুরু হয়। কালক্রমে তা ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে বিস্তৃত লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্ম দর্শনের এরূপ ত্রুটিকাশের ধারাই হলো বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * প্রাক বুদ্ধ যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- * বুদ্ধের সমকালীন ঘোড়শ মহাজনপদের বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- * বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে মৌর্য, কুষাণ ও পাল রাজাদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- * বাংলাদেশের প্রাক-আধুনিকযুগসহ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দিতে পারব।

পাঠ : ১

প্রাক বুদ্ধ যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা

প্রাচীন ভারতবর্ষে বুদ্ধের আবির্ভাব। ভারতবর্ষে নানা যুগে নানা মনীষীর জন্ম হয়েছে। সামাজিক রীতি নীতি ও প্রবাহিত হয়েছে নানা আঙ্গিকে। প্রাক বুদ্ধ যুগে ভারতবর্ষে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব ছিল। তখন ভারতবর্ষ অনেকগুলো ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজারা জনগণের কাছ থেকে ফসল, গৃহপালিত পশু ইত্যাদি কর হিসেবে গ্রহণ করতো। সাধারণ মানুষ পল্লী অঞ্চলে বসবাস করতো। রাজা, রাজ কর্মচারী ও ধনীরা সুরক্ষিত নগরে বসবাস করতেন। তাঁরা শিকার, অস্ত্রচালনা, নাচ-গান প্রভৃতি করে অমোদ প্রমোদ করতেন। সমাজে নানা রকম পেশা প্রচলিত থাকলেও অধিকাংশ লোকই কৃষি কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতো। গৃহ নির্মাণে বাঁশ ও কাঠের পাশাপাশি ইট প্রস্তরও ব্যবহার হতো। উৎসবের সময় নাচ-গান এবং নানা রকম পিঠা তৈরি করা হতো। নারী পুরুষ লৌহনির্মিত অলংকার পরিধান করতো। সমাজে দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। ধনীরা অর্থের বিনিময়ে দাস ক্রয় করতেন। যুদ্ধ-বন্দী ও দণ্ডিত অপরাপর্যাদের দাসে পরিণত করা হতো। আবার অনেকে জন্মসূত্রেও দাস হতো। সমাজে বহু বিবাহ প্রথা ও প্রচলিত ছিল। শিক্ষার্থীরা শুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতো।

সমাজে চার প্রকার বর্ণ প্রথা প্রচলিত ছিল। যথা: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূন্দি। তখন ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ করে ব্রহ্মা ও অন্য দেবতাদের উপাসনা করতেন। কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল পূজা-উপাসনায় স্বর্গসুখ লাভ হয়। ব্রহ্মাকে গণ্য করা হতো সৃষ্টিকর্তা রূপে। ব্রহ্মা নিজ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাই ব্রহ্মাকে কেন্দ্র করেই ছিল মানুষের ধর্ম, কর্ম ও চিন্তা-চেতনা। ব্রাহ্মণেরা প্রচার করতেন যে, ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, হাত থেকে ক্ষত্রিয়, উক্ত থেকে বৈশ্য আর পা থেকে শুন্দরের জন্ম হয়। সমাজে ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করতেন এবং তাঁদের আধিপত্য ছিল সবচেয়ে বেশি। রাজারা তাঁদের বিশেষ সমীক্ষা করতেন। তাঁদের অবস্থান ছিল শীর্ষে। তাঁরা নিজেদেরকে দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে প্রচার করতেন। পূজা অর্চনা ও উপদেশ দেয়া ছিল ব্রাহ্মণদের প্রধান কাজ। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন যোদ্ধা। দেশের শাসনভার তাঁদের হাতে ন্যস্ত থাকতো। বৈশ্যরা ছিলেন বণিক। ব্যবসা বাণিজ্য ছিল তাঁদের প্রধান কাজ। শুন্দরা ছিলেন শ্রমজীবি মানুষ। তাঁরা অপরের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সমাজে তাদের অবস্থান ছিল সর্বনিম্নে।

সে সময় যাগযজ্ঞ, পশুবলি, অন্তোকিক ক্রিয়াকাণ্ড, পূজা-অর্চনা প্রভৃতি ছিল ধর্মাচারের প্রধান অঙ্গ। তাছাড়া, বনাচরণ, নির্জনবাস, শারীরিক কৃচ্ছতা সাধন প্রভৃতি সাধন প্রনালীও বর্তমান ছিল। পশুরক্তে দেব-দেবীকে তুষ্ট করাই ছিল ধর্মাচারের অন্যতম প্রচলিত রীতি। কারণ তখন বিশ্বাস করা হতো যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধন, সুস্থান্ত্য এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ হয়। নানা রকম মন্ত্র, তত্ত্ব, বাড় ফুঁক প্রভৃতিও প্রচলিত ছিল। মানুষ বিপদ ও রোগ ব্যাধি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এসব ধর্মাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতো। কিন্তু এসব ধর্মাচার সকল মানুষকে তৃণ্ডি দিতে পারতো না। কারণ তারা উপলব্ধি করল যে, যাগযজ্ঞ, পশুবলি ইত্যাদি দ্বারা চিরস্থায়ী কল্যাণ আসে না। তারা অন্যপথে মুক্তির সন্ধান করতে থাকে। ফলে বিভিন্ন ধর্মতরে উন্নত হয়। পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরা এসব ধর্মসম্মত প্রচার করতেন।

অনুসীলনমূলক কাজ

প্রাক বুদ্ধ যুগের চার প্রকার বর্ণপ্রথা সম্পর্কে ধারণা দাও
প্রাক বুদ্ধ যুগের ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা কর

পাঠ : ২

গৌতম বুদ্ধের সময়কালে ধর্মীয় অবস্থা

গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিষ্টপূর্ব ৬২৩ অন্তে। এ সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মসহ তেষটি প্রকার ধর্মীয় মতবাদ প্রচলিত ছিল। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকের দীর্ঘ নিকায়ের ব্রহ্মজাল সূত্রে এ তথ্য বর্ণিত আছে। ভিক্ষুসংঘ ছাড়াও এ সময় ছয়টি বৃহৎ শ্রমণ সংজ্ঞা ছিল। এই ছয়টি সংজ্ঞের প্রধান ছিলেন : পূরণ কশ্যপ, মক্খলী গোসাল, অজিত কেশকম্বলি, পকুদ কচ্ছায়ন, নিগষ্ঠ নাথপুত্র এবং সঞ্জয় বেলার্ট্যাপুত্র। এঁরা ষড়তীর্থক্ষেত্রের নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁদের অসংখ্য অনুসারী ছিলেন। নিম্নে তাঁদের জীবন দর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা প্রদান করা হলো :

পূরণ কশ্যপ : তাঁর মাতৃ-পিতৃ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল কশ্যপ। তিনি পেশায় ছিলেন দারোয়ান। তিনি জন্ম গ্রহণ করার পর তাঁর বংশে একশো জন পূর্ণ হওয়ায় তিনি পূরণ আখ্যা লাভ করেন। অন্যমতে, তিনি যে গৃহে কাজ করতেন সে গৃহে তাঁকে নিয়ে একশোজন দাস পূর্ণ হওয়ায় তাঁর নাম হয় পূরণ।

জানা যায় যে, একদিন কাজের প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি বনে প্রবেশ করেন। সে বনে কতিপয় দস্যু তাঁর বন্ত্র কেড়ে নিয়ে বিবন্ধ করে ছেড়ে দেয়। বিবন্ধ অবস্থায় তিনি এক গ্রামে প্রবেশ করে বলতে থাকেন, ‘আমি সর্ব বিদ্যায় পূর্ণতা লাভ করেছি। তাই লোকে আমাকে পূরণ বলে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি বিদ্যায় কশ্যপ বলে। তখন গ্রামবাসী তাঁকে বন্ত্র প্রদান করলে তিনি বলেন, ‘লজ্জা নিবারণের জন্য বন্ত্র ব্যবহৃত হয়। পাপ হতে লজ্জার উৎপত্তি। আমি সমস্ত পাপ

প্রবৃত্তি নির্মূল করেছি। আমার বন্দের প্রয়োজন নেই।' অতঃপর, তিনি তুচ্ছ নামক বনে অবস্থান করে সন্ন্যাস জীবন যাপন করতে থাকেন। কালক্রমে তাঁর পাঁচশো প্রধান শিষ্য এবং আশি হাজার অনুসারী হন। তাঁর অভিমত ছিল : আগাত, হত্যা, মিথ্যা ভাষণ, দস্যবৃত্তি প্রভৃতিতে দোষ বা পাপ নেই। দান, সংহয়, সত্য ভাষণ দ্বারা পুণ্য লাভ করা যায় না।

মৃক্খলি গোসাল : তাঁর পিতা-মাতা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। তিনি পেশায় ছিলেন একজন দাস। একদিন প্রভুর আদেশে তিনি একটি ঘৃত কলস মাথায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে কদম্ব স্থানে পদচালন ঘটে কলস ভেঙে ঘৃত নষ্ট হয়ে যায়। প্রভুর দণ্ড ভয়ে তিনি বনে প্রবেশ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং নিজেকে সর্বজ্ঞ পরিচয় দিতে থাকেন। তিনি অচেলক বা নগ্ন প্রবেজিত সন্ন্যাসী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁরও পাঁচশো শিষ্য এবং আশি হাজার অনুসারী ছিলেন। তিনি নিয়তিবাদ সমর্থন করতেন। তাঁর মতে, 'প্রাণীগণ কোনো হেতু বা কারণ ছাড়া পবিত্র বা অপবিত্র হয়। নিজের বা পরের শক্তিতে কিছু হয় না। নিয়তি এবং স্বত্বাবের বশে প্রাণীগণ বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধিমান এবং মূর্খ সকলের সংসার চক্রে পরিভ্রমণ শেষে দুঃখের শেষ হবে।'

অজিত কেশকম্বলি : তাঁর পিতৃ-মাতৃ পরিচয় জানা যায় না। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল অজিত। পেশায় ছিলেন গৃহত্বত্য। প্রভুর ভৎসনা সহ্য করতে না পেরে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। সন্ন্যাস অবলম্বন করার পর তিনি কেশ নির্মিত কম্বল পরিধান করতেন বলে অজিত কেশকম্বলি নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি সবসময় মন্তক মুণ্ডন করে থাকতেন। তাঁরও অনেক শিষ্য এবং অনুসারী ছিলেন। তিনি উচ্চেদবাদী ছিলেন। তাঁর মতে, দান, যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির মধ্যে কিছুই নেই। পরলোক নেই। সত্য পথের সন্ধান দিতে পারে এমন কেউ এ পৃথিবীতে নেই। মাটি, পানি, আলো ও বাতাস এ চারটি উপাদানে মানুষ সৃষ্টি হয়। মৃত্যুর পর কিছুই অশেষ থাকে না।

পুরুধ কচ্ছায়ন : পুরুধ বৃক্ষমূলে জন্ম হয়েছিল বলে তিনি পুরুধ কচ্ছায়ন নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁকে এক ব্রাহ্মণ লালন পালন করতেন। ব্রাহ্মণের মৃত্যুর পর জীবিকা নির্বাহের জন্য কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তাঁর সম্ম ছিল সবচেয়ে বড়। তাঁর মতে, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, সুখ, দুঃখ এবং জীব এই সাতটি পদার্থ কেউ তৈরি করে নি।

নিগঞ্জ নাথপুত্র : তিনি নাথ নামক এক কৃষকের পুত্র এবং বৈশালীর অধিবাসী ছিলেন। তিনি নির্ভৰ্তু নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি বলতেন, এমন কিছুই নেই যা আমি পড়িনি। তিনি মুক্তি লাভের জন্য কঠোর কৃচ্ছতা সাধন করতেন। তাঁর পাঁচশত শিষ্য এবং বহু সংখ্যক অনুসারী ছিলেন। তাঁর মতে, কৃচ্ছতা সাধনে পাপ জীর্ণ হয়। পূর্ব জন্মের পাপ তপস্যা দ্বারা ক্ষয় হয়। নতুন পাপ জন্ম না নিলে সর্ব দুঃখের অবসান হয়।

সঞ্জয় বেলট্টপুত্র : বেলাস্তি নামক এক দাসীর গর্ভে জন্ম হয়েছিল বলে তিনি বেলট্টপুত্র নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাথায় সঞ্চ ফলের ন্যায় মাংসপিণি ছিল বলে তিনি সঞ্চয় বেলট্টপুত্র নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর অনেক শিষ্য এবং অনুসারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বিক্ষেপবাদী। কোনো জিজ্ঞাসা করলে এটা সেটা বলে সময় ক্ষেপন করতেন। বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য মহা অগ্রশাবক সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন প্রথমে সঞ্জয় বেলট্টপুত্রের অনুসারী ছিলেন। তাঁর মতে, পরলোক আছে বা নেই, সুকৃত ও দুষ্কৃত কর্মের ফল আছে বা নেই - এসব আমার কিছুই মনে হয় না। মগধরাজ অজাতশক্ত তাঁকে সবচেয়ে বেশি অঙ্গানী মনে করতেন।

বুদ্ধের ধর্ম ছাড়াও সেসময় বাষ্পটি প্রকার ধর্ম-দর্শন প্রচলিত ছিল, যা নিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র মতে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো :

শাশ্বতবাদ : ‘শাশ্বত’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ধ্রম বা অপরিবর্তনশীল। এই মতবাদীরা আত্মা ও জগতকে শাশ্বত বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে, আত্মা ও জগত। উহা সগর তোরণের স্তম্ভের মতো স্থির। এ মতবাদীরা চারভাগে বিভক্ত ছিলেন।

একাংশ শাশ্বতবাদ : এ মতবাদীরা আত্মা ও জগতের একাংশ শাশ্বত এবং অপরাংশ অশাশ্বত বলে প্রচার করতেন। তাঁরা চার ভাগে বিভক্ত ছিলেন।

অন্তানন্তবাদ : ‘অন্ত’ ও ‘অনন্ত’ শব্দের সমন্বয়ে অন্তানন্ত শব্দটি গঠিত। অন্ত অর্থ সীমী। অনন্ত অর্থ অসীম বা সীমাহীন। এই মতবাদীরা জগতকে সীমী ও অসীম বলে প্রচার করতেন। তাঁরা চারভাগে বিভক্ত ছিলেন।

অমরা বিক্ষেপবাদ : এই মতবাদের অপর নাম সংশয়বাদ। এ মতবাদীরা চারভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁরা ভালো-মন্দ কোনোটার পক্ষে মত প্রকাশ করতেন না। ভালোর পক্ষে মত প্রকাশ করলে একদল অসন্তুষ্ট হতে পারে, খারাপের পক্ষে মত প্রকাশ করলে অপরদল অসন্তুষ্ট হতে পারে। তাই তাঁরা নির্দিষ্টভাবে কোনো মত প্রকাশ করতেন না।

অধীত্যসমৃৎপন্নবাদ : ‘অধীত্যসমৃৎপন্ন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে কারণ ব্যতীত উত্তর। এ মতবাদীরা মনে করতেন, আত্মা ও জগত সৃষ্টির কোনো কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। এগুলো অহেতুক বা অকারণবশতঃ উৎপন্ন হয়েছে। এ মতবাদীরা দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন।

ওদ্বাঘাতনিকা : ‘আঘতন’ শব্দের অর্থ মৃত্যু, চুতি বা লয়। আত্মা মৃত্যুর উর্ধ্বে অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা নির্বিকার থাকে এরপ মতবাদই হচ্ছে ওদ্বাঘাতনিকা। এ মতবাদীরা বত্রিশ রকমের মত প্রকাশ করতেন।

উচ্ছেদবাদ : এ মতবাদীরা বলেন, পাপ-পূণ্যের কোনোভেদ নেই। ভালো-মন্দ কেবল ইহলোকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার জন্য। মৃত্যুর পর মানুষের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। এ মতবাদীরা সাত রকম রকমের মত প্রকাশ করতেন।

দ্রষ্টব্য নির্বাণ বাদ : দ্রষ্টব্য শব্দের অর্থ হচ্ছে বর্তমান দেহ। এ মতবাদীরা মনে করতেন, বর্তমান দেহে নির্বাণ লাভ সম্ভব। তাঁরা পাঁচ রকমের মত প্রকাশ করতেন।

বুদ্ধের সময়কালে ভারতবর্ষে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর সাথে বুদ্ধের কিছু বিষয়ে পার্থক্য ছিল। মহাবীরের প্রধান বিচরণক্ষেত্র ছিল রাজগংহ। কিন্তু তাঁর সাথে বুদ্ধের কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। বুদ্ধের ন্যায় মহাবীরও অহিংসা বাণী প্রচার করেছেন।

এগুলো ছাড়াও বুদ্ধের সময়কালে বনাচরণ, কৃচ্ছতা সাধন, শারীরিক নির্ধারণ, যাগ-যজ্ঞ, নানা রকম মন্ত্র, তত্ত্ব, ঝাড়, ফুঁক প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। বুদ্ধ তাঁর সমকালীন প্রচলিত ধর্মসমূহ দুঃখমুক্তির সঠিক পথ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। প্রাক বৌদ্ধবুগীয় মতবাদসমূহে যেখানে কর্ম ও কর্মফলকে অস্থীকার করা হয়েছে এবং মানুষকে নিয়তি বা অদ্বিতীয় উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সেখানে বুদ্ধ কর্মবাদ উপস্থাপন করেন। তাঁর মতে, মানুষ কর্মের অধীন। যে যেরূপ কর্ম করবে সে সেরূপ কর্মফল ভোগ করবে।

বুদ্ধের সময়কালে ভারতবর্ষ ঘোলটি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই রাজ্যগুলোর প্রত্যেকটিকে ‘মহাজনপদ’ বলা হতো। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এগুলো ‘যোড়শ মহাজনপদ’ নামে খ্যাত। এ মহাজনপদের অনেকগুলোতে বুদ্ধ পরিভ্রমণ করে ধর্ম প্রচার করেছেন। জনপদগুলোর অনেক স্থানে বুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত থাকায় সেগুলো তীর্থস্থানের মর্যাদা লাভ করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের সময়কালীন ছয়টি শ্রমণ সম্বেদের প্রধান কে কে ছিলেন?

অধীত্যসমৃৎপন্নবাদ বলতে কী বুবা?

ঘোলটি জনপদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

গৌতম বুদ্ধের সময়কালের ঘোলটি রাজ্যের সবগুলোই খুব ইতিহাস প্রসিদ্ধ ছিল না। এতে অনেক রাজ্য অন্য রাজ্যের আঁহাসনের কারণে নিজস্ব স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছিল। তারপরও ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এগুলোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঘোড়শ মহাজনপদ বা ঘোলটি রাজ্য হলো :-

১. অঙ্গ ২. মগধ ৩. কাসী ৪. কোশল ৫. বজ্জী ৬. মল্ল ৭. চেতী ৮. বৎস ৯. কুরু ১০. পঞ্চাল ১১. মৎস্য ১২. সূরসেন
১৩. অশ্বাক ১৪. অবস্তী ১৫. গাঙ্কার এবং ১৬. কষ্মোজ।

নিম্নে এই ঘোলটি মহাজনপদের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করা হলো :

১। অঙ্গ

অঙ্গ রাজ্যটি ছিল মগধের পূর্বদিকে। মগধ রাজ্য ও অঙ্গ রাজ্যে সীমানা বিভক্ত হয়েছিল চম্পা নদীর মাধ্যমে। চম্পা নদী এ দুই রাজ্যকে পৃথক করে রেখেছিল। এ নদী ছিল মগধের অন্তর্গত। অঙ্গের রাজধানী ছিল চম্পা নগরী। মহারাজ দিসম্পতির মন্ত্রি মহাগোবিন্দ এ নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। চম্পা নদী ও গঙ্গা নদীসংগম হ্রদে উপকূলীয় অঞ্চলে চম্পা নগরী অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের সময় ব্রহ্মক্ষদস্ত নামে এক রাজা অঙ্গে রাজত্ব করতেন। রানি গগ্গরা অত্যন্ত বুদ্ধ ভক্ত ছিলেন। তিনি চম্পা নগরীতে একটি বিশাল দিঘি খনন করিয়েছিলেন। এই দিঘির পাড়ে বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। সূত্রপিট পাঠে জানা যায় গৌতমবুদ্ধ এখানে আটবার এসেছিলেন। মগধের যুবরাজ বিষিসার রাজা ব্রহ্মক্ষদস্তকে পরাজিত করে অঙ্গ অধিকার করেন। সে সময় এ রাজ্য মগধের সাথে একত্রিত হয়ে অঙ্গ-মগধ নামে পরিচিতি লাভ করে।

২। মগধ

বর্তমান ভারতের পাটনা ও গয়া জেলার স্থলেই ছিল মগধ রাজ্য। এর উত্তরে গঙ্গা এবং পশ্চিমে শোন নদী, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের শাখা এবং পূর্বে ছিল চম্পা নদী। গয়ার নিকটস্থ প্রাচীন রাজগৃহ ছিল মগধের রাজধানী। রাজগৃহে গৌতমবুদ্ধ বহুবার ধর্মদেশনা করেছিলেন বলে জানা যায়। এখানে বুদ্ধ করেকবার বর্ষাবাসব্রত যাপন করেছিলেন। বুদ্ধের সময় মগধের রাজা ছিলেন বিষিসার। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্য ছিলেন। রাজগৃহের বেলুবন উদ্যানটি তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসভ্যের জন্য দান করেছিলেন। রাজা বিষিসার বুদ্ধ ও ভিক্ষুসভ্যের কল্যাণে আরও অনেক মহৎ কাজ করেছিলেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন সূত্রে রাজা বিষিসারের নাম উল্লেখ রয়েছে। বুদ্ধের জীবিতকালেই যুবরাজ অজাতশত্রু অন্যের প্ররোচনায় পিতা বিষিসারকে বন্দী করে সিংহাসন দখল করেন। তিনি প্রথম জীবনে বুদ্ধ বিদ্যৈ ছিলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং অনুত্তম হয়ে বুদ্ধের শরণাপন্ন হন। তিনিও বুদ্ধের গৃহী শিষ্য হয়েছিলেন। অজাতশত্রু মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তর করেছিলেন। সেসময় জান চৰ্চার পীঠস্থান হিসেবে পাটলিপুত্রের সুখ্যাতি ছিল।

৩। কাসী

প্রাচীন ভারতে কাসী এক উল্লত ও সম্পদশালী রাজ্য ছিল। শিক্ষা ও শিল্পকলার উন্নতিতে কাসী রাজ্যের খুব খ্যাতি ছিল। কাসীর রাজধানী ছিল বারাণসী। এটি ছিল সে সময়ের এক প্রসিদ্ধ নগরী। বারাণসীস্থ সারনাথের ঝর্ণপতনের মৃগধাবে বুদ্ধ পঞ্চবর্ণীয় শিষ্যদের কাছে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। বারাণসীর বিভিন্ন স্থানে বুদ্ধ দশবার ধর্মদেশনা করেছিলেন। বুদ্ধ প্রথম বর্ষাবাসব্রত এখানেই পালন করেছিলেন। এ রাজ্যের অনেক রাজাকেই ব্রহ্মস্ত নামে নির্দেশ করা হতো। বুদ্ধের সমকালীন সময়ে এ রাজ্য কোশলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে কাসী-কোশল নামে খ্যাত হয়।

৪। কোশল

কোশল ছিল একটি নদী বেষ্ঠিত রাজ্য। এর পশ্চিমে সুমতি নদী, দক্ষিণে সর্পিকা বা স্যান্দিকা নদী, পূর্বে সদানীরা নদী ও উত্তরে ছিল নেপালের পার্বত্য অঞ্চল। কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবণ্তী। পালি ভাষার উচ্চারণে এটিকে সাবস্থী বলা হয়। আবার অনেকের মতে এ শহরে সবকিছু পাওয়া যায় বলে এটিকে শ্রাবণ্তী বলা হয়। এটি অচিরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। অচিরাবতীর বর্তমান নাম রাণ্মী নদী। বুদ্ধের সমকালে রাজা প্রসেনজিত এখানে রাজত্ব করতেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে তাঁর অনেক অবদান রয়েছে। বুদ্ধের অনুসারী এক প্রথ্যাত শ্রেষ্ঠী কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবণ্তীতে বাস করতেন। তাঁরা হলেন অনাথপিণ্ডিক ও বিশাখা। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক জেতবন বিহার এবং মহাউপাসিকা বিশাখা পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর ভিক্ষুসমকে দান করেছিলেন। শ্রাবণ্তীতে বুদ্ধ ২৫ বর্ষাবাসব্রত পালন করেছিলেন। বুদ্ধ শ্রাবণ্তীতে অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। প্রাচীন ভারতের প্রসিদ্ধ নগরী অযোধ্যা ও সাকেত কোশলের অন্তর্গত ছিল।

৫। বজ্জী

গঙ্গার উত্তরে নেপালের পার্বত্য অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এ রাজ্য। এর পশ্চিমে ছিল গঙ্গক নদী এবং পূর্ব দিকে ছিল কোসী ও মহানন্দা নদী। রাজধানী ছিল বৈশালী। বুদ্ধের সময় বৈশালী ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী নগরী। বজ্জীরা অত্যন্ত সুশ্রৎখল জাতি ছিল। তারা সজ্জবন্ধভাবে সকল কাজ সমাধা করতেন। বুদ্ধ বজ্জীদের এ রূপ আচরণের প্রশংসা করেছেন।

বজ্জী রাজ্যের রাজধানী বৈশালীতে এক সময় মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও ভূত প্রেতের ভয়ে সকলে দিশাহারা হয়ে পড়ে। স্বয়ং রাজা এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারছিলেন না। তখন নিরূপায় হয়ে সকলে সর্বসন্ত্বার হিতাকাঞ্চিৎ বুদ্ধকে স্বশিষ্য নিমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ বজ্জী রাজ্যবাসীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। বজ্জীরাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল চিত্তে উপযুক্ত মর্যাদায় বুদ্ধকে স্বরাজ্যে আনয়নের ব্যবস্থা করেন। বুদ্ধের আগমণে এ রাজ্যে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এতে জলপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। এতে পাঁচ শবাদিসহ নোংরা গন্ধ আবর্জনাদি বিনাশ হয়। এ সময় তথাগত বুদ্ধ আনন্দ স্থাবরকে বৈশালীর চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করে ‘রতন সূত্র’ পাঠের আদেশ দেন। সূত্র পাঠের পর উক্ত ত্রিবিধ ভয় উপশম হয়। বুদ্ধের এ আগমণ উপলক্ষে বৈশালীর বিভিন্ন জায়গায় চৈত্য নির্মাণ করা হয়। পরে বুদ্ধ বজ্জীবাসীর উদ্দেশ্যে ‘সপ্ত অপরিহানীয়’ নামে রাজ্যের শ্রীবৃক্ষিজনক ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। বুদ্ধ তাঁর শেষ বর্ষাবাসব্রত বৈশালীতে পালন করেছিলেন।

৬। মল্ল

মল্ল রাজ্য ছিল বজ্জী রাজ্যের পূর্বে ও কোশল রাজ্যের পশ্চিমে অবস্থিত। মল্ল রাজ্যের ওপর দিয়ে বুদ্ধ বহুবার যাতায়াত করেছেন। মগধ ও কোশলে যাওয়ার রাস্তা মল্ল রাজ্যের ভিতর দিয়ে ছিল। মল্লদের রাজধানী ছিল কুশিনারা। এটিকে কুশনগরও বলা হয়। এর অবস্থান ছিল হিণ্যবতী নদীর তীরে। এই নদীর বর্তমান নাম শোন নদী। কুশিনারার শালবনে গৌতম বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। বুদ্ধের অন্ত্যোষ্ঠিক্রিয়ার পর এখানে তাঁর যে দেহাবশেষ ছিল তা দ্রোণ ব্রাহ্মণের মাধ্যমে আটজন ভাগ করে নিয়ে সেগুলোর উপর চৈত নির্মাণ করেছিলেন। পরবর্তীতে সন্তাট অশোক এখানে বুদ্ধের বিশাল পরিনির্বাণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৭। চেতী

চেতী বা চেদী রাজ্যের অবস্থান ছিল যমুনার তীরবর্তী অঞ্চলে কুরু রাজ্যের পাশে। চেতীর রাজধানী ছিল সোথিবতী বা স্বষ্টিবতী। এটি বর্তমানে ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত। বেসসন্তর জাতকে বর্ণিত ‘শিবি’ এই চেতী রাজ্যের সংলগ্ন ছিল। বুদ্ধ চেতী রাজ্যে একবার ধর্মদেশনা করেছিলেন। কাসী রাজ্যের সঙ্গে চেতী রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। চেতী রাজ্যের সঙ্গে ভগবান বুদ্ধের জীবনের কোনো ঘটনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

৮। বৎস

গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বৎস রাজ্য অবস্থিত ছিল। এলাহাবাদের কাছে কৌশাম্বী বা আধুনিক কোসম ছিল এর রাজধানী। বুদ্ধের সময় এখানে উদয়ন নামক এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি অত্যন্ত আরামপ্রিয় ও বিলাসী ছিলেন। তিনি হাতি ধরার মন্ত্র জানতেন। তিনি পিণ্ডল ভারদ্বাজ নামের এক ভিক্ষুর মাধ্যমে বুদ্ধের গৃহী শিষ্য হয়েছিলেন। রাজা উদয়নের প্রধান রাণি শ্যামাবতী ও তার প্রধান সেবিকা খুজ্জত্তরা দু'জনই বুদ্ধের অনুসারি ছিলেন। কৌশাম্বীর এই উদ্যানে রাণি শ্যামাবতী একটি বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে দানকরেছিলেন। এ বিহারের নাম ঘোষিতারাম। এখানে রাজা উদয়ন বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবশত বুদ্ধের জীবন্দশ্শাতেই রক্তচন্দন কাঠ দ্বারা একটি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

৯। কুরু

কুরু রাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্ত। এটি বর্তমান দিল্লির নিকটবর্তী ইন্দ্রপত অঞ্চল। বুদ্ধের সময় পৌরব্য নামের এক রাজা রাজত্ব করতেন। বুদ্ধ কুরু জনপদ অনেকবার পরিব্রহণ করেছিলেন। এখানে বুদ্ধ চার বার ধর্মদেশনা করেছিলেন বলে জানা যায়। কুরুর বিশিষ্ট ধনী যুবক রাষ্ট্রপাল বুদ্ধের কাছে ভিক্ষুত্বে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

১০। পঞ্চাল

রোহিলখণ্ড এবং মধ্য দোয়ারের একাংশ নিয়ে পঞ্চাল গঠিত। গঙ্গা নদী এই রাজ্যকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছিল। একটি ছিল উত্তর পঞ্চাল অন্যটি দক্ষিণ পাঞ্চাল। উত্তর পঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র বা ছত্রবর্তী। এটি বর্তমানে রামনগর নামে পরিচিত। দক্ষিণ পঞ্চালের রাজধানী ছিল কাম্পল্য। বুদ্ধের সময়ে এ রাজ্যের খুব বেশি প্রভাব ছিল বলে অনুমিত হয়না। এ রাজ্যের জনসাধারণ ও নগর সম্পর্কে বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

১১। মৎস্য

চেতী রাজ্যের পার্শ্বস্থ চম্পলের পার্বত্য অঞ্চল ও সরস্বতী নদীর তীরবর্তি বনাঞ্চল নিয়ে মৎস্য রাজ্য বা জনপদ গঠিত। এর মধ্যস্থলে ছিল রাজধানীর মর্যাদা সম্পন্ন ‘বৈরাট নগর’। এটি হলো বর্তমান জয়পুরের বৈরাট। বুদ্ধ এই রাজ্য কয়েকবার ভ্রমণ করেছিলেন বলে জানা যায়। বৈরাট নগরে সম্রাট অশোকের কয়েকটি বিখ্যাত শিলালিপি পাওয়া গেছে।

১২। সূরসেন

এটি যমুনার তীরবর্তী একটি রাজ্য। এর রাজধানী ছিল মথুরা। বুদ্ধের সময় এখানে রাজত্ব করতেন রাজা অবস্তীপুত্র। তিনি বুদ্ধশিষ্য মহাকচ্ছায়নের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বুদ্ধের অন্যতম উপাসক ছিলেন। এ রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় মথুরা অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ সাধিত হয়েছিল।

১৩। অশুক

অশুক বা অস্সক রাজ্য ছিল গোদাবরী নদীর কূলবর্তী অঞ্চলে। রাজধানী ছিল পোটলি, পোটন বা পোদন। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন অস্সক। তার সম্পর্কে তেমন বেশি জানা যায় না। এখানে বাবরি নামে এক সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি সশিষ্য বুদ্ধের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

১৪। অবস্তী

নর্মদা উপত্যকার মান্দাতা থেকে মহেশ্বর ও পাশ্ববর্তী কয়েকটি জেলা নিয়েই গঠিত হয়েছিল অবস্তী রাজ্য। রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। বুদ্ধের সময়ে এখানে রাজা ছিলেন চণ্ডপ্রদ্যোত। বুদ্ধ অবস্তী রাজ্যে এসেছিলেন কতবার সে তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অবস্তী রাজ্যের পুরোহিত পুত্র মহাকচায়ন বুদ্ধের একজন খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন।

১৫। গান্ধার

প্রাচীন ভারতবর্ষে শিল্প সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র হিসেবে গান্ধার রাজ্যের সুখ্যাতি ছিল। গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। বুদ্ধের সময় এখানে পুরুষসাতি নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি শেষ বয়সে রাজ্য ছেড়ে পায়ে হেঁটে রাজগৃহে গিয়ে বুদ্ধের ভিক্ষুসঙ্গে যোগদান করেছিলেন। গান্ধারের রাজধানী তক্ষশীলা ছিল বিবিধ বিদ্যাশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্রস্থল। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক জীবক এখানেই চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারতবর্ষের অত্যন্ত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। তক্ষশীলা বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত।

১৬। কমোজ

বর্তমান কালের ভারত পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমে গান্ধারের নিকটবর্তী স্থানে কমোজ রাজ্য অবস্থিত ছিল। কমোজের রাজধানী হিসেবে দুটি নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো দ্বারকা ও রাজপুর। কমোজ রাজ্যে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। এ রাজ্যে চন্দ্রবর্মন ও সুদক্ষিণ নামের দু'জন রাজার কথা জানা যায়। বুদ্ধের সময় এ রাজ্যে কোনু রাজা রাজত্ব করতেন তা জানা যায় না। এ রাজ্যে কুকুটবর্তী নামের এক নগরী ছিল। সে নগরীর শাসনকর্তা ছিলেন মহাকশ্মিন। তাঁকেও রাজা নামে আখ্যায়িত করা হতো। রাজা মহাকশ্মিন বুদ্ধবাণীর গুণ মহিমা উপলক্ষ্য করে সপরিষদ মধ্যদেশের চন্দ্রভাগা নদী তীরে বুদ্ধের কাছে গিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

মোড়শ মহাজনপদের প্রত্যেকটির রাজা ও রাজধানীর নামের একটি তালিকা তৈরি কর

বিভিন্ন রাজাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অবদান

বুদ্ধের সমকালীন রাজাদের মধ্যে যারা বৌদ্ধধর্মের কল্যাণে নানাবিধ অবদান রেখে খ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অংগণ্য হলেন রাজা বিষ্ণুসার। তিনি মগধ রাজ্যের রাজা ছিলেন। তাঁর সাথে সিদ্ধার্থ গৌতমের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বেও একবার সাক্ষাৎ হয়। তখন সিদ্ধার্থ গৌতম সন্ন্যাস ব্রত পালনের মাধ্যমে দুঃখমুক্তির পথ অন্঵েষণ করে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন। রাজা বিষ্ণুসার সিদ্ধার্থ গৌতমের সুন্দর সুগঠিত দেহাবয়ব দেখে তাঁকে সেনাপতির পদ দিতে ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। উত্তরে সিদ্ধার্থ গৌতম বলেছিলেন, আমি কোশল রাজ্যের অন্তর্গত শাক্যগণের রাজ্য কপিলাবস্তুর রাজা শুক্রোদনের পুত্র। দুঃখমুক্তির পথ অন্঵েষণের জন্য আমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছি। তখন রাজা বিষ্ণুসার বলেছিলেন বুদ্ধত্ব লাভ করলে তিনি তাঁর শরণনাগত হবেন। সত্যিই বুদ্ধত্ব লাভের পর রাজা বিষ্ণুসার বুদ্ধের শরণাগত হন। তিনি বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যদের উপযুক্ত মর্যাদা প্রদানের জন্য রাজ্য আদেশ জারি করেছিলেন। ফলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার বেড়ে যায়। এ কারণে অনেকে সুবিধা লাভের জন্য ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করেছিলেন। রাজা বিষ্ণুসার বিষয়টি বুদ্ধের কাছে জানালেন। এ পরিস্থিতিতে বুদ্ধ রাজত্ব, চোর-ডাকাত, দণ্ডপাণ আসামী ও খণ্টী

ব্যক্তিদের প্রব্রজ্যা না দেওয়ার আদেশ দেন। রাজা বিষ্ণুসারের অনুরোধে বুদ্ধ অমাবশ্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে ভিক্ষুদের জন্য উপোসথ ও ধর্মালোচনা, গৃহীদের জন্য অষ্টশীল, পঞ্চশীল পালনের বিধান প্রবর্তন করেন।

মহাবর্গ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, পিলিন্দবৎস স্থবির এক সময় রাজগৃহে পাহাড় পরিষ্কার করছিলেন। রাজা বিষ্ণুসার বুদ্ধশিষ্য পিলিন্দবৎস স্থবিরকে একপ কাজ করতে দেখে জিজেস করে জানলেন ভিক্ষুদের বাসের জন্য স্থান প্রস্তুত করছেন। রাজা বিষ্ণুসার বললেন তথাগত বুদ্ধ সম্মতি দিলে তিনি এর ব্যবস্থা করবেন। বুদ্ধের সম্মতি যথাসময়ে পাওয়া গেল। কিন্তু রাজা এ প্রতিশ্রূতির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। অনেকদিন পরে হঠাতে বিষয়টি তাঁর স্মরণ হলো। তখন প্রধান অমাত্যকে ডেকে জিজাসা করলেন, ‘ভিক্ষুদের জন্য আমি বাসস্থান তৈরি করে দেব বলেছিলাম, সে কাজ কি সম্পূর্ণ করা হয়েছিল?’ উত্তরে অমাত্য বলল না। তখন রাজা জিজেস করলেন, প্রতিশ্রূতির পর কত রাত অতিবাহিত হলো? অমাত্য গননা করে বললেন পাঁচশো’ রাত্রি। তখন রাজা ভিক্ষুদের জন্য পাঁচশ’টি আরাম নির্মাণ করে দিতে আদেশ দিলেন। কালক্রমে রাজগৃহের এ স্থানটি ‘পিলিন্দবৎস গ্রাম’ নামে খ্যাত হয়।

বিষ্ণুসারের পর তাঁর পুত্র অজাতশত্রু মগধের রাজ পদে অভিষিক্ত হন। তিনি দেবদত্তের প্ররোচনায় প্রথমে বুদ্ধ বিদ্যে ছিলেন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হয়ে তিনি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাগের তিন মাস পর প্রথম বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি রাজা অজাতশত্রু পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সঙ্গীতিতে বুদ্ধবাণী সংকলন করা হয়েছিল। তাই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে রাজা অজাতশত্রুর নাম অমর হয়ে আছে।

পরবর্তিতে তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাগের একশ’ বছর পরে মগধের রাজা কালাশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বিতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি ও প্রায় দুইশো’ আঠার বছর পরে স্মার্ট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত হয় তৃতীয় বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতি। বুদ্ধের বাণী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গ্রহণ করার ক্ষেত্রে এ মহাসঙ্গীতিগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বৌদ্ধধর্মের প্রচারে এই বৌদ্ধ-মহাসঙ্গীতগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া মহাসঙ্গীতি আয়োজন করা কখনোই সম্ভব ছিল না। সঙ্গীতি আয়োজনের ক্ষেত্রে রাজাদের অবদান বৌদ্ধধর্মের অনুসারীগণ এখনো শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করে।

এ ছাড়া অন্যান্য রাজাদের মধ্যে কোশলের রাজা প্রসেনজিত ও উজ্জয়নির রাজা প্রদ্যোত বুদ্ধের উপাসক ছিলেন। তাঁরা রাজা বিষ্ণুসারের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা সে সময় নানাভাবে বুদ্ধের ধর্ম দর্শন বিকাশে সশ্রদ্ধ চিন্তে সহায়তা দিয়েছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাকারী রাজাদের একটি নামের তালিকা তৈরি কর

পাঠ : ৩

মৌর্য যুগ

চন্দ্রগুপ্ত ও বিষ্ণুসারের পরিচয়

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মৌর্য বংশের প্রথম রাজা। তিনি মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মৌর্যরা ছিল সূর্যবংশীয়। সূর্যবংশীয় রাজকুমার মান্দ্যাত্ থেকে মৌর্যবংশের উত্তর। প্রিষ্ঠপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌর্যরা এক গণতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠী ছিল। পূর্ব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সাথে তারাও মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন মগধের রাজা ছিল নন্দবংশীয়। এ সময়

চন্দ্রগুপ্ত তক্ষশীলার এক খ্যাতিমান ব্রহ্মাণের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তার নাম কোটিল্য, যিনি চাপক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও পরিচিত। তার সহায়তায় নন্দ বৎশের রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসন লাভ করেন। রাজা চন্দ্রগুপ্ত যেমন সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন তেমনি সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। তাঁর মন্ত্রি কোটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রের নীতিসমূহ তিনি বিশেষভাবে অনুসরণ করতেন।

গ্রীক সন্ত্রাট আলেকজাঞ্চারের মৃত্যুর পর ভারত উপমহাদেশ থেকে গ্রীক শাসন উচ্চদের প্রথম উদ্যোগ নেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। গ্রীকদের পরাজিত করে বহু রাজ্য তিনি অধিকার করেন। এ সময় আলেকজাঞ্চারের অনুগামী সেলুকাসের সাথে তাঁর প্রথমে দ্বন্দ্ব ও মৈত্রী সম্পর্ক হয়। মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য সেলুকাস মেঘাস্থিনিস নামক একজন দৃত চন্দ্রগুপ্তের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে কান্দাহার, কাবুল, হিলাট ও বেনুচিস্ত্রান হস্তান্তর করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সেলুকাসকে পাঁচশ হাতি উপহার দিয়েছিলেন। এ ঐতিহাসিক বিষয়গুলো নিয়ে পরবর্তিতে মেঘাস্থিনিস একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির নাম হলো ‘ইন্ডিকা’। এই মূল গ্রন্থটি এখন পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় শতাব্দীর খ্যাতিমান জীবনীকার প্লটার্ক, জাস্টিন ও ঐতিহাসিক বিষয়ের গ্রন্থ প্রণেতা এ্যারিবিয়ান তাদের রচনায় ইন্ডিকা গ্রন্থের উদ্ভৃতি ব্যবহার করেছেন।

চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন জৈন ধর্মের অনুসারি। তিনি চবিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। কথিত আছে, এক সময় রাজ্যে দৃঢ়িক্ষ দেখা দিলে রাজা চন্দ্রগুপ্ত নিজ পুত্রের হাতে সিংহাসনের ভার তুলে দিয়ে তিনি মহীশূরে চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্রের নাম বিন্দুসার। তিনি চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারি হিসেবে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি সুশাসক ছিলেন। কোটিল্য বিন্দুসারের রাজত্বকালেও কিছুদিন মন্ত্রির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিন্দুসার রাজ্য বিস্তারের নেশায় যুদ্ধান্ত হাতেভুলে নেননি। তিনি পিতার ন্যায় গ্রীকদের সাথে সম্প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। বিন্দুসার শান্তিকামী ও শিক্ষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি রাজ্য বিস্তারের নেশায় যুদ্ধান্ত হাতে ভুলে নেননি। বিন্দুসারের রাজত্বকালে তক্ষশীলায় একবার প্রজা বিদ্রোহ হয়েছিল। রাজা বিন্দুসার যুবরাজ অশোককে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। অশোক শান্তিপূর্ণ ভাবেই সে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। অশোক ছাড়াও রাজা বিন্দুসারের আরও অনেক পুত্র ও কন্যা ছিল। বিন্দুসার পাঁচশ বছর রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। অতপর বার্ধক্যজনিত কারণে তাঁর মৃত্যু হলে পুত্র অশোক সিংহাসনের উত্তরাধিকারি হয়।

রাজ্য বিস্তার ও শৌর্য বীর্যের পরাক্রমতায় বিন্দুসার পুত্র অশোক ‘সন্ত্রাট অশোক’ নামে সমধিক খ্যাত হন। সন্ত্রাট অশোক প্রথমে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি খুব বেশি মনোযোগ দেননি। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বুদ্ধের শিক্ষা ও নীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ জাগে। কলিঙ্গ যুদ্ধে এক লক্ষের বেশি মানুষ নিহত হয়। এই ঘোরতর যুদ্ধের পর অশোকের মনে পরিবর্তন আসে। তারপর ন্যায়োধ শ্রামগের নিকট বুদ্ধবাণী শ্রবণ করে বৌদ্ধধর্মের অন্যতম উপাসকে পরিণত হন। তাঁর নাম হয় ‘ধর্মাশোক’। এছাড়া অন্য একটি অভিধা ছিল ‘দেবানাম পিয় পিয়দসি’ অর্থাৎ দেবগণের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী। তিনি বুদ্ধের শিক্ষাসমূহ ভালোভাবে অনুসরণ করতেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসারে মৌর্যবৎশের অবদান

মৌর্যবৎশের কীর্তিমান নৃপতি অশোক বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী হয়ে জনসাধারণের কল্যাণে গভীর মনোনিবেশ করেন। জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি ধর্মমহামাত্র নামে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত করেন। লোকশিক্ষা ও ধর্ম প্রচারের জন্য রাজ্যের সবখানে বুদ্ধের অনুশাসন লিখে দিলেন। সেগুলো খোদাই করা হয় পর্বতের গায়ে, পাহাড়ের শীর্ষে ও গুহা গাত্রে। এভাবে তিনি অনেক অনুশাসন তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সবখানে ছাড়িয়ে দেন। এগুলো অশোক শিলালিপি নামে পরিচিত।

এখন পর্যন্ত সম্রাট অশোকের ৩৪টি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব অনুশাসনের মর্মবাণী ছিল গুরুজনে ভঙ্গি, জীবে দয়া, ভিক্ষু শ্রামণ ও দরিদ্রদের দান প্রদান, আত্মীয় স্বজন, দাসদাসী ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি সৎ ব্যবহার, সত্যভাষণ করা ইত্যাদি। তিনি সকল ধর্মের প্রতি তিনি উদার ছিলেন। তাঁর সামাজ্য সকল ধর্মের লোক সুখে বাস করতো। সকলকে তিনি মুক্ত হস্তে দান করতেন। তিনি বুদ্ধের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র স্থানগুলো চিহ্নিত করেন ও সেসব স্থানে বিহার, চৈত ও স্তুপ নির্মাণ করেন।

সেবা ও কল্যাণের ব্রত নিয়ে তিনি রাজ্যে ভ্রমণের ব্যবস্থা করতেন। এটিকে ধর্ম্যাত্মার সময় তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বুদ্ধের পবিত্র অস্থিধাতু সংগ্রহ করেন। তারপর চুরাশি হাজার স্তূপ নির্মাণ করে সেগুলো সমগ্র ভারতবর্ষে সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশের মানুষকে গৌতম বুদ্ধের অমিয় বাণীর প্রতি আকৃষ্ট করা। তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল ত্রৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির আয়োজন। এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রে। এই সঙ্গীতির মাধ্যমে বৌদ্ধসংঘ কল্যাণমুক্ত হয় এবং প্রকৃত বুদ্ধবাণী সংকলিত করে ধর্মদূতের মাধ্যমে তা দেশ-বিদেশে প্রচার করা হয়। অশোক তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা বুদ্ধবাণী সিংহলে প্রচার করেন। সিংহলের রাজা তিস্স সম্রাট অশোকের সম্মানে নিজেও ‘দেবনাম পিয়’ উপাধি গ্রহণ করেন।

অশোকের অনুশাসনে লেখা আছে যে, তিনি আফগানিস্তানসহ মধ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য দৃত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বাণী হিক ভাষায় অনুদিত করে প্রচার করা হয়েছিল। অশোকের সাম্রাজ্যের সীমা আফগানিস্তানের কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখানেও সম্রাট অশোকের শিলালিপি পাওয়া গেছে। এ সময় ভারত ছাড়াও বৌদ্ধ ধর্ম জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তিক্রতে ধর্মদূত প্রেরণ করা হয়।

মৌর্যরা প্রায় ১৩৭ বছর মগধে রাজত্ব করেন। তারপর মৌর্যবংশের শাসন সমাপ্ত হয়। এরপর শুঙ্গবংশ মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁরা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন না। কিন্তু তখনও বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব বজায় ছিল। হিউয়েন সাং বাংলাদেশেও সম্রাট অশোকের নির্মিত স্তূপ দেখেছেন বলে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন।

অনুশীলনযূক্ত কাজ

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে মৌর্যবংশের কোনু রাজার অবদান তুমি সবচেয়ে বেশি মনে কর এবং কেন?

পাঠ : ৪

কুষাণ আমল

প্রিষ্ঠপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে কুষাণ বংশের রাজত্বের সূচনা হয়। কুষাণ বংশের প্রথম রাজা ছিলেন কুজুল কদ্ফিসেস। মগধ বা বর্তমান বিহার থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারত, মধ্য এশিয়ার কিছু অঞ্চল ও আফগানিস্তান নিয়ে এই সাম্রাজ্য গঠিত হয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ মৃপ্তি ছিলেন কণিক। সম্রাট অশোকের মতো তিনি প্রথম জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন না। স্ববির পার্শ্বকের সংস্পর্শে এসে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগী হন। তারপর থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার-প্রসারের জন্য তিনি খুব আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে সম্রাট কণিকের অবদান

সম্রাট কণিকের সময়ে ভিক্ষুসংঘ বিভিন্ন নিকায়ে বিভক্ত ছিলেন। ভিক্ষুদের সংহতি রক্ষার জন্য সম্রাট কণিক চেষ্টা শুরু করেন। তিনি ধর্মগুরু পার্শ্বকের পরামর্শে একটি সঙ্গীতি আহ্বান করেন। বিভিন্ন মতবাদের পণ্ডিত ভিক্ষুদের আহ্বান করে জালন্ধরে সমবেত করেন। উপস্থিতি ভিক্ষুদের মধ্যে থেকে সঙ্গীতির জন্য পাঁচশত পণ্ডিত ভিক্ষু নির্বাচন করা হয়।

সম্মাট কণিক তাঁদের জন্য একটি সুন্দর ভবন নির্মাণ করেন। এই ভবনেই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। পরে এ ভবনের নাম হয় কুণ্ডলবন বিহার। এই সঙ্গীতিতে পালির ভাষার বদলে বুদ্ধবাণী সংস্কৃত ভাষায় সংকলন করা হয়। তারপর সংকলিত ত্রিপিটকের ওপর টীকাগ্রহ রচিত হয়। এর নাম বিভাসাশাস্ত্র। এই সঙ্গীতিকে কণিক সঙ্গীতি বা সর্বান্তিবাদী সঙ্গীতিও বলা হয়।

কণিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে অনেক স্তুপ ও চৈত্য নির্মাণ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি চিন ও মধ্য এশিয়ায় ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। কণিকের সময় মহাকবি অশ্বগোষ ও বিখ্যাত দার্শনিক বসুমিত্র অনেক বৌদ্ধ প্রভৃতি রচনা করেন। কণিক নিজেও অত্যন্ত গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সন্তানজ্যের নানা স্থানে শিলালিপিতে উপদেশ লিখে রেখে গেছেন। আফগানিস্তানে এ রকম একটি প্রকা- শিলালিপি পাওয়া যায়। শিলালিপিতে বিহার নির্মাণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

কণিকের পর গুণ্ঠ সন্তানজ্যের সময় ফা হিয়েন ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসেন। তিনি বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের কথা বলে গেছেন। বগুড়া জেলার মহাস্থানে বৌদ্ধিসন্তুর একটি মূর্তি পাওয়া যায়। রাজশাহীর বিহারেও এই সময়ে একটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এতে প্রমাণিত হয় যে কণিকের সময় বাংলাদেশেও বৌদ্ধধর্মের প্রচার লাভ করেছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ

সম্মাট কণিকের কোন অবদানটি তুমি বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে কর যুক্তিসহ লেখ

পাঠ : ৫

পাল যুগ

অষ্টম শতকে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় অরাজকতা দেখা দেয়। দেশে তখন কোন রাজা ছিল না। পরিস্থিতি ছিল ক্ষমতাধরদের নিয়ন্ত্রণে। এরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থাকে বলা হতো ‘মাত্স্যন্যায়’। মাত্স্যন্যায় বলতে ন্যায়-নীতি হীন ব্যবস্থাকে বোঝায়। অর্থাৎ, বড় মাছ যেমন নির্বিচারে ছোট মাছদের খেয়ে ফেলে তেমনি অষ্টম শতকে বাংলায় বলবানরা দুর্বলদের শোষণ ও পীড়ন করতো। এরূপ পরিস্থিতিকে ‘মাত্স্যন্যায়’ বলে। এরূপ অবস্থায় বাংলার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে গোপালকে রাজপদে অভিষিঞ্চ করেন। তিনি পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজা হন।

রাজা গোপালের পিতার নাম ছিল বঞ্চিট দেব। তিনি ছিলেন গৌড়ের দয়িতব্যের পৌত্র। গোপাল প্রায় কুড়ি বছর রাজত্ব করেন। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম নির্বাচিত গণতান্ত্রিক রাজা। তাঁর মৃত্যুর পর রাজপদে অভিষিঞ্চ হন তাঁর পুত্র ধর্মপাল। রাজা ধর্মপালের সময় বিক্রমশীল ও সোমপুর মহাবিহারসহ বহু বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। রাজা ধর্মপালের উত্তরাধিকারি হয়েছিলেন তাঁর পুত্র দেবপাল। এভাবে পাল বংশ প্রায় চারশত বছরব্যাপী বাংলায় রাজত্ব করেন। এ সময় প্রজন্ম পরম্পরায় পালবংশের আঠারজন রাজা রাজত্ব করেন। পরবর্তি প্রজন্মের রাজাদের মধ্যে মহীপাল, রামপাল, ন্যায়পাল ও মদনপালের নাম বিশেষভাবে সুপরিচিত। পালবংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন গোবিন্দপাল।

পাল বংশের সব রাজারাই ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। কিন্তু অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতিও তাঁরা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করতেন। এ সময় বাংলার সঙ্গে এশিয়ার জাভা, সুমাত্রা, বালী ইত্যাদি দ্বীপ রাজ্যগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। সেসব অঞ্চলে আগেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ করেছিল। পাল যুগে সেই অঞ্চলের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে পাল রাজাদের অবদান

পাল যুগের প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠিত বিহারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : ওদন্তপুরী বিহার, বিক্রমশীল বিহার, সোমপুরী বিহার, পঞ্চিত বিহার ও জগদ্দল বিহার। রাজা মহীপাল সারনাথ ও বুদ্ধগয়া অঞ্চলে অনেক বিহার সংস্কার করেন এবং নতুন বিহার প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময় বাঙালী পঞ্চিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নানাবিধি বিষয়ে প্রায় দুইশ'টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি তিব্বত রাজার আমন্ত্রণে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। তিনি কুসংস্কারাচ্ছন্ন তিব্বতবাসীকে বুদ্ধের অমৃত বাণী ভাষণ করে ধর্মপথে পরিচালিত করেন। ধর্মপালের সময় নালন্দা মহাবিহার সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি লাভ করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মহাবিহারসমূহের গৌরব বহিবিশ্বেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিহারসমূহে তিব্বত ও চিন থেকে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণ শিক্ষা লাভ করতে আসতেন। বিহারগুলো অসংখ্য খ্যাতিমান বৌদ্ধ পঞ্চিতের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। তিব্বতি ও ভারতীয় পঞ্চিতরা বিহারগুলোতে বসবাস করে বৌদ্ধগুলি অনুবাদ করে তিব্বত, কাশ্মীর, মেপাল ও চিন প্রভৃতি দেশে নিয়ে যেতেন।

পাল যুগে বাংলা ভাষার উন্নেষ্ট হয়। বাংলা ভাষার আদি নির্দশন চর্যাপদ বা বৌদ্ধ গান ও দোহা এসময় রচিত হয়েছিল। এগুলো রচনাকাল অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী বলে অনুমান করা হয়। পাল যুগে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এ সময় বাংলাদেশে শাঙ্ক ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ও ত্রাঙ্গণ্য ধর্মেরও প্রসার ঘটে। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পাল যুগে বাংলার বিভিন্ন ধর্ম ও সাক্ষুতিক ঐতিহ্য সম্মিলিতভাবে বিকাশ লাভ করেছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ

পালযুগে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহারগুলোর তালিকা প্রস্তুত কর

পাঠ : ৬ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম

প্রাক - আধুনিক যুগ

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম কখন এবং কীভাবে প্রচার প্রসার লাভ করেছিল সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি আছে যে, বুদ্ধের সময়কালেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার প্রসার লাভ করেছিল। জনশ্রুতি হতে জানা যায় যে, বুদ্ধ কর্ণসুবর্ণ ও সমতটে সাতদিন, পুণ্ডবর্ধনে তিনমাস অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও পুণ্ডবর্ধন ছিল বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাচীন নাম। মহাবংস ও দীপবংস গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, সন্ত্রাট অশোকের সময় সোণ ও উত্তর থের বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মিয়ানমারে গিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় তাঁরা বাংলার উপর দিয়ে মিয়ানমারে গিয়েছিলেন এবং যাওয়ার পথে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। পুণ্ডবর্ধন সন্ত্রাট অশোকের শাসনাধীন ছিল বলে ধারণা করা হয়। অশোকাবদান গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, এক নিশ্চিহ্ন বুদ্ধের ছবি একে তা পদদলিত করে অবমাননা করে। সন্ত্রাট অশোক এ খবর শুনে তাঁকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। সন্ত্রাট অশোক তাঁর সমগ্র রাজ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এসব কারণে পুণ্ডবর্ধন অঞ্চলেও তখন বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়। বিখ্যাত বৌদ্ধ প্রত্নস্থল সাঁচীতে একটি অনুশাসন আবিষ্কৃত হয়। অনুশাসনটি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের বলে ধারণা করা হয়। এ অনুশাসন হতে জানা যায় যে, ধর্মদত্তা ও ইসিনন্দন (খায়িনন্দন) নামক পুণ্ডবর্ধন অঞ্চলের দু'জন অধিবাসী সাঁচীস্তুপের তোরণ ও দেয়াল নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেছিলেন। নাগার্জুনকোণ নামক বৌদ্ধ প্রত্নতীর্থ হতে একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। শিলালিপিটি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের বলে ধারণা করা হয়। এ শিলালিপিতে উল্লেখ আছে যে সেসময় বাংলা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকের দিকে প্রাচীন বাংলার তাম্রলিপি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তিনি সেখানে ২২টি বৌদ্ধবিহারে বহু ভিক্ষু বসবাস করতেন বলে ভ্রমণ বিবরণীতে উল্লেখ করেন। সেসময় অরো কয়েকজন চৈনিক ভ্রমণবিদ বাংলায় এসছিলেন। গুগ্যুগের অনেক তাম্রলিপি আবিস্কৃত হয়েছে। তাম্রলিপিতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা সম্পর্কে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা চৈনিক ভ্রমণবিদদের বর্ণনা সঙ্গে মিলে যায়। তাম্রলিপিতে এরূপ উল্লেখ আছে যে, পুণ্য অর্জনের জন্য মহারাজা রংপুরদণ্ডের অনুরোধে মহাযানী আচার্য শাস্তিদেব প্রতিষ্ঠিত আশ্রমবিহারে দিনে তিনবার বুদ্ধকে ধূপ-বাতি ও নানাদ্রব্যে পূজা করার জন্য এবং ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণের জন্য এগার পাটক জমি দান করছি।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং বাংলায় ভ্রমণে আসেন এবং বাংলায় বিভিন্ন বিহারে অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ও গ্রন্থ অনুবাদ করেন। তাঁর ভ্রমণ বিবরণী হতে জানা যায় যে, সে সময় পুঁত্রবর্ধনে ২০টি সজ্জারাম এবং তিনি হাজার হীনযানী ও মহাযানী বৌদ্ধভিক্ষু; কর্ণসুবর্ণে ১০টি সজ্জারাম এক হাজার হীনযানী ভিক্ষু; তাম্রলিপিতে ১০টি সজ্জারাম ও দুই হাজার ভিক্ষু; সমতটে ৩০টি সজ্জারাম ও দু'হাজার ভিক্ষু বসবাস করতেন। এসব অঞ্চলে বহু বিখ্যাত বিহার ছিল। তিনি এসব অঞ্চলে সন্ত্রাট অশোক প্রতিষ্ঠিত বহু স্তূপ ও স্তম্ভ দেখতে পেয়েছিলেন।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত খড়গবৎস, দেববৎশ, চন্দ্রবৎশ এবং পালবৎশ প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজবৎশ বাংলায় রাজত্ব করতেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বাংলায় ব্যাপক প্রচার-প্রসার লাভ করেছিল। এ সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম বাংলা খুবই জনপ্রিয় ছিল। খননকার্যের ফলে বহু প্রাচীন বৌদ্ধবিহার, বুদ্ধ, বৌদ্ধিস্ত্র ও দেব-দেবীর মূর্তি আবিস্কৃত হয়েছে। এ থেকে বোৰা যায়, পালযুগ পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম খুবই জনপ্রিয় ধর্ম ছিল। উপরের বর্ণনা থেকে বোৰা যায়, বাংলাদেশে হীনযানী, মহাযানী ও তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। বাংলা ভাষার আদি নির্দশন চর্যাপদ তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধকগণ রচনা করেছিলেন।

পাল যুগের পর থেকে আঠার শ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের বাংলার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস অস্পষ্ট। এ সময় বৌদ্ধরা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নানা কারণে অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলে। জানা যায় সেসময় চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও পটুয়াখালীতে বৌদ্ধরা বসবাস করতো। এছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ, দিনাজপুর প্রভৃতি বৌদ্ধ অধুয়িত অঞ্চল ছিল।

বৌদ্ধদের মধ্যে ছোট-বড় বহু নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে। যেমন, বড়ুয়া, চাকমা, মারমা, রাখাইন, তখ়ঙ্গা, খিয়াৎ, চাক ইত্যাদি। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসব বৌদ্ধ নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করতো। বড়ুয়া ব্যতীত অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর বসবাস মূলত চট্টগ্রামের পার্বত্য জেলাসমূহে। এছাড়া চাক, খিয়াৎ, তখ়ঙ্গার বসবাসও এ অঞ্চলে। ইতিহাস পাঠে ধারণা করা হয় ‘বড়ুয়া’ অভিধায়ুক্ত বৌদ্ধরা মগধ থেকে আসাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী হয়ে চট্টগ্রামে এসে বসবাস শুরু করে। ১২০১ সালে বখতিয়ার খিলজী মগধ (বর্তমান বিহার রাজ্য) আক্রমণ করেন। সে সময় মগধ ও বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন লক্ষণ সেন। বখতিয়ার খিলজীর হাতে লক্ষণ সেন পরাজিত হন। এ সময় বৌদ্ধদের একটি দল পুর দিকে চলে আসে। অনুমান করা হয় তারাই কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের পূর্বপুরুষ। তাছাড়া সে সময় কুমিল্লা অঞ্চল ছিল পঞ্জিকের রাজাদের শাসনে। পঞ্জিকের রাজা রণবক্ষেমল্ল ছিলেন বৌদ্ধ। তিনি ১২০৪ থেকে ১২২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কুমিল্লার লালমাই ময়নামতি তখন সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। এই অঞ্চলের নাম ছিল সমতট। তখন ময়নামতিতে শালবন বিহার, পঞ্জিকের বিহার ইত্যাদির পৌরব ছিল অক্ষুণ্ণ।

বর্তমানে কুমিল্লার বৌদ্ধরা সিংহ উপাধিকারী। সিংহ অর্থ শ্রেষ্ঠ। শাক্যদের নামের সঙ্গে ‘সিংহ’ শব্দটি ব্যবহার হতে দেখা যায়। বুদ্ধকে শাক্যসিংহ বলা হতো। কুমিল্লার বৌদ্ধরা মনে করেন তাঁরা শাক্যসিংহ বুদ্ধের বংশধর। এছাড়া বৌদ্ধদের মধ্যে চৌধুরী, তালুকদার ও মুৎসুন্দী পদবীরও প্রচলন ছিল।

আঠারশ' শতকে আরাকানি বৌদ্ধরা চট্টগ্রাম শাসন করত। এ সময় চাকমা রাজা শেরমুস্ত খান ছিলেন চট্টগ্রামের শাসক। তিনি আরাকান রাজার অধীনস্থ রাজা ছিলেন। চাকমারা নিজেদের আদি নিবাস চম্পক নগর মনে করেন। সেখান থেকে তারা চট্টগ্রামে আসেন বলে মনে করেন। বিতর্ক থাকলেও চাকমারা বিশ্বাস করেন এই চম্পক নগর ছিল ভারতের মগধ অঞ্চলে। আবার অনেকের মতে কুমিল্লার কাছাকাছি কোথাও এ নামে একটি নগর ছিল। কেউ কেউ অনুমান করেন মিয়ানমারের পূর্বে কোন অঞ্চলে এটি ছিল। শেরমুস্ত খান ১৭৩৭ সাল থেকে ১৭৫৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭৫৭ সালে ইংরেজরা পলাশীতে সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৮৭ সাল পর্যন্ত চামকা রাজার সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলে। তখন চাকমা রাজ্যের সীমা উত্তরে লুসাই পাহাড়, দক্ষিণে ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, পূর্বে শঙ্খ নদী ও পশ্চিমে ফেনী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এ সময় চট্টগ্রামের চাকমা, চাক, খিয়াং, তৎঙ্গা ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা বসবাস করত। তাঁরা সবাই ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। এছাড়া হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানরাও চট্টগ্রামে বাস করত। তখন চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি জেল বা অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি ছিল।

মারমারা রাম্য ও মাতামুহূরী অঞ্চলে বসবাস শুরু করে ১৭৭৪ সালের দিকে। তারপর ৩০ বছর পর তারা বান্দরবান শহরে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৮৪ সালের দিকে আরাকান থেকে রাখাইন বৌদ্ধরা বরিশালের পটুয়াখালী অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। চট্টগ্রাম অঞ্চল বৌদ্ধদের প্রভাব ছিল বলে কিছু মারমা ও রাখাইনরা ঢাকায় চলে আসে। ঢাকার বড় মগবাজার ও মগবাজার তার সান্ধ্য বহন করছে। ঢাকার ধামরাই অঞ্চলের নাম ধর্মরাজিক থেকে উদ্ভৃত। সাভারের প্রাচীন নাম ছিল সাহের। এখানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবেশ আবিস্কৃত হয়েছে। অতীশ দীপক্ষর এই সাহেরে পড়াশুনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

আঠারশ' শতকে বড়ুয়ারা রাঙ্গুনীয়া, রাউজান, ফটিকছড়ি, সীতাকুণ্ড, বোয়ালখালী, পটিয়া, সাতকানিয়া, বাঁশখালী প্রভৃতি সব অঞ্চলে বাস করত। কবুলবাজার ও টেকনাফ অঞ্চলে বড়ুয়া, মারমা ও রাখাইদের প্রাধান্য ছিল।

চট্টগ্রামে চাকমা রাজ্যের রাজধানী প্রথমে সাতকানিয়া বা রামুর কাছাকাছি কোথাও ছিল। সাতকানিয়া শব্দ এসেছে সাক কল্যা বা চাকমা রাজকল্যার থেকে। রামু থানাতে এখনও চাকমা কুল নামে একটি স্থান আছে।

১৭৮৫ সালে চাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গুনীয়া থানার রাজানগর গ্রামে স্থাপিত হয়। ১৮৬৯ সালে রাজানগর থেকে চাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গামাটিতে চলে যায়। কারণ এ সময় চন্দ্রঘোনা থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা সদর অফিস রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা, পটুয়াখালী ও উত্তরবঙ্গ অঞ্চলের বৌদ্ধদের অবনতির কাল শুরু হয় বলে মনে করা হয়। এখনও উত্তরবঙ্গে অন্ন সংখ্যক বৌদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁদের সেই গৌরবোজ্জ্বল অতীত ঐতিহ্য আর নেই।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধ ন-গোঠিসমূহের নাম লেখ

আধুনিক যুগ

বর্তমানে অন্যান্য ধর্মের মতো বৌদ্ধধর্মও বাংলাদেশে যথাযথ মর্যাদায় অনুশীলিত হচ্ছে। এ দেশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মতো স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক। সকলের সাথে সৌভাগ্যবোধ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করে ধর্ম অনুসরণ করা বৌদ্ধদের অন্যতম ঐতিহ্য। বৌদ্ধরা সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানসমূহ পালন করে চলেছে।

বাংলাদেশের ইতিহাস জানতে হলে চাকমা, মারমা ও বড়ুয়া বৌদ্ধদের সম্মিলিত ইতিহাস জানা দরকার। রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি - এ তিনটি পার্বত্য জেলায় চাকমা, মারমা, রাখাইন, তথ্বঙ্গা, চাক, খিয়াৎ প্রভৃতি বৌদ্ধ নং-গোষ্ঠী বসবাস করে। কিছু রাখাইন পটুয়াখালি, বরগুণা অঞ্চলে বসবাস করে। বড়ুয়া, চৌধুরী ও সিংহ উপাধিধারী বৌদ্ধরা যথাক্রমে চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে। এদের ইতিহাসই বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ইতিহাস।

চাকমা রাজা জানবক্স খান ১৮০০ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তিনি সারা জীবন ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কাটান। জানবক্স খানের মৃত্যুর পর ধরম বক্স খান রাজা হন। তাঁর মৃত্যুর পর রানি কালিন্দী রাজত্ব করেন। দীর্ঘদিন ইংরেজরা তাঁকে রাণি স্বীকার করেন নি। ১৮৪৪ সালে ইংরেজরা তাঁকে সরকারিভাবে পার্বত্য সার্কেলের প্রধান হিসেবে 'রাণি' বলে স্বীকার করেন। তিনি ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৮৬০ সালে পার্বত্য এলাকাকে নিয়ে ইংরেজরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করে।

ব্রিটিশ শাসন আমলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো বৌদ্ধরাও ইংরেজি শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ সময় বিদ্যাশিক্ষার জন্য তারা কলকাতায়ও যেতে থাকেন। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য অনেকে মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কায় ও থাইল্যাণ্ড গমন করেন। ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরির উদ্দেশ্যে এসময় বৌদ্ধরা আরাকান, রেঙ্গুন, কলকাতা, ত্রিপুরা ও আসাম পাড়ি দিতে থাকেন। উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা শিক্ষা অর্জন ও জীবিকার জন্য ব্রিটিশ শাসনের অধীন আর্থিক ও শিল্প সমৃদ্ধি অঞ্চলে গমন করতে থাকেন। সরকারি ও বেসরকারি চাকরি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, শিক্ষক ইত্যাদি পেশাজীবী ও ব্যবসা প্রভৃতি পেশায় আত্ম নিয়োগ করে বাংলাদেশের বৌদ্ধরা আর্থিক সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ফলে তারা নেতৃত্বিক ও মানবিক গুণবলির বিকাশের জন্য নব উদ্যয়ে ধর্ম চর্চা শুরু করে। এ উদ্দেশ্যকে সফল করার ক্ষেত্রে বৌদ্ধভিক্ষুগণ শুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ আমলে বৌদ্ধদের মধ্যে আত্ম শক্তিতে বলিয়ান হওয়ার যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান আমলে তা আরো সৃষ্টি লাভ করে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে প্রাঙ্গ বৌদ্ধভিক্ষুদের সঠিক দিক নির্দেশনা এবং তাঁদের নির্দেশিত কর্মকাণ্ডে গৃহী বৌদ্ধদের স্বতন্ত্র অংশগ্রহণ। একতাই শক্তি - এ উপলক্ষিতে বৌদ্ধরা সম্মিলিতভাবে কাজ করতে থাকে। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, পরাধীন থেকে কখনো উন্নতি করা সম্ভব নয়। ফলে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সাথে হাত মিলিয়ে তাঁরা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নেয়। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এজন্য বৌদ্ধরা পাকিস্তানী সৈন্যদের রোধানলে পড়ে। তাঁরা বৌদ্ধদের হত্যা, সম্পদ লুট এবং মাবোনদের ধর্ষন করে। বিহার ও বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে। ফলে বৌদ্ধসম্প্রদায় আর্থিক ও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নতুনভাবে আবার দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করে। স্বাধীন বাংলাদেশে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার প্রেরণায় সকল সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করে এ দেশকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করতে থাকে। বৌদ্ধভিক্ষু ও গৃহী বৌদ্ধরা সম্মিলিত হয়ে বিভিন্ন সংগঠন তৈরি করে এদেশের সমৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছেন। বাংলাদেশ সরকারও বৌদ্ধদের ধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশে নানাভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

১৯৪৪ সালে বাংলাদেশ সরকার বৌদ্ধদের কল্যাণে 'বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন করেছে। এছাড়া ঢাকায় অবস্থিত 'বাংলাদেশ সংস্কৃত ও পালি শিক্ষা বোর্ড' থেকে পালি ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে সার্টিফিকেট পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এর অধীনে দেশে প্রায় ১১৫টির মতো পালি টোল ও কলেজ আছে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বি.এ. অর্নাস, এম. এ, এম. ফিল ও পিএইচ.ডি পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তার মধ্যে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি সবচেয়ে প্রাচীন। ১৮৮৭ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫০ সালে বৌদ্ধ কৃষ্ণ প্রচার সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এছাড়া আরও কিছু বৌদ্ধ সংগঠন আছে।

সেগুলোর মধ্যে পার্বত্য বৌদ্ধ সংঘ, বাংলাদেশ সজ্জরাজ ভিক্ষু মহাসভা, বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষুমহাসভা, রাখাইন মারমা সজ্জ কাউন্সিল, বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদ, বাংলাদেশ বুডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ মারমা বুডিস্ট এসোসিয়েশন, উত্তরবঙ্গ বৌদ্ধ পরিষদ উল্লেখযোগ্য।

খননকার্যের ফলে বাংলাদেশে কুমিল্লা, বগুড়া, দিনাজপুর, নওগাঁ, রাজশাহী, সাভার, নরসিংহদি, চট্টগাম, প্রত্তি অঞ্চলে বহু প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো বাংলাদেশের বৌদ্ধদের অতীত ঐতিহ্যের স্মাক্ষর বহন করে। এগুলোর প্রত্তুতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। তন্মধ্যে সোমুপুর মহাবিহারকে ইউনেসকো 'বিশ্ব-ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে পর্যটকরা প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখতে আসেন। ফলে বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশের পরিচিতি ও মান-মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ সরকার এসব প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংযোগে সংরক্ষণ করে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক বিহার আছে। তন্মধ্যে অনেক বিহার নানা কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে চট্টগ্রামের পটিয়ার ঠেগরপুনি বুড়া গোঁসাই বিহার, পাহাড়তলী মহামুনি বিহার, উনাইনপুরা লংকারাম বিহার, বাগোয়ানের ফরাচিল বিহার, চট্টগ্রাম মহানগরীতে নন্দন কানন বৌদ্ধ বিহার, নবপত্তি বিহার, রাউজান সুদর্শন বিহার, কাঙ্গাই চিত্তমরম বিহার, রাঙামাটির রাজবন বিহার, কক্সবাজার অগ্রগমেধা বৌদ্ধ বিহার, বান্দরবান রাজবিহার, বান্দরবানের উজানী পাড়া বৌদ্ধ বিহার, বান্দরবানের স্বর্ণ মন্দির, রামুর রামকোট বিহার, মানিকছড়ি রাজবন বিহার, ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে মেলা ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। বর্তমানে বৌদ্ধ বিহারকে কেন্দ্র করে অনেক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাগুলোকে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ এসব মেলায় ধর্মীয় অনুষ্ঠান, ধর্মীয় নাটক, গান ও বুদ্ধ কীর্তনের আয়োজন হয়। এগুলোর মধ্যে চক্রশালা মেলা, রাঙামাটি রাজবন বিহার মেলা, মানিকপুর পরিনির্বাণ মেলা, মছদিয়া চৈত্য মেলা, ঠেগরপুনি বুড়াগোঁসাই মেলা, বিনাজুরি পরিনির্বাণ মেলা, ইচ্ছামতি ধাতুচৈত্য মেলা, লাঠিছড়ি বুদ্ধ মেলা, শীল ঘাটা মহাপরিনির্বাণ মেলা, আবুরখীল কেন্দ্রীয় যোগেন্দ্র বৌদ্ধ বিহার মেলা, পাঁচরিয়া বাইশ বুদ্ধের মেলা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রাজধানী ঢাকায় বৌদ্ধদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চা শুরু হয় ১৯৫০ সালে। এসময় ঢাকার ঢাকরির সুবাদে বসবাসরত বৌদ্ধরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতো। পরবর্তিতে ১৯৬০ সালে ঢাকায় প্রসিদ্ধ ধর্মরাজিক বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বৌদ্ধদের ঢাকায় ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার আবহ সৃষ্টি হয়। বর্তমানে ঢাকায় অনেক বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেগুলো বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : শাক্যমুনি বৌদ্ধ বিহার, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার, বাংলাদেশ বৌদ্ধ মহাবিহার, ধর্মজ্যোতি বৌদ্ধ বিহার, সাভার রাজবন বিহার। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী বৌদ্ধ সমাজ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সংখ্যায় কম হলেও অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বৌদ্ধ সম্প্রদায় বাংলাদেশে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

অনুশীলনমূক কাজ

কোনু কোনু বৌদ্ধ বিহারে মেলা অনুষ্ঠিত হয় লেখ

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর :

১. গৌতম বুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ -----জনপদ বা রাজ্য ছিল।
২. গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব খ্রিষ্ট পূর্ব----- অ�্দে।
৩. শিক্ষা ও শিল্পকলার উন্নতিতে ----- খুব খ্যাতি ছিল
৪. পাল যুগে ----- ভাষার উন্নয়ন হয়।
৫. পাল বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন -----।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. প্রাক বৌদ্ধ যুগে রাজারাজ জনগণের কাছ থেকে কর হিসেবে কীভাবে নিতেন?
২. গৌতম বুদ্ধের সময়কালে ভারতবর্ষে কী কী বিদ্যা শিক্ষার প্রচলন ছিল?
৩. ধর্মযাত্রা কী?
৪. চর্যাপদ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন :

১. প্রাক বৌদ্ধ যুগের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ কর।
২. ঘোড়শ মহাজনপদের পরিচয় দাও।
৩. বাংলাদেশের কয়েকটি বৌদ্ধ প্রত্নাত্মিক নির্দর্শনের পরিচয় তুলে ধর।
৪. বাংলাদেশের বৌদ্ধরা কী কী পদবী ব্যবহার করেন লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। কাসীর রাজধানী কোনটি ?

- | | | | |
|----|------------|----|---------|
| ক. | চম্পা নগরী | খ. | বৈশালী |
| খ. | বারাণসী | ঘ. | শ্রাবণী |

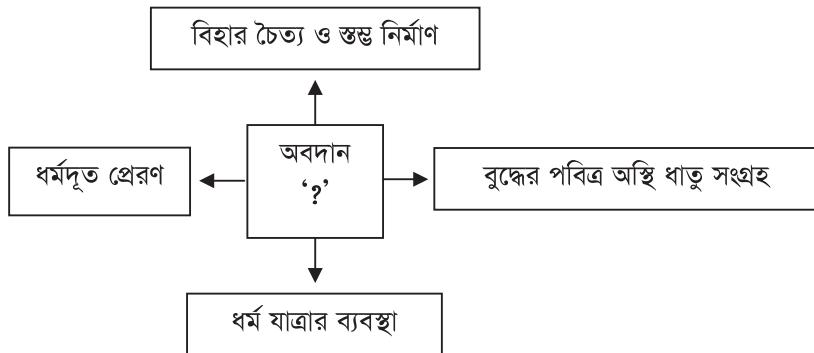
২। গান্ধার জনপদ বিখ্যাত হওয়ার কারণ -

- i. বিদ্যা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল বলে
- ii. শিল্প সংস্কৃতির লালন কেন্দ্র ছিল বলে
- iii. রাজধানীর সৌন্দর্যের জন্য ছিল বলে।

নিচের কোনটি সঠিক ?

- | | | | |
|----|---------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | ii ও iii |
| গ. | i ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের ছকটি দেখে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



- ৩। ‘?’ চিহ্নিত স্থানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারে কোনুন্মুক্ত ধর্ম প্রচার করেন তা হলো-
- | | |
|-----------|----------|
| ক. পাল | খ. মৌর্য |
| গ. আধুনিক | ঘ. কুষাণ |
- ৪। উক্ত বৎশীয় এক শাসক বৌদ্ধ সঙ্গীতি আয়োজনের ব্যবস্থা করেন তা হলো-
- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. ১ম সঙ্গীতি | খ. ২য় সঙ্গীতি |
| গ. ৩য় সঙ্গীতি | ঘ. ৪র্থ সঙ্গীতি |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

ক্রমিক নং	বৎশের নাম	শাসনকাল
১.	পাল	৪০০ বছর
২.	মৌর্য	১৩৭ বছর

- ক. কুষাণ বৎশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি কে ছিলেন ?
- খ. মোড়শ মহাজনপদের মধ্যে যে কোন একটি ব্যাখ্যা কর ?
- গ. ছকে বর্ণিত কোন বৎশীয় রাজা ‘মাংসনায় নীতি’ বিলোপের ভূমিকা রেখেছিলেন ? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর ?
- ঘ. ‘উক্ত বৎশীয় রাজাদের অবদান বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে’—তাতে তুমি কী একমত ? যুক্তি প্রদর্শন কর ?
- ২। রাঙ্গনীয়ার পৌর মেয়ার সুদর্শন চৌধুরী সত্যবাদিতা ও দানশীলতায় অতুলনীয় ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি মুক্ত হাতে দান দিতে পছন্দ করতেন। তাঁর এলাকায় গরিব দুঃহীনা কোন অবস্থায় আছেন, তাদের খোঁজ খবর নিতেন এবং সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হতেন।
- ক. মৌর্য বৎশের প্রথম রাজা কে ছিলেন ?
- খ. অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করে অনুতঙ্গ হলেন কেন ?
- গ. মেয়ার সুদর্শন চৌধুরীর সাথে বুদ্ধের সময়কালের কোন রাজার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে – ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘মেয়ার সুদর্শন চৌধুরীর কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল বুদ্ধের কল্যাণকর বাণীর প্রতি এলাকাবাসীদের আকৃষ্ট করা’— উক্তিটির যথার্থতা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

স্বাদশ অধ্যায়

বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

সুন্দর জীবনযাপনের জন্য প্রত্যেককে প্রতিদিন নিয়মমাফিক কিছু কাজ করতে হয়। এ কাজগুলির মধ্যে কিছু আছে শারীরিক সুস্থ থাকার জন্য, কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনের জন্য আর কিছু শিক্ষা লাভ ও অর্থ উপার্জনের সঙ্গে জড়িত। এগুলোকে সাধারণত প্রাত্যহিক কর্ম ও নিত্যকর্ম বলা হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের কিছু ধর্মীয় ও নৈতিক নিত্যকর্ম আছে যা তারা পালন করে থাকেন। এছাড়া বুদ্ধ নির্দেশিত কিছু অনুশাসনও আছে যা ভিক্ষু ও গৃহীদের জন্য অবশ্যপালনীয়। এই অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীদের নিত্যকর্মসমূহ এবং অবশ্যপালনীয় অনুশাসনগুলো সম্পর্কে পাঠ করব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- * বৌদ্ধ ভিক্ষুদের করণীয়সমূহ উল্লেখ করতে পারব;
- * বৌদ্ধ গৃহীদের পালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- * পটভূমিসহ সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মের বিষয়বস্তু ও এর শিক্ষা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

গৃহীজীবন ত্যাগ করে যাঁরা প্রত্রজ্ঞ্য ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরাই বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষু ও শ্রমণ নামে পরিচিত। গৃহধর্ম পরিত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য পালন ও নির্বাণসাধনার পথ অনুসরণই এঁদের লক্ষ্য। এছাড়া বুদ্ধ-প্রবর্তিত সন্ধর্ম দিকে দিকে সকল মানুষের কাছে প্রচার করাও বৌদ্ধ ভিক্ষু ও শ্রমণদের কর্তব্য। তথাগত বুদ্ধ তাঁর ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রে এরূপ আহ্বানই করেছিলেন। তিনি তাঁর অনুসারী ভিক্ষু-শ্রমণদের সুন্দর জীবনযাপনের জন্য অনেক বিধিবিধান নির্দেশ করেন, যা বিনয়পিটকে বর্ণিত আছে।

যে-কেউ বৌদ্ধ সঙ্গে ভিক্ষু বা শ্রমণ হয়ে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তবে সাত বছর বয়স না হলে শ্রমণ হতে পারেন না এবং বয়স বিশ বছরের কম হলে ভিক্ষু হতে পারেন না। শ্রমণ অর্থ শিক্ষানবিশ। প্রথমে শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রত্রজ্ঞা ও ব্রহ্মচর্য জীবনের নিয়মসমূহের সঙ্গে পরিচিত ও তা পালনে অভ্যন্ত হতে হয়। পরবর্তী সময়ে ভিক্ষু জীবন গ্রহণ করা যায়। বুদ্ধ ভিক্ষু-শ্রমণদের জন্য কিছু অবশ্য করণীয় কর্ম ও অবশ্যপালনীয় অনুশাসন নির্দেশ করেছেন, সেগুলোকে ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন নামে অভিহিত করা হয়। নিম্ন ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো :

দশশীল :

শ্রমণদের প্রতিদিন ত্রিশরণসহ দশশীল গ্রহণ করতে হয়। শ্রমণদের জন্য দশশীল পালন আবশ্যিক নিত্যকর্ম। দশশীল সমূহ হলো : ১. জীবহত্যা ২. চুরি ৩. ব্যভিচার ৪. মিথ্যাভাষণ ৫. সুরাপান ৬. বিকাল ভোজন ৭. নৃত্যগীতে অনুরক্তি ৮. গঙ্কমাল্য প্রভৃতি ধারণ ৯. আরামদায়ক শয্যায় শয়ন ১০. সোনারূপা গ্রহণ ইত্যাদি অভ্যাস বর্জন।

প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা :

আহার, বাসস্থান, পোশাক-পরিচ্ছন্দ ও ঔষধ-জীবন ধারণের এই চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণ সম্পর্কে ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্যই ভাবনা করতে হয়, যা প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা নামে পরিচিত। এগুলো নিম্নরূপ :

১. চীবর প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা : চীবর পরিধান বিষয়ে ভিক্ষু-শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয় :

পোকা-মাকড়, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর কামড়, শীত ও উষ্ণতা নিবারণ, ধূলা-বালি, লজ্জা নিবারণ প্রভৃতি হতে সুরক্ষার জন্য এই চীবর পরিধান করছি। পঞ্চ-কামগুণ উৎপাদনের জন্য নয়।

২. গিঙ্গোপাত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা : আহার গ্রহণ করার সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয় : “আমি কেবল জীবনধারণের জন্য এই আহার গ্রহণ করছি। শারীরিক সৌন্দর্য ও বল বৃদ্ধির জন্য নয়।”

৩. শয়নাসন প্রত্যবেক্ষণ : শয়নাসন গ্রহণ করার সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয় : এ শয়নাসন শুধু শীত ও উষ্ণতা নিবারণের জন্য, দংশক-ধূলাবালি-রৌদ্র-পোকামাকড়, সরীসৃপ প্রভৃতির আক্রমণ নিবারণ এবং চিত্তের একাহতা সাধনের জন্য। আলস্য বা নিদ্রায় অনর্থক কালক্ষেপণের জন্য নয়।

৪. গিলান প্রত্যয় প্রত্যবেক্ষণ : ঔষধ গ্রহণের সময় ভিক্ষু-শ্রমণদের এরূপ ভাবনা করতে হয় : কেবল রোগ উপশমের জন্য প্রয়োজন মতো এ ওষুধ সেবন করছি। অন্য কোনো অকুশল উদ্দেশ্যে নয়। উল্লেখিত মৌলিক উপাদান গ্রহণের সময় প্রত্যবেক্ষণ ভাবনাকে বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলা হয়।

সূর্যোদয়ের পূর্বে, দুপুরের আহারের পরে এবং সন্ধ্যায় বন্দনার সময়ও প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা করতে হয়। এগলোকে অতীত প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা বলে। এ ভাবনা না করলে পরিভোগকারীর জন্য এসব চুরি ও ঋণের পর্যায়ভূক্ত হয়। প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা লোভ-দ্বেষ-মোহ ধ্বংসের হেতু উৎপন্ন করে।

চারি অকরণীয় :

ভিক্ষু-শ্রমণদের চারটি কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়, যাকে চারি অকরণীয় বলে। যথা- ১. ব্যভিচার না করা ২. চুরি না করা ৩. জীবহত্যা না করা এবং ৪. দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে দাবি না করা এবং দৈবশক্তি প্রদর্শন না করা। চতুর্থ অনুশাসনটি প্রবর্তিত হয়েছিল বৈশালীতে দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর। সেসময় কিছু কিছু ভিক্ষু নিজেদের দৈবশক্তির অধিকারী বলে প্রচার করে গৃহীদের মনোযোগ আকর্ষণপূর্বক খাদ্য সংগ্রহ করত। বৃদ্ধ সেজন্য দৈবশক্তিসম্পন্ন বলে প্রচার ও তা প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করেন।

আহার :

ভিক্ষুরা একাহারী। তবে মধ্যাহ্নের পূর্বে বা দুপুর বারোটার আগে আহার গ্রহণ সম্পন্ন করতে হয়। সাধারণত ভিক্ষান দ্বারা ভিক্ষু-শ্রমণদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে ভিক্ষু-শ্রমণগণ গৃহীদের আমন্ত্রণে গৃহে গিয়েও আহার গ্রহণ করতে পারেন।

নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য :

তিনটি চীবর, যথা : সংঘাটি, উত্তরাসজ্জ ও অস্তর্বাস, ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সৃচ-সুতা, কটিবন্ধনী এবং জল ছাঁকনি- এই আটটি ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য। দ্রব্যগুলো ভিক্ষু-শ্রমণদের জীবনযাপনের জন্য যথেষ্ট বলে বুদ্ধ নির্দেশ করেছেন।

সংযম ব্রত :

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সোনা রূপা গ্রহণ করা একেবারেই বারণ। যদি কোনো গৃহস্থ তা দান করেন তাহলেও ভিক্ষু তা নিজের জন্য রাখতে পারবেন না। হয় তা দাতাকে ফেরত দেবেন অথবা অন্য কোনো গৃহস্থকে দান করবেন। অন্য কোনো গৃহস্থকে দান করার ফলে তিনি তার বিনিময়ে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিতে পারবেন। তবে সেগুলো ভিক্ষু নিজের জন্য নিতে পারবেন না। অন্য ভিক্ষু বা ভিক্ষুসঙ্গের জন্য নিতে পারবেন। বুদ্ধ শাসনের উন্নতির জন্য ভিক্ষুসজ্জ ভূমি, বিহার প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি গ্রহণ করতে পারবেন। বুদ্ধের সময় রাজা, মহারাজা ও গৃহীরা এরকম দান করতেন। তবে এগুলো সজ্জসম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে।

পঞ্চ ভাবনা :

পঞ্চ ভাবনা ভিক্ষু শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি ভাবনা। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, অশ্বত ও উপেক্ষা- এ পাঁচটি বিষয়কে অবলম্বন করে ভাবনা করতে হয় বিধায় একে পঞ্চ ভাবনা বলে। ভিক্ষু শ্রমণগণ সকাল-সন্ধ্যায় নির্জনে বসে এই পঞ্চ ভাবনা চর্চা করেন। পঞ্চ ভাবনা লোভ-লালসা, হিংসা-দ্বেষ ও কামভাব থেকে মুক্ত রাখে। পঞ্চ ভাবনা হলো :

মৈত্রী ভাবনা : সকল প্রাণী শক্তহীন হোক, বিপদহীন হোক, রোগহীন হোক, ডয়হীন হোক, সুখে বাস করুক- এরপ কল্যাণকামনাই মৈত্রী ভাবনা।

করুণা ভাবনা : দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে ‘দুঃখমুক্তি’ কামনা করাকে করুণা ভাবনা বলে।

মুদিতা ভাবনা : অপরের সৌন্দর্য, যশ, লাভ, ঐশ্বর্য, অথবা সৌভাগ্য দেখে নিজ চিত্তে আনন্দ অনুভব করাই মুদিতা। ‘সকল প্রাণী যথালক্ষ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত না হোক’- এটি হলো মুদিতা ভাবনার মূলমন্ত্র।

অশ্঵ত ভাবনা : শরীর ব্যাধি ও অশ্চির আধার, অনিত্য এবং মৃত্যুর অধীন। এ বিষয়গুলো অবলম্বন করে ভাবনা করাই হচ্ছে অশ্঵ত ভাবনা।

উপেক্ষা ভাবনা : লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি অষ্টপ্রকার লোকধর্মে চিন্তকে অবিচলিত রেখে ভাবনা করাই হচ্ছে উপেক্ষা ভাবনা।

ধ্যান ও সমাধি :

ধ্যান ও সমাধি ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্যকরণীয় একটি বিষয়। ধ্যান অনুশীলন ব্যতীত চিত্তের একাগ্রতা আনন্দ সম্ভব নয়। মানুষ সহজে তৃক্ষণার জালে আবদ্ধ হয়। লোভ, দেয়, মোহ, কামনা, বাসনা প্রতিনিয়ত আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। এসবের তাড়নায় মানবচিত্ত অশান্ত থাকে। চিন্ত স্বভাবত চঞ্চল এবং ভালোমন্দ উভয় দ্বারা প্রলুক্ত হয়ে থাকে। এরপ চিন্তকে সংযত করতে না পারলে তৃক্ষণা হতে মুক্তি লাভ সম্ভব নয়। এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চিন্ত-সংযমের চেষ্টা করেন। ধ্যানসাধনার লক্ষ্য চিন্তসংযম। ধ্যানের মাধ্যমে বিক্ষিপ্ত চিন্তকে সমাহিত বা স্থির করা হয়। ভিক্ষু-শ্রমণদের নিত্য ধ্যানানুশীলনের মাধ্যমে চিত্তের একাগ্রতা অর্জনের সাধনা করতে হয়। এভাবে আসক্তিসমূহ দূরীভূত হয়। এটি ধ্যানের প্রথম সোপান। মার্গফল লাভ করতে হলে এরকম চারটি সোপান অতিক্রম করতে হয়। বুদ্ধ-নির্দেশিত ধ্যানানুশীলনকে

বিদর্শন তাবনা বলা হয়। আসক্তিমুক্ত হয়ে মার্গফল লাভের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সাধনার নাম সমাধি। দ্বিতীয় স্তর থেকে সমাধির আরম্ভ। এ স্তরে সুখ-দুঃখ অতিক্রান্ত হয়ে শুধুমাত্র স্মৃতিটুকু অবশিষ্ট থাকে। সমাধির দ্বারা ছয়রকম বিশেষ জ্ঞান অর্জন হয়ে থাকে। যথা— দিব্যাদিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, অন্যের মনোভাব জানা, পূর্বজন্মের স্মৃতি মনে করা, রিপু দমনের ক্ষমতা লাভ, অলোকিক বা খন্দি শক্তি অর্জন। অর্হৎ ভিক্ষুগণ এসকল বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী। এঁরা নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করবেন না।

ভিক্ষুদের অবশ্যপালনীয় অনুশাসন :

ভিক্ষুদের ২২৭টি শীল বা বিধিবিধান পালন করতে হয়। ‘পাতিমোক্ত’ গ্রন্থে ভিক্ষুদের অবশ্যপালনীয় এসব বিধি-বিধানের বিস্তৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভিক্ষুদের প্রতিমাসে অন্তত দুবার, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার চতুর্দশীতে পাতিমোক্ত আবৃত্তি করতে হয়। পাতিমোক্তে বর্ণিত অধিকাংশ শীল রাজগৃহে দেশিত হয়েছিল। ভিক্ষুদের জন্য বিধিবন্ধ হয়েছে বলে এই শীলসমূহ ভিক্ষুশীল নামে অভিহিত। গুরুত্ব অনুসারে ভিক্ষুশীলসমূহকে আট ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : পারাজিকা, সংঘাদিসেস, অনিয়ত, নিস্সগিয়া, পাচিতিয়া, পাটিদেসনিয়া, সেখিয়া এবং অধিকরণ সমূহ। নিম্নে বিধি-বিধানসমূহ সংক্ষেপে পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হলো :

১. **পারাজিকা :** পারাজিকা অর্থ পরাজয়, ক্ষতি, ধর্ম হতে চুত বা বহির্ভূত, বর্জিত, ভষ্ট, অপসারিত ইত্যাদি। অর্থাৎ পারাজিকা হলো কতিপয় অপরাধ যা সংঘটন করলে সঙ্গের মধ্যে আর অবস্থান করা যায় না। অপরাধসমূহ হলো : ব্যভিচার, অদন্ত বন্ধ গ্রহণ, নরহত্যা ও ক্ষমতার বৃথা গর্ব। ভিক্ষুদের এসব বিষয় হতে অবশ্য বিরত থাকতে হবে। পারাজিকাপ্রাণ্তি ভিক্ষু উপোসথ, প্রবারণা ইত্যাদি বিনয়কর্ম করার অযোগ্য।
২. **সংঘাদিসেস :** যে আপত্তি বা অপরাধ হতে পরিশুদ্ধিতা লাভের জন্য আদিতে, মধ্যে ও অবসানে সংজ্ঞর উপস্থিতি প্রয়োজন হয় তাকে ‘সংঘাদিসেস’ আপত্তি বলা হয়। সংঘাদিসেস আপত্তি তেরো থ্রাকার। এদের মধ্যে গ্রথম চারটি কামাচার-সম্পর্কিত। পঞ্চম আপত্তিতে ভিক্ষুদের ঘটকের কাজ করা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম আপত্তিতে ভিক্ষুগণ কর্তৃক বিহার ও কুটির নির্মাণে মানানূপ শর্ত প্রসঙ্গে। অষ্টম আপত্তিতে ভিক্ষুগণকে অপর ভিক্ষুর উপর অমূলক পারাজিকা আপত্তি আরোপের প্রচেষ্টা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নবম আপত্তিতে ভিক্ষুগণকে অপর ভিক্ষুর প্রতি দোষারোপ করা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। দশম ও একাদশ আপত্তিতে ভিক্ষুদের সংজ্ঞভেদ করা থেকে নিযুক্ত থাকতে বলা হয়েছে। দ্বাদশ আপত্তি ভিক্ষুদের অবাধ্যতা নিবারণের শর্তারোপ করে। ত্রয়োদশ আপত্তিতে অবাধ্য ভিক্ষুকে ‘পৰবজনিয় কম্ভ’ দ্বারা শাস্তি বিধানের নির্দেশ আছে।
৩. **অনিয়ত :** এ-আপত্তিসমূহ পারাজিকা, সংঘাদিসেস ও পাচিতিয়া এ তিনিন্কার আপত্তির মধ্যে কোনটির অন্তর্ভূক্ত হতে পারে নিশ্চিত না হওয়ায় এধরণের আপত্তিসমূহকে ‘অনিয়ত’ বলে। দুরকম ব্যভিচার এ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত।
৪. **নিস্সগিয় :** এর অর্থ ‘ত্যাগ করা উচিত’। যে বন্ধুর জন্য আপত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন তা অন্য শীলবান ভিক্ষুর কাছে ত্যাগ না করে ঐ বিষয়ে দেশনা করলে আপত্তিমুক্ত হওয়া যায় না। তিনি অপরিশুদ্ধই থাকেন। উদাহরণস্বরূপ : একজন ভিক্ষু একগ্রে তিনটি চীবর পরিধান করতে পারেন। কাঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানের মাস ও তারপরে আরও চারমাস পর্যন্ত অতিরিক্ত চীবর রাখতে পারবেন। এরপর পরবর্তী দশদিনের মধ্যে অতিরিক্ত চীবর অন্য শীলবান ভিক্ষুকে দান করে দিতে হবে। অন্যথায় নিস্সগিয় আপত্তি প্রাপ্ত হবেন। ‘সুত্রবিভঙ্গে’ এরূপ আহার, শয্যা, পরিচ্ছদ, ভিক্ষাপাত্র, সোনা রূপা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ক ৩০টি আপত্তি বা অপরাধ-এর উল্লেখ আছে।

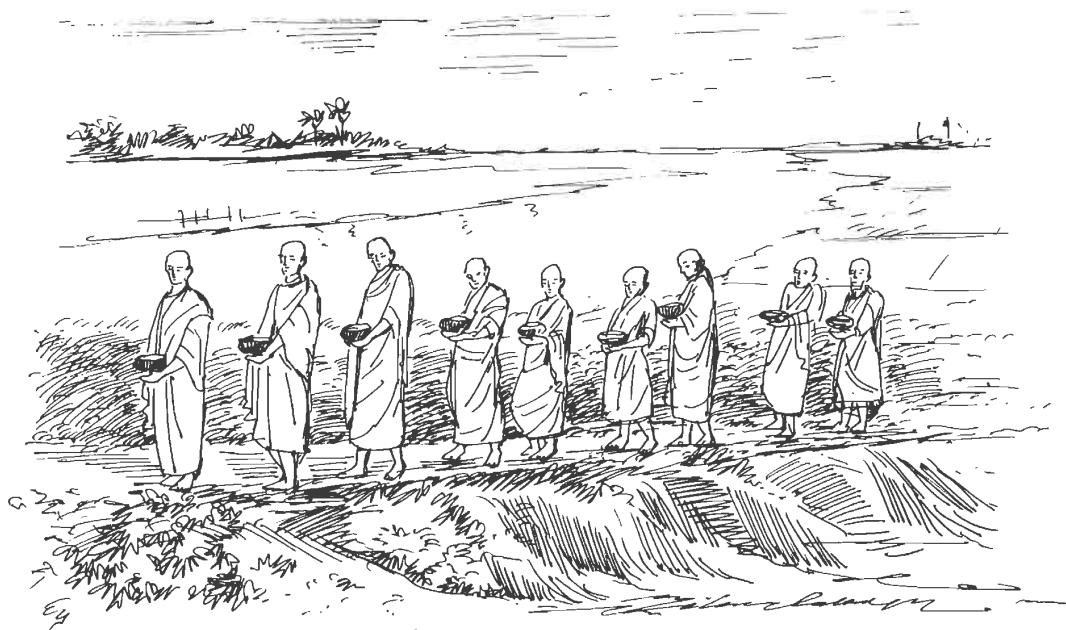
৫. পাচিত্তিয়া : সংস্কৃত ‘প্রায়শিত্তিক’ শব্দ হতে ‘পাচিত্তিয়া’ শব্দের উৎপন্নি। সাধারণ অর্থে ‘পাচিত্তিয়া’ বলতে প্রায়শিত্তি, দুঃখ প্রকাশ, দোষ স্বীকার ইত্যাদি বোঝায়। পাচিত্তিয়া বিরানবই প্রকার। বর্গ হিসাবে পাচিত্তিয়া নয় ভাগে বিভক্ত- মুসাবাদ, ভূতগাম, ভিক্খুনোবাদ, ভোজন, অচেল, সুরাপান, সঞ্চান, সহধম্মিক এবং রাজবংশ। মিথ্যা ভাষণ, ঝুঢ় বাক্য, নিন্দা, বাগ্বিতঙ্গ, প্রতারণা, অত্যাচার, অসুন্দর ব্যবহার, প্রাণীহত্যা, বৃক্ষ লতা ছেদন, শয়ন ও উপবেশনবিষয়ক বিধি-নিষেধ, অসময়ে ভোজন, সঙ্গের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি ইত্যাদি বারো প্রকার অপরাধ বা আপত্তি নয়টি বর্ণিত হয়েছে।

৬. পটিদেসনীয়া ধর্ম : পটিদেসনীয়া আপত্তি মোট চারটি। ভিক্ষুণীর হাত থেকে খাবার গ্রহণ, অতিশ্রদ্ধা সম্পন্ন উপাসকের ভিক্ষা গ্রহণ করা, নিমত্তি না হয়ে গৃহস্থের বাড়িতে বসে খাদ্যদ্রব্য পানীয় গ্রহণ ইত্যাদি ৪টি লঘু পাপ পটিদেসনীয়া আপত্তি হিসাবে পরিগণিত। এরমধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শিক্ষাপদ রূপ ভিক্ষুদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

৭. সেখিয়া : ‘সেখিয়া’ অর্থ শৈক্ষণ্য বা শিক্ষনীয়। সেখিয়া বলতে এমন কর্তৃপক্ষ নিয়মের সমষ্টি বোঝায় যা বিনয় শিক্ষার্থী ভিক্ষু শ্রমণ মাত্রেই শিক্ষা করা কর্তব্য। সর্বমোট ৭৫টি সেখিয়া ধর্ম বা শিক্ষণীয় ধর্ম আছে যা অর্হত্ত্ব লাভ না করা পর্যন্ত সকল ভিক্ষু-শ্রমণদের শিক্ষা করা কর্তব্য। তবে সেখিয়ার সাথে অন্যান্য আপত্তির পার্থক্য এই যে, সেখিয়া ভঙ্গের জন্য কোনোপ্রকার শাস্তি বা প্রায়শিত্তের প্রয়োজন হয় না।

৮. অধিকরণ সমথ : ‘অধিকরণ’ শব্দের অর্থ বাগড়া, বাগড়ার বিষয়, বিচার, বিচারের বিষয় ইত্যাদি। ‘সমথ’ শব্দের অর্থ শাস্তি, মীমাংসা, নিষ্পত্তি যা পরম্পরার আলোচনায় নিষ্পত্তি হয়। পাতিমোক্খে সাত প্রকার অধিকরণ সমগ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। অধিকরণ সমগ্রে আলোচনার মাধ্যমে, ত্রিপিটকে বর্ণিত শিক্ষাপদ দ্বারা, ভিক্ষুসভ্য একত্র হয়ে, অপরাধ স্বীকারের মাধ্যমে, বিজ্ঞ ও জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুর মাধ্যমে, সঙ্গের ত্রীবৃন্দি কামনায় সমবোতার মাধ্যমে মতভেদ ও বিবাদ নিষ্পত্তির কথা বলা হয়েছে। ভিক্ষুরা প্রবারণায় মিলিত হয়ে পাপস্বীকার ও প্রায়শিত্ত করে থাকেন। প্রায়শিত্ত প্রার্থী ভিক্ষুসভ্যকে সম্বোধন করে বলবেন :“হে ভিক্ষুগণ, আমার বিরুদ্ধে যদি আপনারা কেউ কিছু দেখে থাকেন, শুনে থাকেন, আমার চরিত্র বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ থাকে, অনুগ্রহ করে বলুন। যদি সত্য হয়, আমি তার জন্য প্রায়শিত্ত গ্রহণ করতে প্রস্তুত।”

ভিক্ষুদের পাতিমোক্খে বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ অবশ্যই পালন করতে হয়। তথাগত বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের পূর্বে তাঁর অস্তিম দেশনায় অপ্রমত হয়ে কর্তব্য সম্পাদনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যতদিন ভিক্ষুসভ্য শুদ্ধাচারী হয়ে সত্যপথে চলবে ততদিন সদ্বর্ম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। শোকাভিভূত প্রিয়শিষ্য আনন্দকে শোক না করার জন্য উপদেশ দিয়ে বলেন, “নিজেই নিজের দীপ হয়ে বিচরণ করো, নিজেই নিজের শরণ নাও, অন্য শরণের প্রয়োজন নেই। আমার অবর্তমানে ভিক্ষুরা নিজের দীপ নিজে জ্বালবে, নিজের আশ্রয় নিজে হবে, অন্য কারো মুখাপেক্ষী হবে না, ধর্মের আশ্রয় নিয়ে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করবে।” বুদ্ধ তাঁর অবর্তমানে ধর্ম এবং ধর্মের বাহক সংজ্ঞাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন।



ভিক্ষাপাত্র হস্তে ভিক্ষুদের ভ্রমণ

অনুশীলনশূলক কাজ

বিহারে গিয়ে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর নিত্যকর্ম সম্পর্কে
তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন তৈরি কর (দলগত কাজ)

পাঠ : ২

গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন

গৃহীদের মঙ্গল, সুন্দর ও শান্তিময় জীবনযাপনের জন্য বুদ্ধ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে এসব ধর্মোপদেশ পাওয়া যায়। গৃহীদের উদ্দেশ করে প্রদত্ত বুদ্ধের এসব ধর্মোপদেশ ‘গৃহী বিনয়’ হিসেবে গণ্য করা হয়। সিগালোবাদ সূত্র, কলহবিবাদ সূত্র, পরাভব সূত্র, মঙ্গলসূত্র, ব্যগ্ঘপজ্জ সূত্র, খগ্গবিসান সূত্র, লক্খন সূত্র, গৃহীপ্রতিপদা সূত্র, ধম্মিক সূত্র, গহপতিবর্গ, বিদূর পণ্ডিত জাতক প্রভৃতিতে এসব উপদেশ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। বুদ্ধের এসব ধর্মোপদেশ বা অনুশাসন গৃহী বৌদ্ধদের জন্য অবশ্য্যপালনীয়। এখানে ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত গৃহীদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসন সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১) সিগালোবাদ সূত্র :

একদিন রাজগ্রহে বেগুবন বিহারে অবস্থানকালে বুদ্ধ সিগালক নামে এক ব্রাহ্মণ পুত্রের দেখা পান। সিগালক স্নানশেষে সিক্ত বন্তে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, উর্ধ্ব, অধঃ – ষড়দিকে নমস্কার করছিলেন। বুদ্ধ তাঁকে ঐরূপ নমস্কারের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সিগালক বলেন, পৈতৃক প্রথা ও পিতার নির্দেশে তিনি ষড়দিকে নমস্কার করছেন। বুদ্ধ বুঝতে পারলেন সিগালক ষড়দিক বন্দনার মর্মার্থ বুবাতে পারেননি। অতঃপর, বুদ্ধ তাঁকে ষড়দিক বন্দনার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করে গৃহীদের করণীয় সম্পর্কে যে-অনুশাসন প্রদান করেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

চার প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন : প্রাণীহত্যা, অদত্তবস্ত্র প্রহণ, ব্যভিচার ও মিথ্যা ভাষণ-ধার্মিক গৃহীর এই চার প্রকার ক্লিষ্টকর্ম বর্জন করা উচিত।

চার প্রকার পাপকর্ম বর্জন : স্বেচ্ছাচারিতা, হিংসা, ভয় ও অজ্ঞানতার বশবর্তী হয়ে পাপানুষ্ঠান করা – এ চার প্রকার পাপকর্ম ধার্মিক গৃহীর পরিত্যাগ করা উচিত। এসব পাপকর্ম যশ-খ্যাতি ক্ষয় করে।

ষড়দোষ বর্জন : নেশাদ্রব্য গ্রহণ, অসময়ে ভ্রমণ, আমোদ-প্রমোদে লিঙ্গ, দ্যুত ত্রীড়া, কুসংসর্গ, আলস্যপরায়ণতা—এই ষড়দোষ ধার্মিক গৃহীর পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ :

ক) নেশা গ্রহণের ফলে ছয়টি বিষয় ফল ভোগ করতে হয়। যথা— ১. অকারণে ধনহানি ঘটে ২. কলহ বৃদ্ধি পায়, ৩. বিবিধ রোগের উৎপত্তি ঘটে ৪. দুর্নাম রটে ৫. নির্লজ্জ হয় এবং ৬. হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়। এসব কারণে জীবনহানিও ঘটতে পারে।

খ) অসময়ে ভ্রমণের ফলে ১. নিজে অরক্ষিত থাকে ২. স্ত্রী-পুত্র অরক্ষিত থাকে ৩. বিষয়সম্পত্তি অরক্ষিত থাকে ৪. সর্বদা আশঙ্কাযুক্ত হয়ে চলতে হয় ৫. পাপকর্মে মিথ্যা কলক আরোপিত হয় এবং ৬. বিভিন্ন রকমের দুঃখজনক বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়।

গ) আমোদ-প্রমোদে লিঙ্গ থাকলে সর্বদা উৎকর্ষিত চিন্তে কালযাপন করতে হয়।

ঘ) দ্যুত ত্রীড়া অর্থাৎ তাস, পাশা, জুয়া জাতীয় খেলায় ১. জয়ী ব্যক্তির শক্র বৃদ্ধি পায় ২. পরাজিতের অনুশোচনা হয় ৩. সম্মানহানি ঘটে ৪. সভা-সমিতিতে কথার মূল্য থাকে না ৫. মিত্র-পরিজনদের নিকট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় এবং ৬. স্ত্রী-সন্তানের ভরণপোষণে অসমর্থ হয়।

ঙ) কুসংসর্গের ফলে ১. ধূর্ত ২. দুশ্চরিত্র ৩. নেশাগ্রস্ত ৪. জুয়াড়ি ৫. প্রবৰ্ধক এবং ৬. ডাকাত জাতীয় ব্যক্তি বন্ধু হয়। ফলে চরিত্র কলুষিত ও জীবনহানি হয়।

চ) আলস্যপরায়নতার ফলে অনুৎপন্ন ধন উৎপন্ন হয় না, উৎপন্ন ধন ধ্বংস হয়।

মিত্রের লক্ষণ : যে ব্যক্তি বন্ধকে পাপকার্য হতে নিবৃত্ত করেন, মঙ্গলকার্যে প্রবৃত্ত করেন অঞ্চল বিষয় শ্রবণ করায়, শর্গে যাওয়ার পথ নির্দেশ করে— এরূপ ব্যক্তিকে প্রকৃত বন্ধু বা মিত্র বলে জানবে। এদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত।

অমিত্রের লক্ষণ : যে সর্বদ অপরের ধন হরণ করে, বাক সর্বস্ব, চাটুকার ও প্ররোচক-এরূপ ব্যক্তি মিত্ররূপী অমিত্র। তাকে বর্জনীয়।

গৃহীর ষড়দিক : ধার্মিক গৃহীর ছয় প্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা উচিত। একে গৃহীর ষড়দিক রক্ষা করা বলে।

ক) পূর্ব দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা। পাঁচভাবে মাতা-পিতার প্রতি দায়িত্ব পালন করতে হয়। যথা : ১. বৃন্দকালে মাতা-পিতার ভরণ পোষণ করা ২. নিজে কাজের আগে তাঁদের কাজ সম্পাদন করা ৩. বংশমর্যাদা রক্ষা করা ৪. তাঁদের বাধ্যগত থেকে তাঁদের বিষয়সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ এবং ৫. মৃত জ্ঞাতিদের উদ্দেশে দান দেওয়া। মাতাপিতাও সন্তানের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. পাপ হতে নিবৃত্ত করা ২. কল্যাণকর্মে প্রবৃত্ত করা ৩. উপযুক্ত সময়ে বিদ্যা শিক্ষা দান করা ৪. পরিণত বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করা ৫. যোগ্যতা চিন্তা করে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করা।

খ) পঞ্চম দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালন করা। স্ত্রীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ২. ভদ্র ব্যবহার করা ৩. পরস্ত্রীতে আসক্ত না হয়ে স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা ৪. বৈষয়িক ব্যাপারে কর্তৃত্ব দেওয়া এবং ৫. সাধ্যমতো বস্ত্রালংকার দেওয়া। স্ত্রীকেও স্বামীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. সুচারূপে গৃহকার্য করা ২. পরিজনবর্গ ও অতিথিদের প্রতি সাদর সন্তান্যণ করা ৩. স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা ৪. স্বামীর সঞ্চিত ধন অপচয় না করা এবং ৫. গৃহকর্মে নিপুণা এবং অলস হওয়া।

গ) উভর দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে আত্মায়স্তজন ও বন্ধুদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। আত্মায়স্তজন ও বন্ধুদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. দান ও সাময়িক অর্থসাহায্য করা ২. প্রিয়বাক্য ব্যহার করা ৩. হিতাচরণ করা ৪. প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন করা এবং ৫. সরল ব্যবহার করা। আত্মায়স্তজন ও কুলপুত্রে প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. প্রমত্কালে তাকে রক্ষা ২. তার ধনসম্পত্তি রক্ষা করা ৩. ভয়ে আশ্঵স্ত করা ৪. বিপদকালে তাকে ত্যাগ না করা এবং ৫. তাকে সম্মান করা।

ঘ) দক্ষিণ দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে গুরুর প্রতি কর্তব্য পালন করা। গুরুর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. গুরুর সামনে উচ্চ আসনে না বসা ২. সেবা করা ৩. আদেশ পালন করা ৪. মনোযোগ সহকারে উপদেশ শ্রবণ করা এবং ৫. বিদ্যাভ্যাস করা। গুরুকেও শিয়ের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. সুন্দররূপে বিনীত করা ২. খুঁটিনাটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া ৩. পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করে দেওয়া ৪. বন্ধুদের নিকট ছাত্রের প্রশংসা করা এবং ৫. বিপদে রক্ষা করা।

ঙ) উর্ধ্ব দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. শ্রদ্ধাচিত্তে অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ, বাসস্থান প্রভৃতি দিয়ে সেবা করা ২. জনসাধারণকে তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন করে তোলা ৩. তাঁদের হিত কামনা করা ৪. শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো এবং ৫. উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করা। শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণও গৃহীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. তাকে পাপকর্ম হতে নির্বৃত্ত রাখা ২. কল্যাণকর্মে প্রবৃত্ত করা ৩. তাঁদের হিত কামনা করা ৪. অশ্রুত বিষয় ব্যক্ত করা এবং ৫. জ্ঞাত বিষয় সংশোধন করে দেওয়া ও সুমার্গ প্রদর্শন করা।

ছ) অধঃ দিকে নমস্কারের অর্থ হচ্ছে কর্মচারীদের প্রতি কর্তব্য পালন করা। কর্মচারীদের প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. সামর্থ্য অনুযায়ী কার্যতার অর্পণ করা ২. উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া ৩. রোগের সময় সেবা করা ৪. উৎকৃষ্ট খাদ্য ভাগ করে দেওয়া এবং ৫. মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম দেওয়া। কর্মচারীদেরও গৃহস্বামীর প্রতি পাঁচ প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়। যথা : ১. গৃহস্বামীর পূর্বে শয্যা ত্যাগ করা ২. পরে শয়ন করা ৩. কেবল প্রদত্ত বস্ত্র গ্রহণ করা ৪. যথার্থভাবে কর্ম সম্পাদন করা এবং ৫. গৃহস্বামীর সুখ্যাতি ও প্রশংসা করা।

২) ব্যগ্নঘপজ্জ সূত্র :

একসময় বুদ্ধ কোলীয় গ্রামে অবস্থান করছিলেন। ব্যগ্নঘপজ্জ নামক একজন কোলীয় বুদ্ধের নিকট সংসারে আবদ্ধ গৃহীদের ইহকাল ও পরকালের হিতের জন্য কিছু নির্দেশনা দেয়ার অনুরোধ করেন। বুদ্ধ গৃহী জীবনে মঙ্গলজনক চারটি বিষয় মেনে চলার নির্দেশ দেন। এসকল নির্দেশনা ব্যগ্নঘপজ্জ সূত্রে বর্ণিত আছে। নির্দেশনাসমূহ নিচে তুলে ধরা হলো :

উৎসাহ : পরিশ্রম ও সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহে উৎসাহী হতে হবে। যেকোনো কাজ সুসম্পন্ন করার প্রতি উৎসাহী হতে হবে।

সংরক্ষণ : সদুপায়ে কঠে অর্জিত অর্থসম্পদ সতর্কতার সাথে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে চোর, অপহরণকারী, ঈর্ষাপরায়ণ জ্ঞাতি বা আগুন দ্বারা নষ্ট না হয়।

সংলোকের সংশ্লিষ্ট : ত্রিভুজে শ্রদ্ধাশীল, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, শীলবান, অপরের মঙ্গলকামী ব্যক্তিদের সঙ্গে মেলামেশা করা উচিত। এঁদের সৎ গুনবলি অনুসরণ করা উচিত। এঁরাই কল্যাণমিত্র। সৎ জীবন গঠনে এঁদের সংশ্লিষ্ট অপরিহার্য।

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন : আয় বুঝে ব্যয় করা গৃহীর একান্ত কর্তব্য। মিতব্যয়ী হতে হবে। আবার কৃপণতাও পরিহার করতে হবে। আয়-ব্যয় সমন্বয় করে যথারীতি জীবিকানির্বাহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন বলে। বুদ্ধ এ-প্রসঙ্গে আরও বলেছেন, চারটি গুণে গুনান্বিত হলে ইহকাল ও পরকালে মহাউপকার সাধিত হয়। সে চারটি গুণ হলো— শ্রদ্ধাগুণ, শীলগুণ, দানগুণ ও প্রজ্ঞাগুণ।

৩) মঙ্গল সূত্র :

দেবতা ও মানুষের কল্যাণে বুদ্ধ আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল দেশনা করেন যা খুন্দকপাঠ প্রভৃতির মঙ্গলসূত্রে সংকলিত আছে। এ আটত্রিশ প্রকার মঙ্গল কর্ম ধার্মিক গৃহীর অবশ্যই পালনীয়। এগুলো হলো :

১. অজ্ঞানীর সেবা না করা;
২. জ্ঞানী বা সৎ ব্যক্তির সেবা করা;
৩. পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা;
৪. প্রতিরূপ দেশে বাস করা;
৫. পূর্বকৃত পুণ্য স্মরণ করা;
৬. নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করা;
৭. বহু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা;
৮. বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা;
৯. বিনয়ী হওয়া;
১০. সুভাষিত বাক্য বলা;
১১. মাতা-পিতার সেবা করা;
১২. স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ করা;
১৩. নিষ্পাপ কর্মের দ্বারা জীবিকা অর্জন করা;
১৪. দান দেয়া;
১৫. কায়-বাক্য-মনে ধর্মাচরণ করা;
১৬. জ্ঞাতিবর্গের উপকার করা;
১৭. পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা;
১৮. পাপকর্মে রত না হওয়া;
১৯. মদ ও মাদকাসংক্রিত থেকে দূরে থাকা;
২০. অপ্রমত্তাবে ধর্মীয় জীবন যাপন করা;
২১. গুণীব্যক্তির গৌরব করা;
২২. তাঁদের নিকট ন্যূন থাকা;
২৩. প্রাণ্ডি বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা;
২৪. উপকারীর উপকার স্বীকার করা;
২৫. যথাকালে ধর্ম শ্রবণ করা;
২৬. ক্ষমাশীল হওয়া;
২৭. গুরুজনের আদেশ-উপদেশ পালন করা;
২৮. ধর্মগুরুর দর্শন করা;
২৯. যথাসময়ে ধর্মালোচনা করা;
৩০. ধ্যান করা;
৩১. ব্রহ্মচর্য পালন করা;
৩২. চার আর্যসত্য দর্শন করা;
৩৩. নির্বাণ সাক্ষাৎ করা;
৩৪. অষ্টলোক ধর্মে অবিচল থাকা;
৩৫. শোকহীন হওয়া;
৩৬. লোভ, দ্বেষ, মোহরূপ কলুষতাহীন হওয়া;
৩৭. ভয়হীন থাকা;
৩৮. পাপকার্য থেকে দূরে থাকা।

৪) গৃহপতি বর্গ :

গহপতি বর্গে ভগবান বুদ্ধ গৃহীর পনেরো প্রকার গুণের অধিকারী হতে উপদেশ দিয়েছেন, যা নিম্নরূপ :

১. বুদ্ধের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা
২. ধর্মের অকৃত স্বরূপ উপলক্ষ্মি করা
৩. সঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা
৪. দান করা
৫. সাধু ব্যক্তিদের মধ্যে ধন বিতরণে উদার হওয়া
৬. ধর্মোপদেশ শোনার প্রতি উৎসাহী হওয়া
৭. অহংকার বর্জন করা
৮. কলুষতা বর্জন করা
৯. ত্রিভেন্দে বিশ্বাস রাখা
১০. নীতি বজায় রাখা বা শীল পালন রাখা
১১. বিনয়ী হওয়া
১২. লজ্জশীল হওয়া
১৩. বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হওয়া
১৪. দানশীল হওয়া এবং
১৫. জ্ঞান অর্জন করা।

৫) পরাভব সূত্র :

বুদ্ধ শ্রাবণ্তীর জেতবনে অনাথ পিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করার সময় জনৈক দেবতাকে পরাভব বা পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে যে অনুশাসন প্রদান করেন তা গৃহীদেরও অবশ্যগ্রান্তীয়। অনুশাসনসমূহ হলো :

- ১) জ্ঞানী ব্যক্তির জয়, অজ্ঞানীর পরাজয়, ধার্মিকের জয় এবং অধার্মিকের পরাজয় অবশ্যস্ত্বাবী।
- ২) অসৎ ব্যক্তিকে যে প্রিয় মনে করে, সৎ ব্যক্তিকে প্রিয় মনে করে না এবং যে মিথ্য দৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করে তার পরাজয় নিশ্চিত।
- ৩) যে ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ, ক্রেতাপরায়ণ ও উদ্দমহীন তার পরাজয় হয়।
- ৪) যে সক্ষম হয়েও পিতামাতার ভরণ-পোষণ করে না সে ইহ ও পরলোকে নিন্দিত হয় এবং তার পরাজয় হয়।
- ৫) যে নিষ্পাপ শ্রমণ ভিক্ষুকে মিথ্যা কথায় প্রবৰ্থনা করে তার পরাজয় হয়।
- ৬) যে ব্যক্তি প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও কাকেও কিছু দেয় না, একাকী ভোগ করে তার পরাজয় হয়।
- ৭) যে জাতি ধর্ম ও গোত্রের অহংকার করে, গরিব আত্মীয়সজ্জনকে ঘৃণা করে তার পরাজয় হয়।
- ৮) যে পরস্তীতে আসক্ত, নেশাদ্রব্য পান করে সে সম্পত্তি অর্জন করতে পারে না, তার লক্ষ সম্পত্তি নষ্ট হয়। এতে তার পরাজয় হয়।
- ৯) যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীতে অসম্মুষ্ট ও খারাপ নারীতে আসক্ত তার পরাজয় হয়।
- ১০) যে বার্ধক্যে তরঙ্গ-স্তৰী গ্রহণ করে, সে ঈর্ষান্তে দন্ত হয় এবং অনিদ্রায় দিন যাপন করে। তার পরাজয় হয়।
- ১১) যে অর্থ বিনাশকারী স্ত্রী, স্তৰান বা আত্মীয় স্বজনকে সম্পদের উন্নতাধিকারী মনোনীত করে তা ধনহানি দ্বারা পরাজয় হয়।
- ১২) যে দুষ্প্রাপ্য ধন-সম্পদের জন্য অসম্ভব আশা পোষণ করে তার পরাজয় হয়।

৬) ধমিক সূত্র :

একদা ভগবান বুদ্ধ শ্রাবণীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের আরামে অবস্থান করছিলেন। তখন ধমিক নামক এক উপাসক পাঁচশত উপাসকসহ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন। তাঁরা বুদ্ধকে বদ্নন জানিয়ে গৃহীর প্রকৃত স্বরূপ কী জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ তাঁদের গৃহীর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে নিম্নরূপ উপদেশ প্রদান করেন :

- ১) প্রাণীহত্যা করবে না, প্রাণাঘাতের কারণও হবে না। অপর কর্তৃক হননও অনুমোদন করবে না। সবল-দুর্বল নির্বিশেষে সর্বপ্রাণীর প্রতি হিংসা বিরত হবে।
- ২) অপরের দ্রব্য চুরি করবে না, কারো দ্বারা চুরি হলে তা অনুমোদন সমর্থন করবে না। সর্ব প্রকার অদন্তবস্তু বর্জনীয়।
- ৩) ব্যভিচারকে প্রজ্ঞালিত অগ্নিকুণ্ডে ন্যায় বর্জন করবে। ব্রহ্মচর্য পালনে সচেষ্ট হবে ও পর নারী গমন হতে বিরত থাকবে।
- ৪) সভাগৃহে কিংবা পরিষদে মিথ্যা ভাষণ করবে না, মিথ্যা ভাষণে অপরকে প্রভৃতি করবে না। মিথ্যা অনুমোদন করবে না। সর্বপ্রকার মিথ্যা পরিত্যাগ করবে।
- ৫) নেশাগ্রস্থ হবে না, কাকেও নেশাগ্রস্থ হতে প্রয়োচিত করবে না। নেশাগ্রহণ অনুমোদনও করবে না। নেশাদ্রব্য গ্রহণ হতে বিরত থাকবে।
- ৬) নির্বোধগণ প্রমত্তাবশত পাপরত হয়। এ কারণে অপরকেও প্রমত্ত হতে প্রয়োচিত করবে না। নির্বুদ্ধিতা বর্জন করবে।
- ৭) প্রাণবধ, অদন্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা ভাষণ, ব্যভিচার ও নেশাদ্রব্য – এ পঞ্চ পাপকর্ম হতে বিরত থাকবে।
- ৮) কর্তব্যপরায়ন হয়ে মাতা পিতার ভরণ পোষণ করবে। যথোপযুক্ত বাণিজ্যে লিঙ্গ হবে। প্রকৃতগৃহী এসব ধর্ম অপ্রমত্তভাবে পালন করে।

৭) বিধুর পঞ্চিত জাতক :

বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব রূপে নানাকুলে জন্মগ্রহণ করেন। একবার তিনি বিধুর পঞ্চিত রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তিনি গৃহীদের কল্যাণার্থে বা সুখে গৃহে বসবাস সম্পর্কে যে উপদেশ দান করেন তা গৃহী মাত্রই পালনীয়। নিম্নে উপদেশগুলো তুলে ধরা হলো :

- ১) যাঁরা প্রজ্ঞাবলে সৎপথগামী, দৃঢ়তাসম্পন্ন, উদ্যোগী, সূক্ষ্মদর্শী সর্ব বিষয়ে বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন তারা সুখে গৃহে বাস করে।
- ২) যাঁরা পরনারী গমন করেন না, সুস্থাদু খাদ্যদ্রব্য একাকী ভোগ করেন না, ভাগ্য-গণনা প্রভৃতি মিথ্যা ধারণার বশবর্তী হন না, তাঁরা সুখে গৃহে বাস করেন।
- ৩) যাঁরা শীলবান, গৃহকর্মে সুদক্ষ, অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম নিয়োজিত থাকেন, বিচার-বুদ্ধিপরায়ণ, নিরহংকার, বিনীত, মিষ্টভাষী ও শান্ত তাঁরা সুখে গৃহে বাস করেন।
- ৪) যাঁরা সদুপায়ে অর্জিতবস্তু দান করেন, উপর্যুক্ত ব্যক্তিকে দান করেন, প্রার্থীকে সমভাবে বস্ত্র বণ্টন করেন, কর্ষণ ও বপনের সময় সম্পর্কে অভিজ্ঞ তাঁরা সুখে গৃহে বাস করেন।

৮) আয়-ব্যয় বিষয়ে বুদ্ধের উপদেশ :

বুদ্ধ আয় বা লাভের অংশকে চার ভাগ করে ব্যবহার করতে উপদেশ দিয়েছেন। যথা :

১. একভাগ নিজে পরিভোগ করবে। এ অংশ থেকে এক ভাগ দান করবে।
২. দুই ভাগ কৃষি বা বাণিজ্যে নিযুক্ত করবে।
৩. চতুর্থ ভাগ সঞ্চয় করে রাখবে, যাতে বিপদের দিনে ব্যবহার করা যায়।

এগুলো ছাড়াও গৃহীদের উদ্দেশ করে বুদ্ধ আরও অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছেন। এসব উপদেশ পালন করলে গৃহী-জীবন যেমন সুখের হয়, তেমনি নির্বাগের পথেও অগ্রসর হওয়া যায়। তাই এসব উপদেশ সকল গৃহীর মেনে চলা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

গৃহীর ষড়দিক রক্ষার মর্মার্থ লেখ

গহপতি বর্ণে গৃহীর কয়টি গুণের কথা বলা হয়েছে? কী কী?

আয়-ব্যয় সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ কতটুকু যুক্ত্যুক্ত-ব্যাখ্যা কর

পাঠ : ৩

গৃহী নীতিমালা

সৎ আচরণ মনুষত্বের পরিচয় বহন করে। সৎ আচরণ ও সংযম সমাজে বসবাসের অন্যতম শর্ত। শ্রীমৎ ধর্মপাল থের সিংহলি ভাষায় ‘গিহিদিন চরিয়া’ নামে একটি গ্রন্থ লিখেছেন। তাতে গৃহীদের জন্য একান্ত আচরণীয় বিষয় বর্ণিত আছে। বর্ণিত বিষয়বস্তু অবলম্বনে গৃহীদের অনুসরণীয় কিছু নীতিমালা তুলে ধরা হলো।

সকালের কাজ : সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত ধূয়ে বুদ্ধপূজা করা একান্ত কর্তব্য। যদি কাছাকাছি বিহার থাকে তবে সেখানে গিয়ে পূজা ও বন্দনা করা দরকার। অথবা ঘরে এই কাজ সম্পন্ন করা যাবে। বন্দনার পর ঘরের আসবাবপত্র পরিষ্কার করতে হবে। তারপর সকালের খাওয়ার পর মৈত্রী ভাবনা করে কাজে মন দিতে হবে।

আহার : খাওয়ার আগে ভালো করে মুখ, হাত, পা ধূয়ে নিতে হবে। খুশি মনে খাবার খেতে হবে। উচিষ্ট হাতে ভাত তরকারি নেওয়া উচিত নয়। অন্যমনক্ষ হয়ে খাওয়া উচিত নয়। খাবার জিনিস ভালোভাবে চিবিয়ে খেতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন হলে পাশের সঙ্গী, মা-বাবা, বা ভাইবোন থেকে অনুমতি নিয়ে আসন ছাড়তে হয়। খাওয়ার সময় কথা বলা বা হেঁটে হেঁটে খাওয়া উচিত নয়। শব্দ করে খেতে নেই। খাওয়ার পর ভালো করে হাত-মুখ ধূতে হবে। প্রতিদিন সময়মতো খাওয়াদাওয়া করা উচিত।

স্নান ও কাপড় পরার নিয়ম : ময়লা কাপড় পরা উচিত নয়। অল্প কাপড় থাকলেও তা সময়মতো ধূয়ে পরিষ্কার করে রাখা উচিত। ঘামে ভেজা কাপড় না ধূয়ে আবার পরা উচিত নয়। পোশাক পরিধান না করে স্নান করা অনুচিত। নাকের ময়লা, চুল ও পা ভালো করে পরিষ্কার করে স্নান করা উচিত। নখ লম্বা হওয়ার আগেই কেটে ফেলতে হবে।

পথ চলার নিয়ম : বড় ও প্রসিদ্ধ রাস্তায় চলার সময় স্থানীয় নিয়ম অনুসরণ করা উচিত। হাতে ছাতা থাকলে তা পরের গায়ে যেন না লাগে সেদিকে নজর রাখা দরকার। অন্যমনক্ষ হয়ে পথ চলা অনুচিত। ডান ও বাম দিক ভালো করে দেখে রাস্তা পার হওয়া উচিত। চলার পথে কিছু খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতা পালন করা উচিত। সাধ্যমতো অঙ্ক, বৃক্ষ ও শিশুদের রাস্তা পার হতে সাহায্য করা উচিত।

সভার আচরণবিধি : সভার উপযোগী পোশাক পরিধান করে সভায় অংশগ্রহণ করা উচিত। অন্যের মতামতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নিজের মতামত যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করতে হবে। সভায় সকলে সমস্তের কথা বলা অনুচিত। সর্বোচ্চ শিষ্টাচার ও সৌজন্য বজায় রেখে সভায় অবস্থান করতে হয়। সময়ানুবর্তিতা সভায় অংশগ্রহণ ও সভা পরিচালনার অন্যতম শর্ত।

রোগী দেখতে যাওয়া : আত্মায়ন্বজন, বন্ধু ও পরিচিত কারো অসুখ হলে দেখতে যাওয়া একটি সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব। রোগীকে সহানুভূতি ও সাহস যোগাতে হবে। যথাসাধ্য প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পথ্য নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। রোগীর সেবায় নিয়োজিত আত্মায়ন্বজনকে সাহস ও সান্ত্বনা দিতে হয়। রোগী সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে প্রয়োজনীয় সতর্কতা নিয়ে দেখতে যাওয়া উচিত। অধিক সময় রোগীর ঘরে থাকা উচিত নয়। রোগীর ঘর থেকে এসে কাপড় বদলে মুখ, হাত, পা ধূয়ে নিতে হয়। এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যবিধি।

মৃত দর্শন : আত্মায়সজন ও পাড়াপড়শির মৃত্যুতে দেখতে যাওয়া সামাজিক ও ধর্মীয় কর্তব্য। পরিষ্কার কাপড় পরে যাওয়া এবং ফিরে এসে সেসব কাপড় খুলে ধুয়ে ফেলা ভালো। শোকার্তদের সমবেদনা জানাতে হয়। জন্ম-মৃত্যু অতি স্বাভাবিক ঘটনা। জীবমাত্রই মৃত্যুর অধীন। এভাবেই সান্তনা ও সমবেদনা প্রকাশ করা যায়। মৃতের উদ্দেশে আয়োজিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হয় এবং কোনোরকম সহায়তার প্রয়োজন হলে সহায়তা করা একটি কুশল কর্ম।

পরিবারে ছেলেমেয়েদের কর্তব্য : পরিবারের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ছাড়াও অনেক কাজ করতে হয়। পড়ার বাইরেও পরিবারের অন্যান্য কাজে যথাসম্ভব সাহায্য করতে হবে। মা-বাবা যে-পেশায় কাজ করেন সে-কাজে সাধ্যমতো তাঁদের সাহায্য করতে হবে। অবসরে বা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে পারিবারিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হয়। পিতা-মাতার ব্যবসায় যথাসাধ্য সাহায্যতা করা উচিত। সাহায্যের দরকার না থাকলেও সব বিষয়ে নজর রাখতে হয়। এতে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাঢ়ে। কর্ম অভিজ্ঞতা ব্যতিত পুস্তকের বিদ্যা জীবনে কোনো কাজে আসে না। মনে রাখতে হবে যেকোন সৎ শ্রম মর্যাদাপূর্ণ।

নামকরণ : ব্যক্তির নামকরণ ধর্মীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কিত হলে ভালো হয়। এতে নিজ ধর্মের সাথে পরিচিতি ও নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। নিজের দেশের ঐতিহ্য, পূর্বপুরুষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অনুযায়ীও নাম রাখা যেতে পারে।

নিত্যপালনীয় ধর্মাচার : প্রতিটি বৌদ্ধ গৃহীর গৃহে নিত্যপালনীয় ধর্মাচারের জন্য একটি বুদ্ধাসন থাকে। সেখানে বুদ্ধের মূর্তি বা চিত্র থাকে। গৃহী বৌদ্ধরা সাধারণত পারিবারিক বুদ্ধাসনের সামনে দিনে তিনবার নিয়মিত শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে থাকে। খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ, হাত ও পা ধুয়ে পুষ্প, পানীয়, আহার ও সুগন্ধ ধূপসহ বুদ্ধকে পূজা করা হয়। দুপুর বারোটার পূর্বে অনুরূপভাবে আহার ও পানীয় দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করা হয়। সন্ধিয়ায় প্রদীপ, সুগন্ধ ধূপ ও পানীয় দিয়ে পুনরায় একইভাবে বুদ্ধের উপাসনা করা হয়। এসময় নির্ধারিত গাথা আবৃত্তি করে ভক্তিসহকারে পূজাসামগ্রী উৎসর্গ করতে হয়। এরপ উপাসনা চিত্তকে পবিত্র ও শান্ত করে। অন্তর থেকে অঙ্কারারপী কল্যাণতা বিদ্রূপীত করে সন্দর্ভের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করে। এখানে কয়েকটি নিত্যকরণীয় ধর্মাচারে ব্যবহৃত গাথা তুলে ধরা হলো :

১. পুষ্প পূজা গাথা :

বণ্গ গঙ্গ গুণপেতৎ এতৎ কুসুমসন্ততিঃ,
পুজ্যামি মুনিন্দস্স সিরিপাদ সরোরংহে।
পুজেমি বুদ্ধং কুসুমেন তেন
পুণ্ডেন মে তেন চ হোতু মোক্খৎঃ,
পুগ্রফং মিলায়তি যথা ইদং মে
কায়ো তথা যাতি বিনাসভাবং।

বাংলা : সুন্দর বর্ণ ও সুগন্ধযুক্ত এই পুষ্পসমূহ মুনীন্দ্র বুদ্ধের শ্রীপাদপদ্মে পূজা করছি। এই পুষ্প দ্বারা বুদ্ধকে পূজা করছি, এই পুণ্য প্রভাবে আমার মোক্ষ লাভ হোক। এ পুষ্প যেমন খ্লান হয়ে যাচ্ছে সেরূপ আমার শরীরও বিনষ্ট হয়ে যাবে।

এ গাথার মাধ্যমে আমরা জগতের অনিত্যতা উপলক্ষ্মি করি।

২. ধূপাদি সুগন্ধি পূজা :

গঙ্গসন্তারযুতেন, ধূপেনাহং সুগন্ধিনা,
পুজযে পুজনেয্যতৎ পূজা-ভাজন মুত্তমৎ।

বাংলা : আমি গঙ্গসন্তারযুক্ত সুগন্ধি ধূপের দ্বারা পূজার উত্তম পাত্র পূজনীয় সে বুদ্ধকে পূজা করছি।

এ গাথায় অনন্ত গুণসম্পন্ন পূজার উত্তম পাত্র বুদ্ধকে সুগন্ধি ধূপ দ্বারা পূজা করার প্রতীকী অর্থ হচ্ছে প্রকৃত গুণসম্পন্ন ব্যক্তির গুণরাশি ধূপের সুগন্ধের ন্যায় প্রকাশিত হয়। অনুরূপ উত্তম ব্যক্তিই পূজার উপযুক্ত পাত্র।

৩. প্রদীপ পূজা :

ঘনসারঞ্জিতেনদীগেন তৰথৎসিনা

তিলোকদীপং সমবুদ্ধং পূজযামি তমোনুদং

ঘনসার তৈল দ্বারা বা ধাতুজাত বস্ত্র দ্বারা অঙ্গকার বিনাশকারী জুলন্ত প্রদীপের দ্বারা ত্রিলোক- প্রদীপ স্বরূপ অজ্ঞান-অঙ্গকারহারী সম্বুদ্ধকে পূজা করছি ।

এ-গাথায় সম্যকসম্বুদ্ধকে আলোর ন্যায় আমাদের অন্তর হতে অজ্ঞানতার অঙ্গকার অপসারণকারী বলে প্রশংসা করা হয়েছে । এভাবেই গাথা আবৃত্তি করে বন্দনার মাধ্যমে আমরা চিন্ত বিশুদ্ধির সাথে সাথে সন্দর্ভ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করি ।

অনুশীলনমূলক কাজ

গৃহী নীতিমালা অনুযায়ী একটি দিনলিপি প্রস্তুত কর

পাঠ : ৪

সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম

বুদ্ধের সময়ে বৈশালী নামে একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল । বৈশালীর অধিবাসী বজ্জী ও লিচ্ছবিরা বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন । লিচ্ছবিরা বুদ্ধ ও সঙ্গের বসবাসের জন্য সুরম্য কুটাগারশালা বিহার নির্মাণ করে দেয় । বুদ্ধ ঐ বিহারে পাঁচবার বর্ষাবাস পালন করেন । বৈশালীতে অবস্থানকালে বুদ্ধ একাধিক সূত্র ও অনুশাসন দেশনা করেন । তার মধ্যে গৃহীদের জন্য ‘সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম’ অন্যতম । ‘সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম’ অর্থ হচ্ছে সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য । তথাগত বুদ্ধ বৈশালীর ‘সারন্দদ চৈত্যে’ অবস্থানকালে বজ্জীগণের উদ্দেশে এই অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন । বজ্জীরা এ সাতটি অপরিহার্য উপদেশ অনুসরণ করে প্রাচীন আর্যবর্তে নিজেদের অজ্ঞেয় এবং উন্নত জাতিতে পরিণত করেছিলেন । যেকোনো জাতি বা সমাজ এ সাতটি অপরিহার্য ধর্ম বা অনুশাসন পালন করলে তাদের কখনো পরাজয় ঘটবে না । এ-সাতটি অপরিহার্য ধর্ম নিম্নরূপ :

১. সভাসমিতির মাধ্যমে সকলে একত্রিত হয়ে যে-কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ।
২. গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্মিলিতভাবে সম্পাদন করা এবং কোনোরকম নতুন কিছু করার কারণ ঘটলে সবাই মিলিতভাবে করা ।
৩. সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনোরকম দুর্নীতি চালু না করা; প্রচলিত সুনীতি উচ্ছেদ না করা এবং প্রাচীন নীতি ও অনুশাসন মেনে চলা ।
৪. বয়োবৃন্দ বা জ্ঞানবৃন্দদের শ্রদ্ধা, সম্মান, গৌরব ও পূজা করা এবং তাদের আদেশ পালন করা ।
৫. কুলবধূ এবং কুলকুমারীদের প্রতি কোনোরকম অন্যায় আচরণ না করা অর্থাৎ স্ত্রীজাতির মর্যাদা রক্ষা করা ।
৬. পূর্বপুরুষদের নির্মিত বিহার, চৈত্য, এবং প্রদত্ত সম্পত্তি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা ও সন্দর্ভের প্রতিপালন করা ।
৭. অর্হৎ ও শীলবান ভিক্ষুদের প্রয়োজনীয় দান দিয়ে সেবা ও রক্ষা করা, তাঁদের সুখ ও সুবিধার ব্যবস্থা করা ও নিরাপদ অবস্থান সুনিশ্চিত করা ।

ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম : তথাগত বুদ্ধ বৌদ্ধসঙ্গের স্থায়িত্ব বিধানের জন্য সাতটি অপরিহার্য ধর্ম দেশনা করেন, যা মহাপরিনির্বাণ সূত্রে সংকলিত হয়েছে । ভিক্ষুসঙ্গের ভবিষ্যৎ কল্যাণার্থে বুদ্ধ এ-অনুশাসনসমূহ দেশনা করেন এবং বলেন যে এগুলো পালন করলে তাঁদের কখনোই পরাজয় হবে না । ভিক্ষুদের সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মসমূহ নিম্নরূপ :

১. ভিক্ষুগণ একত্রে সম্মিলিত হবেন ।
২. ভিক্ষুগণ একতাবন্ধ থেকে একসঙ্গে সজ্ঞ-কর্তব্য সম্পাদন করবেন ।
৩. ভিক্ষুগণ নির্দেশিত শিক্ষাপদসমূহ পালন করবেন ।
৪. ভিক্ষুগণ বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের সম্মান, পূজা ও সেবা করবেন ।

৫. ভিক্ষুগণ পুনর্জন্মের কারণ ত্রুটার বশবতী হবেন না।
 ৬. ভিক্ষুগণ অরণ্যে বা একান্তে নির্বাণ সাধনায় মনোনিবেশ করবেন।
 ৭. ভিক্ষুগণ অনাগত ও আগত ভিক্ষু-শ্রমণের সুখ-সাচ্ছন্দের ব্যবস্থা করবেন।
- এভাবেই বুদ্ধ তাঁর অবর্তমানে গৃহী ও ভিক্ষু-শ্রমণদের কল্যাণার্থে এবং সন্দর্ভের অনুশীলন অব্যাহত রাখার জন্য অবশ্য-পালনীয় নীতিমালা ও অনুশাসনসমূহ দেশনা করেছেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্মের সুফল সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ রচনা লেখ

অনুশীলনী

১. শূন্যস্থান পূরণ কর :

- ক) দুঃখীর দুঃখে ব্যথিত হয়ে ‘দুঃখ মুক্তি’ কামনা করাকে ---- ভাবনা বলে।
- খ) নেশা গ্রহণের ফলে ---- বিষময় ফল ভোগ করতে হয়।
- গ) পাপ কর্মে মিথ্যা ---- আরোপত হয়।
- ঘ) গুরুর প্রতি ---- প্রকার কর্তব্য পালন করতে হয়।
- ঙ) ---- প্রমত্তা বশত পাপরত হয়।

২. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

- ক) বর্তমান প্রত্যবেক্ষণ কী ব্যাখ্যা কর।
- খ) ভিক্ষু ও শ্রমণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ কর।
- গ) ‘সেখিয়া’ বলতে কী বোঝ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ) পরিবারের প্রতি শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ বর্ণনা কর।

৩. রচনামূলক প্রশ্ন :

- ক) ভিক্ষু ও শ্রমণদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা কর।
- খ) গৃহীদের প্রতিপালনীয় নিত্যকর্ম ও অনুশাসনসমূহ বর্ণনা কর।
- গ) সপ্ত অপরিহাণীয় ধর্ম কী? বিস্তারিত লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১। ‘নিস্মাগগিয়’ -র অর্থ কী ?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ক. নিশ্চিত করা উচিত | খ. লক্ষ করা উচিত |
| খ. ত্যাগ করা উচিত | ঘ. সমাধা করা উচিত |

২। ধ্যান ও সমাধি ভিক্ষু শ্রমণদের জন্য অবশ্যকরণীয় কেন ?

- ক. চিন্তসংযমের জন্য
- খ. প্রশংসা পাওয়ার জন্য
- গ. যশ-খ্যাতি অর্জনের জন্য
- ঘ. অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ে ঢ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অমিত বড়ুয়া গ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হন। আহার গ্রহণের সময় বিহারাধ্যক্ষ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “আপনি আহার গ্রহণ করছেন কেন?” তিনি জবাবে বললেন, কেবল জীবণ ধারণের জন্য; তখন ভিক্ষু বললেন, “আপনি কী আমাদের চারটি মৌলিক উপাদান গ্রহণের সময় একুপ চিন্তা করেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ আমি একুপ চিন্তা করি।”

৩। বৌদ্ধ ভিক্ষু নিজকর্ম অনুসারে অমিত বড়ুয়ার একুপ চিন্তাধারাকে কী বলা হয়?

- ক. মৈত্রীভাবনা
- খ. পঞ্চ ভাবনা
- গ. প্রত্যবেক্ষণ ভাবনা
- ঘ. মুদিতা ভাবনা

৪। উক্ত চিন্তাধারা গ্রহণ করলে অমিত বিরত থাকবেন —

- i. লোভ-লালসা থেকে
- ii. হিংসা দ্বেষ থেকে
- iii. কামভাব থেকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন :

১। পানিপাড়া গ্রামের অধিবাসীরা যে-কোনো বিষয়ে একসাথে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ওরা ছোট-বড়, মা-বোনদের সম্মান করেন। গ্রামে ভিক্ষুরাও একত্রে তাঁদের কর্তব্য পালন করেন এবং বুদ্ধের নীতিমালা পালন করতে সচেষ্ট থাকেন।

- ক. বুদ্ধ পরাভব সূত্রে পরাজয়ের কয়টি কারণ নির্দেশ করেছেন?
- খ. মৃত ব্যক্তিকে দর্শন করতে হয় কেন? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।
- গ. পানিপাড়া গ্রামের অধিবাসীদের কর্মকাণ্ড বৌদ্ধ ভিক্ষুত গৃহীদের কোন বিধিবিধানের ইঙ্গিত বহন করে?
- ঘ. ব্যাখ্যা কর।

ঘ. পানিপাড়া গ্রামের উক্ত কর্মকাণ্ড নিজের এবং দশের জন্য কী বয়ে আনে তা পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু ও করুণাশ্রী ভিক্ষুর মধ্যে সর্বদা সুসম্পর্ক বিরাজমান। দুইজনেই বিনয়ের নিয়ম মেনে চলে। প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষুকে একজন দায়ক সোনার চেইন দান করেন। তিনি তা গৃহস্থকে দান করে দেন। সেই কারণে প্রজ্ঞানন্দের সুনাম হয়। প্রজ্ঞানন্দের সুনাম হওয়াতে করুণাশ্রী ভিক্ষু খুবই আনন্দিত হন। তাছাড়া প্রায় সময় করুণাশ্রী ভিক্ষু শ্বাসগ্রহণ ও শ্বাসত্যাগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিন্তকে নিবন্ধ রাখার চেষ্টা করেন।

- ক. চারি অকরণীয় কী?
- খ. ভিক্ষুদের অশুভ ভাবনা করতে হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ ভিক্ষু বিনয়ের কোন নিয়মটি পালন করেছেন? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘শ্রদ্ধেয় করুণাশ্রী ভিক্ষুর কার্যাদি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য অবশ্যকরণীয়’—এ কথাটি ভিক্ষুদের নিত্যকর্ম ও অনুশাসনের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

সমাপ্তি



অহিংসা পরম ধর্ম

- গৌতম বুদ্ধ

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :